রণে ও রাজনীতিতে শ্রীকৃষ্ণ

সঞ্জীব ভট্টাচার্য

শরৎ পাবলিশিং হাউস
৯/৪ টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

জনক

জননী

জন্মভূমি

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে সব সময়েই এমন কেউ কেউ থাকেন যারা সাধারণ মানুষের থেকে একটু ভিন্ন ধরনের চিন্তা করেন। আত্মীয়, পরিজন, সন্তান, সন্ততি বেষ্টিত, সুখে উৎফুল্ল, দুঃখে কাতর, উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনকারী জনসাধারণের চেয়ে তাদের চিন্তাধারা একটু উচ্চস্তরের হয়, এবং তারা তাদের কর্মের মধ্যে সেই স্বতন্ত্র চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হন। চিন্তায় দৈন্য, কর্মে অক্ষম জনসাধারণ তখন নিজের অবচেতন মনের ইচ্ছা অন্যের দ্বারা সফল হতে দেখে আনন্দিত হয়, অবাক হয়, মুগ্ধ হয় এবং সেই মুগ্ধতাবোধ ক্রমে তাদেব সেই ব্যক্তির ভক্ত করে তোলে। ভক্ত জনসাধারণের ক্রমাগত প্রশংসা সফল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। তিনি বুঝতে শুরু করেন যে, তিনি সাধারণের থেকে আলাদা। সাধারণের থেকে উচ্চস্তরের এবং সাধারণের প্রশংসার যোগ্য। এইভাবে প্রশংসা ব্যক্তিত্বে উচ্চমন্যতা বোধের প্রবেশ ঘটায় এবং জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে সেই উচ্চমন্যতাবোধের প্রতিফলন ঘটে। চিন্তায় দরিদ্র ও মানসিক অপুষ্টিতে আক্রান্ত জনসাধারণ সহজেই এই ভিন্ন ধরনের ব্যবহার স্বীকার করে নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই নিজের ওপর অন্যের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাদের কাছে সহজ হয়ে যায় এবং সেটাই তারা স্বাভাবিক মনে করে। এইভাবে নিজের অজান্তেই জনসাধারণ হীনমন্যতাবোধে খুব ধীর গতিতে আক্রান্ত হয় এবং ব্যক্তিত্বশালী ও শক্তিমান কাউকে প্রশংসা করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হয়।

সমগ্র জাতি যখন এইভাবে নিজের অজান্তে হীনমন্যতাবোধে ভুগতে থাকে তখন সেই জাতির নিজের ওপর কোন আস্থা থাকে না। জাতীয় চরিত্র বিসর্জন দিয়ে তারা হয় তখন অন্য জাতির ক্রীতদাস হয় অথবা তাদের ব্যক্তিত্বহীনতার সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে থেকেই

কোন ধূর্ত ও ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ নিজেকে মহাপুরুষে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন।

পৃথিবীতে সর্বকালে সর্বদেশে কেবলমাত্র জাতীয় বিপর্যয়ের সময়েই নেতৃত্ব প্রদানকারী মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে এবং এখনও হয়। কোন জাতি তার স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় কোন নেতৃত্ব প্রদানকারী মহাপুরুষের জন্ম দেয়নি এবং এখনও দেয় না। জাতির মানসিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকলে আকাশে দৈববাণী হয় না এবং কারাগারে বা অন্য কোথাও কোন নেতা-মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পান না।

মানুষের জীবনযাত্রার প্রাথমিক স্তরে মানুষ যাযাবর ছিল এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করত। গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর জীবন যাপনের সময় প্রায়ই এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর ঝগড়া হত এবং লোকক্ষয় হয়ে পরাজিত গোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ত। সমগ্র গোষ্ঠীকে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং আক্রমণ হলে উপযুক্ত মোকাবিলা করার জন্য একজন সাহসী ও বুদ্ধিমান লোকের প্রয়োজন অনুভূত হত। এই প্রয়োজনই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্বের জন্ম দেয়। পরে যাযাবর গোষ্ঠীর স্থায়ীভাবে এক জায়গায় নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে বসবাসের শুরু থেকেই গোষ্ঠী রাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং গোষ্ঠীর নেতৃত্বও বংশানুক্রমিক হয়ে গোষ্ঠী রাজার জন্ম দেয়। ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী কালক্রমে জনসংখ্যায় স্ফীত হয়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রসার লাভ করে বিভিন্ন করদ রাজ্যের জন্ম দেয় এবং মানব সভ্যতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ হয়।

পৃথিবীর সব ভূখণ্ডেই এক সময়ে একাধিক করদ রাজ্য ছিল এবং ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। মাত্র তিনশো বছর আগেও পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মতই ভারতের মানচিত্রও একাধিক খণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি মাত্র ছিল এবং প্রত্যেক রাজ্যই একজন বংশানুক্রমিক রাজার দ্বারা শাসিত হত একথা সর্বজনজ্ঞাত। কাজেই কয়েক

ছিলেন। জরাসন্ধের পরিচালনায় মগধ ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য রূপে পরিগণিত হয়েছিল। ভারতের অন্যান্য রাজারা জরাসন্ধের নামে কম্পিত হতেন। বহু ভারতীয় নৃপতি সম্রাট জরাসন্ধের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর অনুগ্রহে রাজ্য পরিচালনা করতেন। সামরিক শক্তিতে ভারতের কোন রাজ্যই মগধের সমকক্ষ ছিলনা। নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়াসে কংস মগধের সম্রাট জরাসন্ধের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের পরিকল্পনা করলেন। তীক্ষ্ণধী কংস রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপনের তৎকালীন নিয়মানুযায়ী মগধসম্রাট জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করলেন। মগধের শক্তিশালী সম্রাটের সঙ্গে কংসের রাজনৈতিক আত্মীয়তা স্থাপিত হল। শ্বশুর জরাসন্ধের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কংস নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেন এবং চক্রান্তকারী ও বিদ্রোহীদের কারারুদ্ধ ও বিতাড়িত করে নিজের সিংহাসন নিরাপদ করলেন। জামাতার রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সম্রাট জরাসন্ধ নিজের অনুগত রাজন্যবর্গের সঙ্গেও জামাতা কংসের মিত্রতা স্থাপন করালেন। জরাসন্ধের অনুগত ও কংসের সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রতায় আবদ্ধ এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে প্রলম্ব, অঘ, দ্বিবিদ, ভৌম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইভাবে শ্বশুরের সহায়তায় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দূর করে এবং বিভিন্ন শক্তিশালী রাজার বন্ধুত্ব লাভ করে কংস নিজেও ভারতের এক অন্যতম শক্তিশালী রাজা রূপে পরিচিতি লাভ করলেন। নিজ রাজ্যের অভ্যন্তরে তাঁর আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। পিতা উগ্রসেন সহ অন্যান্য সমস্ত উল্লেখযোগ্য বিরোধীকে তিনি কারারুদ্ধ করে রাখলেন।

[দুই]

কংসের কারাগারে বসুদেব ও দেবকী দীর্ঘদিন আবদ্ধ ছিলেন। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই একে একে দেবকীর ছয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজা কংস 'শত্রুর শেষ রাখতে নেই' এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একে একে বসুদেব-দেবকীর ছয়টি সন্তানকে হত্যা করে মথুরার সিংহাসনে বৃষ্ণি বংশের এবং বসুদেবের কোন উত্তরাধিকারীর বসার সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেন। দেবকীর সপ্তম সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হয়। এর পরে দেবকী আরো একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। পৃথিবী বিখ্যাত সেই পুত্র সন্তান পরে কৃষ্ণ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

রাজা কংস দেবকীর ছয়টি সন্তানকে জন্ম গ্রহণ করা মাত্রই হত্যা করতে সক্ষম হলেও অষ্টম সন্তানকে হত্যা করতে ব্যর্থ হন। দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকার ফলে বসুদেবের সঙ্গে কারারক্ষীদের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়। বসুদেবের প্রতি রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে এবং বসুদেবের সদ্যোজাত শিশু সন্তানদের হত্যা করতে দেখে ধর্মভীরু কারারক্ষীদের বসুদেবের প্রতি সমবেদনার সৃষ্টি হয়। এই সমবেদনা প্রসূত মানসিক দুর্বলতাতেই কোন কোমল হৃদয় ধর্মভীরু কারারক্ষীর সহযোগিতায় কৃষ্ণের জন্মের সময় বসুদেব কংসের হাত থেকে পুত্র কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হন। কারারক্ষীর সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে বসুদেব পুত্র কৃষ্ণকে নিরাপদে নন্দ-গৃহে রেখে আসতে পারতেন না, তাঁর অন্যান্য পুত্রের মত এই অষ্টম গর্ভজাত পুত্রকেও কংসের হাতে প্রাণ দিতে হত। কিন্তু তা হয়নি শুধু ধর্মভীরু কারারক্ষীদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। প্রকৃতিও কৃষ্ণের জন্মের সময় অনুকূল ছিল। কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন নিশুতি রাতে, যখন সবাই ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিতে

হাজার বছর আগে ভারতের মানচিত্রে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল তা সহজেই অনুমেয়। একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য থাকার দরুন সামগ্রিক ভাবে ভারতের রাজনৈতিক স্বাস্থ্য মোটেই সুস্থ ছিল না। ছোট ছোট রাজ্যগুলোর মধ্যে সব সময়ই ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত এবং এই বিবাদ রাজাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক শত্রুতায় পরিণত হত।

ভারতবর্ষ যখন পঞ্চাল, মৎস্য, সিন্ধু মগধ, বিদেহ, কাশী, বিদর্ভ, কুরু প্রভৃতি এবং আরো বিভিন্ন নামের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল তখন আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শ্রীকৃষ্ণ নামে একজন পুরুষের উল্লেখ দেখতে পাই। শ্রীকৃষ্ণকে তৎকালীন ভারত-বর্ষীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু রূপে বিভিন্ন পুরাণে, মহাভারতে ও একাধিক ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা একজন রাজনৈতিক দার্শনিক হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। পুরাণের মধ্যে অধিকাংশ পুরাণেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পুরাণে ও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনীর গুণকীর্তন হয়ে থাকলেও অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের ঐতিহাসিকতা সন্দেহের শিকার হয়েছে বহু গুণীজন ও বিদগ্ধ সমালোচকের কাছে। তবু শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব যুগের পর যুগ অতিক্রম করে কালোত্তীর্ণ হয়ে ভারতবাসীর হৃদয়ে এক অক্ষয় আসন অধিকার করে রয়েছে যার কোন তুলনা অন্য কোথাও দেখা যায় না। ভক্তি ও শ্রদ্ধার যে আসন শ্রীকৃষ্ণ ভারতবাসীর অন্তরে অধিকার করেছেন সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও ভারতবাসী তাঁকে সেই আসনচ্যুত করবে না। বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তির ওপর শ্রীকৃষ্ণ ভারতের অক্ষয় পুরুষ রূপে বহুকাল থেকে ভারতবাসীর মনোরাজ্যে আধিপত্য করে আসছেন। শ্রীকৃষ্ণের পর বহুকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, বহু মহাপুরুষ, বহু রাজনীতিজ্ঞ ও বহু দার্শনিক ভারতের এই উর্বরা ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু জন-সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউই শ্রীকৃষ্ণকে

স্থানচ্যুত করতে পারেননি। স্থানচ্যুত করার কথা দূরে থাকুক, কেউই জনপ্রিয়তায় শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ করতে সক্ষম হননি। শ্রীকৃষ্ণের অনিঃশেষ অস্তিত্ব সুউচ্চ গগণে তার চিরস্থায়ী জনপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধা নিয়ে একক নক্ষত্রের মত ভাস্বর হয়ে বিরাজমান, আর অন্যরা তথু তাঁরই কক্ষপথে তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

রাজনীতিতে শ্রীকৃষ্ণের এই উত্তরণ সহজ স্বাভাবিক ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে আসেনি। একজন সাধারণ অভিজাত মানব শিশু রূপে জন্মগ্রহণ করে বহু প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানবের মতই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম বহুমুখী এবং ব্যাপক। শ্রীকৃষ্ণ গতির প্রতীক। তাঁর সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে তা কোনোদিন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য কোথাও কখনও মুহূর্তের জন্যও স্থির হয়ে দাঁড়ায়নি। গতিশীলতার এই মহান্ ঐতিহ্যে উজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রামী জীবন অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে দীপ্যমান। অথচ দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষটির রাজনীতি ও সৌজন্যবোধ আশ্চর্য রকমের পরিচ্ছন্ন। রাজনীতির প্রয়োজনে শ্রীকৃষ্ণ শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য সবার মতই কৌশলী এবং কোথাও কোথাও ধূর্ত হলেও রাজনীতির সামগ্রিক নীচতা থেকে তিনি সব সময়েই মুক্ত ছিলেন। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিক ব্যাপকতা শ্রীকৃষ্ণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সর্বোত্তম অঙ্গ। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখলেও, ঘটনা কখনও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিপথগামী করতে পারেনি। উদ্দেশ্য সাধনের দৃঢ়তায় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ক্লান্তিহীন। তাঁর আপাত মধুর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে যে কূটনীতিক আত্মগোপন করে থাকত শ্রীকৃষ্ণের অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষাই তার জনক। একদিকে আত্মসচেতনতা, অন্যদিকে উদাসীন নির্লিপ্ততা এই দুই বৈপরীত্যের সমাবেশে শ্রীকৃষ্ণ শূন্য বিন্দুতে স্থির এক মহান দার্শনিক; এমন একজন দার্শনিক যিনি রাজপদ কামনা

কিন্তু রাজা কংস মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন দেবকী বসুদেবের চক্রান্তের কথা চিন্তা করে। সবকিছু বুঝতে পারলেও কংস শুধু ধৈর্যের সঙ্গে এগোতে লাগলেন, হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নিলেন না এবং নিজের কাকা, জ্ঞাতি অথবা পরিবারের অন্যান্য কোন ব্যক্তির ওপর প্রকাশ্যে কোন রকম অত্যাচার করলেন না প্রজা অসন্তোষ ও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথা চিন্তা করে। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁকে কিছুটা ধৈর্যপ্রদান করেছিল। দীর্ঘদিন তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন এবং দেবকীর প্রসূতিকালে এক কূট পরিকল্পনা রচনা করলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিনি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র প্রজাদের মধ্যে প্রচার করে দিলেন যে, আকাশে দৈববাণী হয়েছে দেবকীর গর্ভজাত সন্তান রাজা কংসকে হত্যা করবে। মথুরার সরলপ্রাণ ধর্মভীরু প্রজারা দৈববাণীর কথা শুনেই বিশ্বাস করে ফেলল। দৈববাণীর অন্তরালে যে কোন কূট পরিকল্পনা আত্মগোপন করে আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারলনা। দেবতার নামে মিথ্যা কথা বলে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যেতে পারে এরকম ধারণা তাদের কাছে অচিন্ত্যনীয় ছিল। দৈববাণীর কথা দ্রুত প্রচার লাভ করে রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রজারা রাজার ভবিষ্যত বিপদের কথা চিন্তা করে নিজেদের ওপর সেই বিপদের প্রতিক্রিয়া কি হবে এই উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করতে লাগল।

পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে এবং দৈববাণীর কথা রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হয়ে যাওয়ার পর কংস আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলেন। তারপর দেবকীর প্রসবকাল নিকটবর্তী হলে হঠাৎ কাউকে কোন রকম প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করলেন। আগেই দৈববাণীর কথা প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় প্রজারা বসুদেব ও দেবকীর গ্রেপ্তারে ব্যথিত হলেও বিশেষ কোন প্রতিবাদ করতে সক্ষম হলনা। তাদের মনে ধারণা হয়েছিল যে সত্যিই

দেবকীর গর্ভজাত পুত্র রাজার জীবননাশ করবে। সুতরাং নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যই রাজা কংস ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে কারারুদ্ধ করেছেন, এতে খুব একটা অন্যায় হয়নি কারণ নিজের প্রাণরক্ষার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। আবার কংসের নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করে বসুদেব দেবকীর জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হচ্ছিল প্রজাদের মনে। এইরকম এক বিমূঢ় মানসিক অবস্থায় প্রজাবৃন্দ হতবিহ্বল হয়ে চুপ করে রইল। কিন্তু দেবকীর পিতা দেবক আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, কন্যাকে কারারুদ্ধ করায় তিনি ক্রুদ্ধহয়ে প্রতিবাদ করলেন। কংসের পিতা উগ্রসেনও পুত্রের এই কার্যের নিন্দা প্রকাশ্যে করলেন। উগ্রসেন ও দেবকের প্রকাশ্য নিন্দায় প্রজাদের এবং কংসের পরিবারের ব্যক্তিগণের মধ্যে আবার ক্ষোভের সঞ্চার হল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চাপে পড়ে কংস বিবেচনার পরিচয় দিলেন। তিনি বসুদেব ও দেবকীকে হত্যা না করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখলেন। কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কংস বেশীদিন নিজের আয়ত্বে রাখতে পারলেন না। তৎকালীন সমাজের বংশানুক্রমিক শত্রুতার কথা স্মরণ করে কংস বসুদেব দেবকীর পুত্র সন্তান কারাগারের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করামাত্র হত্যা করলেন। শিশু হত্যার মত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করায় কংস সমাজে নিন্দিত হয়ে অধার্মিক রূপে চিহ্নিত হলেন। তৎকালে সমাজে প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ভিত্তি ছিল ধর্মপরায়ণতা। কিন্তু বসুদেব-দেবকীর শিশু সন্তান হত্যা করার পর অধার্মিক রাজা কংসের বিরুদ্ধে প্রজা অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি প্রায় কংসের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল।

নিজের ক্ষমতা অটুট রাখতে কংস রাজনৈতিক মিত্রতা প্রসারের কথা চিন্তা করলেন। সেইসময়ে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন সম্রাট জরাসন্ধ। মগধের সম্রাট জরাসন্ধ তৎকালে সামরিক শক্তিতে ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে-

সেই রাত ছিল আচ্ছন্ন এবং ভয়ঙ্কর। প্রজাসাধারণ গৃহে নিদ্রিত এবং পথ নির্জন। কংসের অধিকাংশ প্রহরীও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। এই সময় কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন। সদ্যোজাত শিশুর কান্না প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তারা দেখতে এল দেবকী কি প্রসব করলেন। কারারক্ষীদের দেখতে পেয়ে বসুদেব ও দেবকী সদ্যোজাত শিশুর প্রাণ ভিক্ষার জন্য অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর অনুনয় করতে শুরু করলেন। প্রতিবারই বসুদেব ও দেবকী সদ্যোজাত শিশুর প্রাণ ভিক্ষার জন্য প্রহরীদের কাছে অনুনয় করতেন। কিন্তু রাজার আদেশে প্রহরীরা সেই অনুরোধে ও অশ্রুজলে বিভ্রান্ত না হয়ে রাজাকে গিয়ে প্রসব বার্তা জ্ঞাপন করত এবং যথারীতি কংস এসে ঘাতকের হাতে তুলে দিতেন বসুদেব ও দেবকীর শিশু সন্তানকে। কিন্তু এইবার দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের প্রসব বার্তা রাজা কংসকে জানাতে প্রহরী দ্বিধা-গ্রস্থ হল। দৈববাণীর কথা অনেকদিন ধরে শুনতে শুনতে তারা নিজের অজান্তেই বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে বসুদেব দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান রাজা কংসের জীবননাশ করবে। কাজেই দৈবভয়ে ও সদ্যোজাত শিশুর প্রতি করুণায় প্রহরী নিজ কর্তব্যে অবহেলা করল। প্রহরীর মনের দুর্বলতা অনুমান করে বসুদেব নবজাতককে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করে পুনরায় কারাগারে ফিরে আসার প্রস্তাব করলেন। প্রহরী জানত যে খবর পাওয়ামাত্র রাজা এই নবজাতক শিশুটিকে ঘাতকের হাতে অর্পণ করবেন, মানবিক দৌর্বল্য হেতু প্রহরী তাই বসুদেবের প্রস্তাবে সম্মত হল।

অর্ধবিভ্রান্ত প্রহরী এক চরম দুর্বল মুহূর্তে রাজা কংসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসুদেবের কারাগারের দ্বার খুলে দিল এবং বসুদেব নির্জন পথে প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরোলেন। বসুদেব যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। মথুরা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোন কোন স্থানে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সেইসব অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁকে শ্রদ্ধা করত,

তার ওপর কংস কর্তৃক অত্যাচারিত হওয়ায় বসুদেবের ওপর সেইসব অঞ্চলের জনসাধারণের সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। বসুদেবের সমর্থক অধ্যুষিত এই রকম একটি স্থানের নাম ব্রজ। ব্রজের অধিবাসীরা প্রায় সবাই ছিলেন পেশায় দুগ্ধ ব্যবসায়ী এবং বসুদেবের ও বৃষ্ণিবংশীয়দের গোঁড়া সমর্থক। কংসের অদক্ষ রাজ্য পরিচালনায় এরা চরম কংস বিরোধী হয়ে ওঠেন। স্বভাবে স্বাভাবিকভাবে শান্ত হওয়ায় এই গোপ গোষ্ঠীর কংস বিরোধিতা কখনও অসহিষ্ণু রূপে প্রকাশ পায়নি, যদিও এদের মধ্যে ঐক্য সব সময়েই অটুট ছিল। ঐক্যবদ্ধ এই গোপ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করতেন নন্দ নামে এক দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিমান দুগ্ধ ব্যবসায়ী। নন্দ যথেষ্ট ধনী দুগ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। নন্দের সঙ্গে বসুদেবের খুবই হৃদ্যতা ছিল এবং তিনি ছিলেন বসুদেবের একনিষ্ঠ সমর্থক ও ভক্ত।

প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে শিশু পুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে অনেক কষ্টে বসুদেব ব্রজে এসে পৌঁছলেন। ব্রজে পৌঁছেই তিনি সোজা কৃষ্ণকে নিয়ে এলেন বন্ধু নন্দের গৃহে। বসুদেব কংসের হাতে কারারুদ্ধ হওয়ার পর বসুদেবের আরেক পত্নী রোহিনী নন্দের কাছেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। কংসের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে রোহিনী নন্দের গৃহেই দিন যাপন করছিলেন। সপুত্রক বসুদেবকে এত রাত্রে এই দুর্যোগের মধ্যে আসতে দেখে তাঁরা যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত হলেন। বসুদেব বন্ধু নন্দকে দেবকীর পুত্রসন্তান প্রসব করার সংবাদ জানিয়ে কৃষ্ণকে দেখালেন এবং কাতর অনুনয় করলেন কৃষ্ণের জীবন রক্ষা করার জন্য। নন্দ আগেই দৈববাণীর কথা শুনেছিলেন। কংসের প্রতি বিদ্বেষে এবং বসুদেবের প্রতি ভক্তি ও দৈববাণীর জন্যে নন্দ শিশু কৃষ্ণকে নিজগৃহে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন। ঘটনাচক্রে নন্দের পত্নী যশোদাও একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছিলেন ঐ একই রাত্রে। বুদ্ধিমান বসুদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রহরীর সাহায্যে বাইরে সদ্যোজাত পুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলেও কংস ঠিকই

খবর পাবেন দেবকীর সন্তান প্রসবের এবং পরে দেবকীর কোলে কোন শিশু না দেখলে ক্রুদ্ধ কংস বসুদেবকে, এমনকি ভগ্নী দেবকীকেও হত্যা করতে পারেন। নিজের ও নিজের পত্নীর জীবন রক্ষার জন্য বসুদেব নন্দের কাছে সন্তান বিনিময়ের প্রস্তাব করলেন। তিনি নন্দকে বোঝালেন যে কংস তাঁর ছয়টি পুত্রসন্তান ইতিপূর্বে হত্যা করলেও কোন কন্যাসন্তানকে হত্যা করবেন না। কারণ কন্যাসন্তান ভবিষ্যতে সিংহাসনের দাবীদার হতে পারবে না এবং কংসের ওপর বংশানুক্রমিক শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হবে না। সেই জন্য যশোদার কন্যাসন্তানটি তাঁকে দিয়ে বিনিময়ে তাঁর পুত্রসন্তানটিকে নন্দ প্রতিপালন করলে, নন্দের কোন ক্ষতি হবে না, তাঁর কন্যা জীবিতই থাকবে, কিন্তু বসুদেবের পুত্র সন্তানটির অনেক উপকার হবে : শিশুটির জীবনরক্ষা পাবে। নন্দ আগেই বসুদেবের ভক্ত ছিলেন এখন বসুদেবের কথায় সরলপ্রাণ নন্দ উপকার করার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া না করে সম্মত হলেন। বসুদেবের শিশুসন্তান কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দ বিনিময়ে তাঁর নিজের কন্যাটিকে তুলে দিলেন বসুদেবের হাতে। বসুদেব অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার দুর্যোগের রাতে যশোদার কন্যাটিকে কোলে নিয়ে পথে বেরোলেন।

অন্ধকার ও ঝড়বৃষ্টি অতিক্রম করে বসুদেব পুনরায় ফিরে এলেন কংসের কারাগারে, যেখানে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। নিরাপদে বসুদেবকে ফিরে আসতে দেখে কারারক্ষীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এবং মনে মনে আনন্দিত হল। বসুদেব ফিরে আসার পর কারারক্ষীরা আবার আগের মত বসুদেবকে কারাগারে ঢুকিয়ে কারাগারের দরজা বন্ধ করে দিল এবং সেইসঙ্গে বহির্দ্বার, অন্তর্দ্বার ও পুরদ্বার বিশ্বাসঘাতক প্রহরীরা বন্ধ করে দিয়ে যে যার স্থানে আগের মত কর্তব্য পালন করতে লাগল। অন্ধকার দুর্যোগের রাতে রাজা কংসের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল কেউ জানতেও পারল না।

সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর বিশ্বাসঘাতক প্রহরীরা গিয়ে রাজাকে দেবকীর অষ্টম প্রসববার্তা জ্ঞাপন করল। রাজা তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। প্রহরীর মুখে দেবকীর অষ্টম প্রসববার্তা শুনে তিনি তাড়াতাড়ি সূতিকাগৃহে গেলেন। কংসকে দেখেই বসুদেব ও দেবকী সকরুণ বচনে অনুনয় করে শিশুসন্তানের জীবন ভিক্ষা করতে লাগলেন। যদিও তাঁরা জানতেন যে এবার কংস তাঁদের আর কোন ক্ষতি করতে পারবেন না, কারণ তাঁদের শিশুপুত্র নিরাপদে অন্যের আশ্রয়ে আছে। কিন্তু পাছে কংসের কোনরকম সন্দেহ হয় সেইজন্য তাঁরা ঐরকম অভিনয় করতে লাগলেন। দেবকী চোখে অশ্রু এনে কাতরস্বরে কংসের বহু প্রশংসা করে বললেন, কংসের মত মহান্ রাজার নারী বধ শোভা পায়না, তাছাড়া এই শিশু কন্যাটি তাঁর ভাগিনেয়ী ; এ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বসুদেবও একইভাবে চোখের জলে কাতর অনুনয় করে শিশু কন্যাটির প্রাণ ভিক্ষা করতে লাগলেন কংসের কাছে। বসুদেব ও দেবকীর নিখুঁত অভিনয়ে কংসের মনে কোন সন্দেহ হলনা যে এটি তাঁদের সন্তান নয়, তাঁদের আসল সন্তান অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে। রাজনীতিতে কূটকৌশলী, বুদ্ধিমান, রাজাকংস নারীর চোখের জলে ভুল বুঝলেন। তাঁর প্রথম পরাজয় হল দেবকীর অভিনয়ের কাছে। দেবকীর মুখের সকরুণ বাক্য তাঁর হৃদয়ের মানবিকতায় আঘাত করল। তিনি বিন্দু-মাত্র সন্দেহ না করে বিশ্বাস করলেন যে দেবকীর মেয়ে হয়েছে। তাছাড়া কারারক্ষী ও নগরপ্রহরীদের বিশ্বাসঘাতকতাও তাঁর কাছে অচিন্ত্যনীয়। যথারীতি কংস প্রহরীকে আদেশ দিলেন মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কংসকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছেন দেখে বসুদেব ও দেবকী মনে মনে খুব পুলকিত হলেন, কিন্তু অভিনয় নিখুঁত করার প্রচেষ্টায় নন্দের শিশুকন্যাটির জন্যে বর্ষার জলধারার মতো অজস্র অশ্রুবর্ষন করলেন। যদিও তাঁরা আগেই জানতেন যে এই শিশু কন্যাটির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কংসের প্রশাসনিক দক্ষতা তাঁর পিতার মত না থাকলেও রাজনৈতিক বুদ্ধি কংসের যথেষ্ট পরিণত হয়েছিল অভিজ্ঞতা লাভের ফলে। তিনি জানতেন শত্রুর শেষ রাখা মানেই একদিন না একদিন রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। নিজের খুল্লতাত দেবকের দৌহিত্র একদিন সিংহাসনের দাবীদার হতে পারেন, বিশেষ করে বসুদেবের মত প্রভাবশালী বৃষ্ণিবংশীয় ব্যক্তি যখন তাঁর পিতা। তাই বসুদেবের সন্তানদের বিনাশ করে কংস হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না ভবিষ্যতে কোন দিক থেকে কি ধরনের বিপদ আসে এইকথা ভেবে। তবু সাময়িক স্বস্তিতে তিনি প্রশাসনের মান উন্নয়নের দিকে নজর দিলেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে দক্ষ কর্মী নিযুক্ত করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কংসের গুপ্তচরবিভাগের কর্মীরা খবর নিয়ে এল যে ব্রজে নন্দের গৃহে একটি শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে। অতি সাধারণ সংবাদ, একটি শিশুর জন্ম— সংবাদে চিন্তিত হওয়ার মত কিছু নেই। কংসও চিন্তিত হতেন না যদি এটি একটি শিশুর সাধারণ জন্মসংবাদ হত এবং যদি এই সংবাদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা না থাকত। কিন্তু কংস চিন্তিত হলেন সংবাদটির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে। প্রথম যে কথাটি কংসকে ভাবিয়ে তুলল তা হল দেবকী যেদিন কন্যাসন্তান প্রসব করেন নন্দের শিশুপুত্রটির জন্মও সেদিন হয়েছে। একই দিনে দুটি শিশুর জন্ম হতে পারে, খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু একই দিনে দুই বন্ধুর সন্তান লাভের মধ্যে অস্পষ্ট কোন যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। এছাড়া কংস জানতেন ব্রজবাসীদের ওপর বসুদেবের বিশেষ প্রভাব আছে, যদিও তাঁরা রাজা হিসাবে কংসকে স্বীকার করেন এবং বার্ষিক করও প্রদান করেন, তবু ব্রজবাসীরা বসুদেব এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল। তার ওপর নন্দ বসুদেবের একনিষ্ঠ সমর্থক ও ভক্ত, এবং বসুদেব

কারারুদ্ধ হওয়ার পর বসুদেবের অপর পত্নী রোহিনী তাঁর পুত্রসন্তান বলরামকে নিয়ে নন্দের আশ্রয়েই আছেন। এরকম অবস্থায় নন্দের পত্নী যশোদা পুত্রসন্তান প্রসব করলে সঙ্গত কারণেই কংসের দৃষ্টি নন্দ এবং ব্রজের ওপর প্রসারিত হতে পারে। যে দেবকী ইতিপূর্বে সাতটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন হঠাৎ তিনিই বা কেন এইবার কন্যা সন্তান প্রসব করলেন? যদিও তা ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কংস কিছুতেই কারারক্ষী ও দ্বাররক্ষীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিন্তা করতে না পেরে মনে মনে নানা জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বিভ্রান্ত হতে লাগলেন। তাঁর আরো অস্বাভাবিক মনে হল নবজাতক শিশুটিকে কেন্দ্র করে নন্দ ও ব্রজবাসীদের আনন্দোৎসব। পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে সব সমাজেই আনন্দোৎসব হয় কিন্তু নন্দের শিশু-পুত্রটিকে উপলক্ষ্য করে যেরকম আনন্দোৎসব হচ্ছে তা যেন একটু বাড়াবাড়ি। কংসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই বাড়াবাড়িটুকু ধরা পড়ল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও কংস নন্দকে অথবা তাঁর শিশুপুত্রকে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারলেন না ব্রজবাসীদের অসন্তোষের কথা চিন্তা করে। এমনিতেই ব্রজবাসীরা কংসের ওপর রুষ্ট, তার ওপর তাদের নেতা নন্দের কোন ক্ষতি হলে সেটা তাঁরা কিছুতেই মেনে নেবেন না। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ হওয়াও অসম্ভব নয়। তাছাড়া নন্দের ক্ষতি কংস করবেনই বা কোন অজুহাতে, নন্দ তো রাজার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেন নি। বিনা অপরাধে, কোন অজুহাত ছাড়াই নন্দকে অথবা তাঁর শিশুপুত্রকে কারারুদ্ধ করলে ন্যায়পরায়ণ সমাজ তা কিছুতেই মেনে নেবে না। রাজা কংস তাই অনেক কথা চিন্তা করেও প্রকাশ্যে নন্দের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। তবে গোপনে কংসের গুপ্তচর বাহিনী নন্দ ও তাঁর শিশুপুত্রের ওপর নজর রাখতে লাগল। কংস প্রকাশ্যে নন্দের পুত্র হওয়ার ঘটনাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

তিন

নন্দ বসুদেবের পুত্র সন্তানটিকে আপনজ্ঞানে পালন করতে লাগলেন। বসুদেবের পত্নী রোহিনী এবং নন্দের পত্নী যশোদাও শিশুটিকে নিজের পুত্র মনে করে পরিচর্যা করতে লাগলেন। বসুদেবের শিশুপুত্রের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, এবং পরিচয় প্রকাশ না হয়ে পড়ে, যাতে ব্রজবাসীরা সবাই শিশুটিকে নন্দের পুত্র বলেই মনে করে তার জন্য নন্দ এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন করলেন। এমনিতেই সেই সময় পুত্র জন্মগ্রহণ করলে উৎসবের আয়োজন করা হতো। কিন্তু নন্দ ব্রজের সমস্ত অধিবাসীকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করে ব্যাপক আকারে এক মহোৎসবের আয়োজন করলেন। নন্দ ব্রজবাসী গোপদের নেতা ছিলেন, নন্দের পুত্রলাভে ব্রজবাসী গোপেরা আনন্দিত হয়ে উৎসবে অংশগ্রহণ করলেন। বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করে উপহার সামগ্রী নিয়ে ব্রজবাসীরা নন্দের গৃহে উপস্থিত হয়ে নবজাতককে আশীর্বাদ করলেন। ব্রজরমণীরা বহুবর্ণরঞ্জিত বিচিত্র পোষাক পরিধান করে উৎসব সাজে সজ্জিত হয়ে নন্দের গৃহে গমন করলেন। নন্দ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে স্বস্তিবাচন পূর্বক পুত্রের জাতকর্ম ও যজ্ঞাদিক্রিয়া সম্পন্ন করাবার পর ব্রাহ্মণদের ধেনু দান করলেন। গোষ্ঠীনেতার পুত্রলাভে সমস্ত গোপ গোষ্ঠী আনন্দোৎসব করতে লাগলেন। তাঁরা জানতেও পারলেন না যে যাকে নিয়ে তাঁরা আনন্দোৎসবে এত মত্ত হয়েছেন সেই শিশুটির পিতা নন্দ নন, শিশুটির প্রকৃত পিতা বসুদেব। কংসের কারাগারে দীর্ঘকাল ধরে যিনি বন্দীদশা ভোগ করছেন। নন্দের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার জন্য গোপন কথা প্রকাশ পেল না, কিন্তু নন্দের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল। নন্দ চেয়েছিলেন এই পুত্রোৎসবের মাধ্যমে সমস্ত ব্রজবাসীদের একত্র করে তাদের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি

করতে এবং নিজের জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের আসন অক্ষুন্ন রাখতে। ব্রজবাসীদের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পেলে তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পাবে। নন্দ একথা ভেবেই সমস্ত ব্রজবাসীকে একত্র করার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ ব্রজবাসীদের নিজেদের মধ্যে এখন ঐক্য সুদৃঢ় থাকা প্রয়োজন। যে কোন সময় রাজা কংসের কাছ থেকে ব্রজবাসীদের বিপদ আসতে পারে। ব্রজবাসীরা এবং নন্দ নিজে, আগেই বসুদেবের সমর্থক ছিলেন এখন বসুদেবের শিশুপুত্রটির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কংসের কাছ থেকে তাঁদের বিপদের সম্ভাবনা আরো বেড়ে গেল। এই সম্ভাব্য বিপদের মোকাবিলার জন্যই ব্রজবাসীদের নিজেদের মধ্যে হৃদ্যতা বাড়িয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। একদিকে নন্দ যেমন ব্রজবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেন অপরদিকে তেমনি তিনি নিজের বিশ্বস্ত ব্যক্তির মারফৎ কংসের কারাগারে আবদ্ধ বসুদেবের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখছিলেন এবং বসুদেবের নির্দেশমত কাজ করছিলেন।

পুত্রের জন্মোৎসব পর্ব শেষ হওয়ার পর নন্দ রাজা কংসকে বার্ষিক কর দিতে যাওয়া ঠিক করলেন। নন্দ যথেষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, ধূমধাম করে তাঁর পুত্রের জন্মোৎসব পালনের খবর পেয়ে রাজা কংসের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার প্রয়োজনেই তিনি বার্ষিক কর প্রদানের অছিলায় রাজদরবারে যাওয়া স্থির করলেন। বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সদল বলে নন্দ মথুরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মথুরায় পৌঁছে নন্দ রাজার সঙ্গে দেখা করে বার্ষিক কর প্রদান করলেন। বসুদেবের সমর্থক ও সহযোগী হওয়ায় নন্দের ওপর কংসের সন্দেহ থাকলেও কংস প্রকাশ্যে তাকে কিছু বুঝতে দিলেন না। স্বাভাবিক ভাবেই নন্দের সঙ্গে ব্যবহার করলেন। কর প্রদানের পর নন্দ বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কংস নন্দকে অনুমতি দিলেন। রাজার অনুমতি লাভ করে নন্দ বন্ধু বসুদেবের সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাৎ করলেন। বসুদেব উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁর শিশুপুত্রের

কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। নন্দ বসুদেবকে কৃষ্ণের জাতকর্ম ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার খবর প্রদান করে জানালেন যে শিশু কৃষ্ণ নিরাপদে ব্রজে তাঁর গৃহে অবস্থান করছেন। নন্দ কিন্তু জানতেন না যে তাঁর শিশুকন্যাটিকে বসুদেব মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছেন। যখন তিনি বসুদেবকে তাঁর কন্যাটির কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন বসুদেব সরলপ্রাণ নন্দকে স্বান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর কন্যার মৃত্যুর জন্যে কংসকে দায়ী করে বহু দোষারোপ করলেন এবং কন্যার মৃত্যু সংক্রান্ত একটি অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি করে নন্দকে শুনিয়ে দিলেন। যার মর্মার্থ হল কংস শিশুকন্যাটিকে হত্যার চেষ্টায় পাথরের ওপরে আছাড় মারতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি, কন্যাটি তাঁর হাত থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে ওপারে আকাশে উঠে যায় এবং দেবী মূর্তি ধারণ করে কংসকে অভিশাপ দিয়ে স্বর্গে চলে যায়। কাজেই প্রকৃতপক্ষে নন্দের কন্যার মৃত্যু না হয়ে স্বর্গলাভ হয়েছে, সেইজন্য নন্দের মোটেই কন্যার মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করা উচিত নয়। নন্দ যাঁকে কন্যা ভেবে শোক করছেন আসলে তিনি দেবী, সাধারণ মানব কন্যা না। নন্দ, বসুদেবকে নিজের থেকে সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতেন। জ্ঞান, বুদ্ধি, বংশ প্রভৃতি সবদিক দিয়েই বসুদেব নন্দের মনের ওপর আধিপত্য করতেন। তাই বসুদেবের কথা নন্দ অবাক হয়ে শুনলেন ও বিস্ময়ের সঙ্গে মেনে নিলেন। বসুদেবের মুখে নন্দ তাঁর নিজের কন্যাকে দেবী সম্বোধন করতে শুনে অবাক হয়ে গেলেন এবং বসুদেবের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। নিজের কন্যার মৃত্যুশোক ভুলে গিয়ে নন্দ বসুদেবের কথা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলেন। বসুদেবের ব্যাখ্যায় তাঁর কোন সন্দেহ হল না, কারণ তখনকার দিনে অলৌকিকতার একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল সমাজে এবং বুদ্ধিমান ও সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা অনেক সময়েই নিজেদের স্বার্থে আলৌকিকতাকে ব্যবহার করতেন। নন্দের সঙ্গে কথাবার্তা তাড়াতাড়ি শেষ করে বসুদেব নন্দকে দেরী না করে তাড়াতাড়ি ব্রজে ফিরে যেতে বললেন। কারণ তাঁর সঙ্গে

বেশীক্ষণ কথা বললে নন্দের ওপর কংসের সন্দেহ হতে পারে। কংস যদি ক্রুদ্ধ হয়ে নন্দকে বন্দী করেন অথবা তাঁর কোন ক্ষতি করেন তবে ব্রজের অধিবাসীদের ও শিশু কৃষ্ণের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করার কেউ থাকবে না। প্রধানতঃ নিজের শিশুপুত্রের কথা চিন্তা করেই বসুদেব নন্দকে জোর করে তাড়াতাড়ি ব্রজে ফিরিয়ে দিলেন। নন্দ বসুদেবের একান্ত অনুগত ছিলেন, তাই বসুদেবের কথা শুনে তিনি বেশী দেরী না করে নিজের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মথুরা থেকে সদলবলে ব্রজের দিকে যাত্রা করলেন।

কারাগারে বসুদেবের কাছে শোনা তাঁর কন্যাসন্তানটির হত্যা সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনা নন্দের মনকে বেশ প্রভাবিত করল এবং তিনি কংসের মৃত্যু সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনাটিও বেশ গভীর ভাবেই বিশ্বাস করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল কৃষ্ণই ভবিষ্যতে কংসের জীবন নাশ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। যে অলৌকিক কাহিনী কংস নিজের সুবিধার জন্য প্রচার করেছিলেন ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই অলৌকিক কাহিনীই পরিবর্তিত হয়ে কংসের বিরুদ্ধ জনমানসে অনুঘটকের কাজ করতে লাগল। বসুদেবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি কংসের এই অলৌকিক কাহিনী প্রচারের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই অলৌকিক কাহিনী প্রচার করে বিরুদ্ধ-জনমানসকে সাময়িক ভাবে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সক্ষম হয়ে কংস যে প্রাথমিক সুবিধাটুকু ভোগ করছিলেন, বসুদেব কংসের কারাগারে বন্দী অবস্থায় অসহায় হয়ে কংসের সেই অলৌকিকঘটনা-প্রাপ্ত সুবিধাটুকু নষ্ট করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এবং প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই তা কাজে লাগালেন। যে মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণকে নিয়ে নিরাপদে নন্দের গৃহে রেখে, পরিবর্তে নন্দের কন্যাকে নিয়ে কারাগারে প্রত্যাবর্তন করলেন সেই মূহূর্তেই বসুদেবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল এবং তিনি কংসের প্রচারিত অলৌকিক কাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য অপর এক অলৌকিক কাহিনী মনে মনে তৈরী

করে রাখলেন। তারপর নন্দের শিশুকন্যাটিকে কংস প্রহরীর হাতে তুলে দেওয়ার পর বসুদেব পূর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন তাঁর তৈরী করা অলৌকিক কাহিনী প্রচারের। নন্দ বসুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এলে বসুদেব এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করলেন। নন্দের কন্যা সন্তান হারানোর শোক এবং কংসের অলৌকিক কাহিনী এই দুটিকেই তিনি থামিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। বসুদেবের এই বুদ্ধিপূর্ণ অলৌকিক কাহিনী প্রচারের ফলে কংসের প্রচারিত অলৌকিক কাহিনী তাঁর নিজেরই বিপক্ষে কাজ করতে লাগল। বসুদেবের মুখ থেকে নন্দ, কন্যার মৃত্যু সংক্রান্ত অলৌকিক কাহিনী শুনে ব্রজে ফিরে জন-সাধারণের মধ্যে তা প্রচার করলেন এবং ধীরে ধীরে সমস্ত ব্রজ ও মথুরার জনসাধারণ জেনে গেল যে আবার দৈববাণী হয়েছে এবং এবারের দৈববাণী আগের দৈববাণীকেই সমর্থন করেছে। বসুদেবের পুত্রের হাতে কংসের মৃত্যু অবধারিত, কারণ বসুদেবের কন্যাটিকে কংস হত্যা করার চেষ্টা করায় সেই কন্যা দেবীরূপ ধারণ করে স্বর্গে গমন করে এবং স্বর্গে যাওয়ার আগে কংসকে অভিশাপ দিয়ে যায় যে বসুদেবের পুত্রের হাতেই কংসের মৃত্যু হবে।

এই কাহিনী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কংসের বিরুদ্ধবাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন এবং কংসের অত্যাচারের কথা জন-সাধারণকে গোপনে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। আস্তে আস্তে জনসাধারণের মন থেকে কংসের প্রতি সহানুভূতি কমে যেতে লাগল এবং দৈববাণীর কথা স্মরণ করে যাদব সমাজ বসুদেবের প্রতি ক্রমশঃ সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে লাগলেন। কংস ক্রমেই জনমানস থেকে নিজের অজান্তেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন।

বসুদেবের প্রচারিত অলৌকিক কাহিনীর ফলে নন্দের কাছে কৃষ্ণের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠল এবং তিনি ও তাঁর পত্নী যশোদা খুব যত্নের সঙ্গে সাবধানে কৃষ্ণের পরিচর্যা করতে লাগলেন। ব্রজধামে নন্দের গৃহে কৃষ্ণের শৈশব অতিবাহিত হতে লাগল সতর্কতার

সঙ্গে ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে। নন্দ দুগ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁর গৃহে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য দ্রব্যাদির অভাব ছিল না। স্নেহ জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে নিয়মিতভাবে সেবন করে শিশু কৃষ্ণ সুষমভাবে বেড়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর দেহ এবং মস্তিষ্কের পুষ্টি যথাযথ ভাবেই ঘটতে লাগল। বয়সের তুলনায় তাঁর দেহে শক্তি অনেক বেশী ছিল এবং সমবয়সীদের অনুপাতে তিনি অনেক বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে শিশু কৃষ্ণ বেশ দুরন্ত ছিলেন।

দুই মাতা যশোদা ও রোহিণীর সতর্ক পরিচর্যায় শিশু কৃষ্ণের শৈশব অতিবাহিত হলেও দুরন্তপনার জন্য কৃষ্ণকে শৈশবে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাছাড়া বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষ্ণের শৈশবে তাঁর জীবন অনেক ক্ষেত্রেই বিপন্ন করে তুলেছিল। নিরাপদ শান্ত শৈশব কৃষ্ণ অতিবাহিত করেননি। কৃষ্ণের শৈশব জীবনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপদ পরবর্তী কালে অলৌকিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত হয়ে কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কৃষ্ণ যশোদা, রোহিনী এবং নন্দের নয়নের মণি ছিলেন তাই শৈশবে কৃষ্ণের অতি সামান্য প্রাকৃতিক বিপদকেও তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল কৃষ্ণের জীবনের সমস্ত ঘটনাই দৈব অথবা আসুরিক সম্পর্কযুক্ত। শিশু কৃষ্ণের জীবনের সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের তাই দৈবী অথবা আসুরিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা নিজেদের মানসিক সন্তুষ্টিবিধান করতেন। কংসের প্রচারিত দৈববাণী এবং বসুদেবের অলৌকিক গল্প গভীর ভাবে তাঁদের মনে গেঁথে যাওয়ায় তাঁরা ভাবতেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একই ধরণের প্রাকৃতিক ঘটনা অন্য কোন শিশুর জীবনে ঘটলে এত সতর্কতার সঙ্গে তা পর্যবেক্ষণ করা হতো না এবং তার কোন আধিভৌতিক ব্যাখ্যা কেউ খুঁজতেন না। সাধারণ প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাতেই সবাই সন্তুষ্ট থাকতেন।

কৃষ্ণের পক্ষে মঙ্গলজনক সমস্ত কিছুই শিশু কৃষ্ণের দৈবীশক্তির প্রতীক এবং অশুভ সবকিছু দেবতার বিপরীত অসুরের অনিষ্টকারী

শক্তির পরিচায়ক। দেবতা ও অসুরের ধারণা ভারতীয় চিন্তায় বহুপ্রাচীন সুতরাং কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা নতুন এবং আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু কৃষ্ণকে ব্রজের জনসাধারণ তাদের গোষ্ঠীনেতা নন্দের পুত্র বলেই জানতেন এবং সেইজন্যই কৃষ্ণের জন্য যশোদা, রোহিণী ও নন্দের উদ্বিগ্নতা তাঁদেরও হৃদয় স্পর্শ করত এবং তাঁরাও নন্দের মতই কৃষ্ণের শৈশবের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার অলৌকিক চিন্তার শরিক হতেন। এই রকম বহু প্রচারিত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার মধ্যে কৃষ্ণের শৈশব জীবনে পুতনা বধ, তৃণাবর্ত সংহার, শকট ভঞ্জন, মাতা যশোদাকে বিশ্বরূপ দর্শন করানো প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইভাবে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে হাতে প্রাণ নিয়ে কৃষ্ণ শৈশব থেকে কৈশোরে পৌঁছলেন।

শৈশবের মত কৃষ্ণের কৈশোরে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা নেই। কিশোর কৃষ্ণের জীবনের ঘটনায় শৈশবের মত অলৌকিকতা আরোপিত হলেও প্রধানতঃ তা একজন সাহসী কিশোরের কাহিনী। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ডানপিটে কৃষ্ণ বহু সাহসের কাজ করে ব্রজ-বাসীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন। কৈশোরে কৃষ্ণের জীবনে বিভিন্ন সাহসিক ঘটনার মধ্যে যে সব ঘটনায় ব্রজবাসীরা অল্পবিস্তর উপকৃত হয়েছিলেন, সেই সব কাহিনীই জনপ্রিয়তা লাভ করে অলৌকিকতায় পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। কালিয় দমন ও দাবানলপান প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। যদিও অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা তবু কৃষ্ণের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে ঐ সব ঘটনা বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী হয়েছিল।

উদাহরণ স্বরূপ কালিয় দমনের কথা ধরা যেতে পারে। কালিন্দি নামে এক হ্রদে একটি বিষধর সর্প থাকত। বিরাট আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য সর্পটি বিখ্যাত ছিল। আকৃতিতে বিরাট এবং স্বভাবে হিংস্র ও বিষধর হওয়ায় ঐ হ্রদের জল ব্রজের জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারতেন না। ভয়ে কালিন্দি হ্রদের কাছে কেউ যেতে সাহস করতেন না, ফলে পরিত্যক্ত কালিন্দি ছিল হিংস্র ও বিষধর সর্পের

আবাস স্থল। কালিন্দির সুমিষ্ট জল ব্যবহার করতে না পারায় ব্রজের জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট দুঃখ ছিল, কিন্তু সাহস করে কেউ কালিন্দির সর্পনিধনে এগিয়ে আসতেন না, প্রাচীন ধারণার বশবর্তী হয়ে যে কালিন্দি নাগরাজের আবাস স্থল। কিন্তু তরুণ কৃষ্ণের কাছে প্রাচীন কুসংস্কারের বিশেষ মূল্য ছিল না, তিনি কালিন্দির সর্পকাহিনী শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রকৃত ঘটনা কি। সাহসী কৃষ্ণ তাই কুসংস্কারের বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে কালিন্দির জলকে আবার জনসাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলার জন্য সর্প নিধনের পরিকল্পনা করলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে একদিন কৃষ্ণ কালিন্দির তীরে গমন করে এক বিরাট বিষধর সর্পের দেখা পান এবং সাহসের সঙ্গে সেই সর্পকে নিধন করেন। কৃষ্ণ কালিন্দির তীরে গমন করেছেন এই সংবাদ শুনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রজবাসীগণ ভীতচিত্তে সমবেত ভাবে কালিন্দির তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে কৃষ্ণ এক বিরাট বিষধর সর্পের নিধনে ব্যস্ত। সর্পের বিরাট আকৃতি দেখে ব্রজবাসীরা ঐ সর্পটিকেই তাদের কল্পিত নাগরাজ বলে মনে করলেন এবং নাগরাজ নিধনকারী কৃষ্ণ তাঁদের কাছে আরো প্রিয় হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক সর্পের নিধনের পর ব্রজের জনসাধারণের মন থেকে কুসংস্কার ও কালিন্দী সম্বন্ধে ভয় দূর হয়ে যায় এবং তাঁরা আবার কালিন্দির জল নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করেন। কৃষ্ণ কর্তৃক উপকৃত ব্রজবাসীগণের কৃতজ্ঞ চিত্তে কৃষ্ণের আসন আরো দৃঢ় হয় এবং কৃষ্ণের মধ্যে তাঁরা দৈবীশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করেন।

ক্রমে লোকপরম্পরায় এই কাহিনী প্রচলিত হতে হতে বিবর্তিত হয়ে অলৌকিক রূপ ধারণ করে। এই অলৌকিক কাহিনী অনুযায়ী কদ্রুর পুত্র ভয়ংকর নাগরাজ কালীয়ের সঙ্গে গরুড়ের বিবাদ শুরু হয়। গরুড়ের ভয়ে কালিয় কালিন্দি হ্রদে আশ্রয় নেন। সৌভরি ঋষির অভিশাপে কালিন্দি গরুড়ের অগম্য ছিল। ফলে কালিয় নিরাপদে কালিন্দিতে আধিপত্য বিস্তার করে বসবাস করতে থাকেন। নাগরাজ

কালিয়ের বিষ বাষ্পের প্রভাবে কালিন্দি হ্রদের জল সবসময় উত্তপ্ত হয়ে ফুটত। সহস্র মাথা, উত্তপ্ত কটাহের মত চক্ষু ও মুখ দিয়ে অগ্নিশিখা নির্গত করে নাগরাজ ঐ হ্রদের মধ্যে অনেক স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্র নিয়ে বসবাস করতেন। নাগরাজ ও তার বংশকুলের বিষ বাষ্পের প্রভাবে কালিন্দি হ্রদের জল এতই বিষাক্ত হয়েছিল যে ঐ হ্রদের ওপর দিয়ে কোন পাখী উড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ বিষক্রিয়ার প্রভাবে হ্রদের জলে পড়ে ঐ পাখীর মৃত্যু ঘটত। হ্রদের চারপাশের বিষাক্ত বায়ুর সংস্পর্শে কোনো প্রাণী এলে তৎক্ষণাৎ সেই প্রাণীর মৃত্যু হত। কালিন্দির তীরের সমস্ত বৃক্ষ নাগরাজের বিষ বাষ্পের প্রভাবে মৃতরূপ ধারণ করেছিল। শুধু একটি কদম গাছ মারা যায়নি, কারণ অমৃত নিয়ে যাওয়ার পথে গরুড় সেই গাছটিতে বসে ছিলেন। অমৃত ভাণ্ডের স্পর্শে ঐ কদম বৃক্ষ তাই অমর হয়েছিল। নাগরাজ কালিয়ের বিষ-প্রভাব থেকে কালিন্দিকে মুক্ত করার ইচ্ছায় অতঃপর কৃষ্ণ ঐ অমর কদম বৃক্ষটিতে আরোহণ করে বৃক্ষের মাথা থেকে কালিন্দি হ্রদের জলে লাফিয়ে পড়লেন। কৃষ্ণের পতনে কালিন্দির জল আলোড়িত হল এবং ক্রুদ্ধ নাগরাজ সহস্র মাথা নিয়ে ফণা বিস্তার করে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কালিয়ের উদ্যত ফণার ওপরে আরোহণ করে নৃত্য করতে লাগলেন। কালিয়ের নাক দিয়ে বিষ বাষ্প ও মুখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল। কিন্তু কৃষ্ণ কালিয়ের সহস্র ফণা একেকটিকে পদাঘাতে নত করে দিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে কালিয় নাক মুখ দিয়ে রক্ত বমন করে অচেতন হয়ে পড়লেন। কালিয়কে অচেতন হয়ে যেতে দেখে তাঁর পত্নীরা এসে কৃষ্ণের স্তবস্তুতি শুরু করলেন। নাগরাজের পত্নীদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ কালিয়ের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন এবং কালিয়কে কালিন্দি ত্যাগ করে সমুদ্রের মধ্যে রমনক দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করার আদেশ দিলেন। কৃষ্ণের আদেশে কালিয় তাঁর পুত্র, পৌত্র ও স্ত্রীদের নিয়ে কালিন্দি হ্রদ ত্যাগ করে চলে গেলেন। কালিন্দির জল বিষমুক্ত হল।

কিশোর কৃষ্ণ এইভাবে গ্রাম্যজীবনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের মধ্যে নানারকম সাহসের কাজ করে নাম কিনতে লাগলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব সাহসিক কাজকর্মের যত বিস্তার ঘটতে লাগল ততই কৃষ্ণের চারপাশে ব্রজের তরুণ ও যুবকদের একটি ভক্ত মণ্ডলী গড়ে উঠতে লাগল। তরুণ কৃষ্ণ নবযৌবনের প্রারম্ভেই নিজের সহজাত গুণের দ্বারা এই যুবক ভক্তমণ্ডলীর নেতৃত্ব করতে লাগলেন। কৃষ্ণের যৌবনের কাহিনী তাঁর শৈশবের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও কৈশোরের দুঃসাহসিকতার কাহিনী থেকে আলাদা। যুবক কৃষ্ণের ভূমিকা অনেক পরিণত ও ব্রজের জনসাধারণের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা বর্ধনকারী। নিজের গুণাবলী সম্বন্ধে সচেতন কৃষ্ণ বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে ব্রজবাসীদের মধ্যে নিজের প্রভাববৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিলেন। সুচতুর বুদ্ধির প্রয়োগে যুবক কৃষ্ণ ধীরে ধীরে তাঁর মাধুর্য্যমণ্ডিত নম্র ব্যবহার দ্বারা ব্রজবাসীদের হৃদয় অধিকার করতে লাগলেন। ব্রজের আপামর জনসাধারণের মধ্যে কৃষ্ণের জনপ্রিয়তা বর্ধিত হতে লাগল। সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে ও বিভিন্ন উৎসবে তিনি ক্রমশই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে লাগলেন। তৎকালীন সমাজে স্ত্রীপুরুষের যৌথ নৃত্যগীতাদি প্রচলিত ছিল। কোন ধর্মীয় অথবা সামাজিক উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে এই ধরনের যৌথ নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হত। কৃষ্ণের মধুর ব্যবহার ও তাঁর যৌবনদীপ্ত কান্তি এই ধরনের উৎসবাদিতে ব্রজের যুবতী নারীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। ব্রজের নারীদের মধ্যে কৃষ্ণ বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাঁর সাহস, সুস্বাস্থ্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি গুণের জন্য ব্রজের নারীরা কৃষ্ণকে তাঁদের হৃদয়ে জনপ্রিয় নেতার আসনে স্থাপিত করেছিলেন। নারীহৃদয় জয়ী কৃষ্ণের প্রতি ব্রজনারীদের এই সমর্থন ও আকর্ষণ পরে পরিবর্তিত হতে হতে কৃষ্ণকে প্রায় এক চরিত্রহীন লম্পটের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। কাব্যিক অলংকরনের প্রভাবে কৃষ্ণের যৌবন শুধুই এক প্রেমিক রূপে চিত্রিত। এমন এক প্রেমিক যাকে কামনা করে ব্রজের সমস্ত যুবতী নারী নিজের নিজের গৃহ, পতি.

ভ্রাতা, পিতা সব ত্যাগ করে লাজ লজ্জা বিসর্জ্জন দেয়। কৃষ্ণের সামাজিক ভূমিকা ও জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রচেষ্টা সেখানে উপেক্ষিত। যদি কৃষ্ণ প্রকৃতই শুধু প্রেমিক হতেন এবং তাঁর জন্য ব্রজের সমস্ত যুবতী নারী স্বামী, পিতা, ভ্রাতাকে ত্যাগ করে কৃষ্ণকে কামনা করতেন তাহলে যুবক কৃষ্ণ রাজনীতিতে কংসের বিরুদ্ধে কখনো সাফল্য লাভ করতে পারতেন না। ক্ষুব্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বামী ও ভাইদের কাছ থেকে তিনি লাভ করতেন চরম শত্রুতা, সমর্থন নয় এবং ব্রজ জনসাধারণের কাছে তিনি পরিচিত হতেন এক সাধারণ চরিত্রহীন পুরুষ রূপে। কংসের বিরুদ্ধে রাজনীতির লড়াই লড়বার মত কোনো মদত তিনি ব্রজবাসীদের কাছ থেকে পেতেন না। প্রকাশ্যে চরিত্রহীন বলে পরিচিত কোনো লোকই পায়না। রাজনীতিতে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ্য ভাবমূর্তি নিষ্কলঙ্ক রাখাই সাফল্যের মূলকথা। কৃষ্ণের মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির এই সামান্য বুদ্ধিটুকু ছিল বলেই অনুমান করা যায়। পৃথিবীর অন্যসব যুবকের মতই যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে কৃষ্ণের যৌবনেও প্রেমের ঘটনা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই প্রেম কখনও শোভনতার সীমা লংঘন করে ব্রজের জনসাধারণ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেনি এবং তাঁর জনপ্রিয়তা খর্ব করে তাঁকে হেয় করেনি। ব্রজনারীদের কাছে কৃষ্ণের জনপ্রিয়তা কৃষ্ণের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভেরই সূচনা, তাঁর সামগ্রিক জনপ্রিয়তারই অঙ্গ। এই জনপ্রিয়তার দ্বারাই কৃষ্ণ নিজেকে ব্রজের জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে কংসের বিরুদ্ধে রাজনীতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন। কংসের অত্যাচারে রুষ্ট যাদব সম্প্রদায় ও ব্রজবাসীগণ মধুরভাষী, সাহসী ও বুদ্ধিমান কৃষ্ণকে ধীরে ধীরে নিজেদের অজান্তেই নেতৃপদে স্থাপন করতে লাগলেন। কৃষ্ণও এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে পিতামাতা ও বংশের শত্রু কংসকে বিনাশ করার চেষ্টায় নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

ব্রজ সমাজে কৃষ্ণের জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নন্দ ও

কৃষ্ণের বন্দী পিতা বসুদেব এবং অন্যান্য কংস বিরোধীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। সময় উপযুক্ত বিবেচনা করে তাঁরা কংসের পতনের জন্য সর্বতোভাবে সক্রিয়ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এতদিন কৃষ্ণ গোপনে নন্দের গৃহে পালিত হচ্ছিলেন এবং বসুদেব কংসের কারাগারে বন্দী থেকেও বিশ্বাসঘাতক প্রহরীদের মারফৎ নন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখন কৃষ্ণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ব্রজের যুবকেরা নন্দের নেতৃত্বে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে কংসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামকেও সেইভাবে পরিচালনা করা হচ্ছিল। বিভিন্ন প্রকার বাহুযুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে নানাপ্রকার দৈহিক শক্তির কলাকৌশল শিখিয়ে তাদের ভবিষ্যত নেতৃত্বের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হতে লাগল। কৃষ্ণের সমসাময়িক সমস্ত গোপযুবককে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করা হতে লাগল। তৎকালীন সামাজিক নিয়মানুসারে নিম্নশ্রেণীর গোপেরা কৃষ্ণকে স্বাভাবিক ভাবেই নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তার ওপর নন্দের প্রভাব ও পরিচালনা তো ছিলই।

এইভাবে ধীরে ধীরে প্রশিক্ষণের মারফৎ এক গোপবাহিনী প্রস্তুত করার পর এবং কৃষ্ণ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হলে সুচতুর এক পরিকল্পনা রচনা করা হল। প্রথমে কংসের কিছু বিশ্বস্ত অমাত্য ও বন্ধুকে বিভিন্ন উপায়ে দৈববাণী ইত্যাদির কথা শুনিয়ে বশীভূত করে কংসের বিপক্ষে এবং কৃষ্ণের পক্ষে নিয়ে আসা হল। এই বেইমান অমাত্য গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিলেন কংসের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন অক্রূর। এঁরা কংসকে বিপথে চালিত করলেন। ক্ষমতার লোভে অক্রূর ও তাঁর বন্ধুরা কংসের পতন ত্বরান্বিত করতে এক ক্রূর চক্রান্ত রচনা করে নন্দ ও বসুদেবের সঙ্গে হাত মেলালেন। অক্রূর কংসের বিরুদ্ধে কোনো নীতিগত কারণে যাননি, তিনি কংস বিরোধী হয়েছিলেন শুধু ক্ষমতার লোভে, কারণ অক্রূর কখনই কাউকে বেশী ক্ষমতাশালী সহ্য করতে

পারতেন না। অক্রুর ও কংসের অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যরা কংসকে বোঝালেন যে চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ উৎসব উপলক্ষে বিশাল এক মল্লযুদ্ধের আয়োজন করা হোক এবং রাজমল্লদের সঙ্গে ব্রজের দুই তরুণ মল্লযুদ্ধ-পারদর্শী কৃষ্ণ ও বলরামের মল্লযুদ্ধের আয়োজন করে তাদের পুরস্কৃত করা হোক। কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লযুদ্ধে আমন্ত্রণ জানিয়ে পুরস্কৃত করলে ব্রজের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মন থেকে রাজা কংসের প্রতি বৈরী-ভাব কমে যাবে এবং তাদের মধ্যে কংসের মহানুভবতা প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষ্ণ ও বলরামের ওপর কংসের সন্দেহ বহু আগের থেকেই ছিল। নিজের বিশ্বাসভাজন অমাত্যদের মুখে কৃষ্ণ ও বলরামের নাম শুনে কংস দ্বিধাগ্রস্থ হলেও অমাত্য ও বন্ধুদের চাপে পড়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ধূর্ত কংস সেই সঙ্গে কাউকে না জানিয়ে নিজস্ব এক পরিকল্পনা রচনা করে রাখলেন কৃষ্ণ ও বলরামকে নিধন করার জন্য। কংস তাঁর নিজস্ব গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিখ্যাত ও বলশালী রাজমল্লদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের মল্লযুদ্ধের আয়োজন করবেন ঠিক করলেন। অসীম বলশালী রাজমল্লদের সঙ্গে যুদ্ধে কৃষ্ণ ও বলরাম পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে কারুর কিছু বলার থাকবে না এবং কংসও নিরাপদ হবেন। কংসকে কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যুর জন্য কেউ দোষারোপ করবে না, কারণ তাঁরা তো ক্রীড়াঙ্গনে মৃত্যুবরণ করেছেন।

কংসের পরিকল্পনা ঠিকই ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন না প্রিয় বন্ধু ও অমাত্যদের পরামর্শে যে কৃষ্ণ ও বলরামকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তাঁরাও সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হয়েই আসছেন এবং তাঁদের সেই প্রস্তুতিতে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন তাঁরই প্রিয় অমাত্য ও পারিষদ বৃন্দ। বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে অজ্ঞ কংস তাঁর প্রিয় পার্ষদ অক্রুরকে অনুরোধ করলেন ব্রজে গিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে আসার জন্য। বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরাই একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করতে সক্ষম হয়। রাজাদের বেলায় একথা আরো বেশী প্রযোজ্য। ক্ষমতা

লোভী অমাত্যরা চিরকালই বন্ধুর ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে বেইমানী করে থাকে। কংসের বেলায়ও তাই হল, কংস স্বপ্নেও ভাবতে পারলেন না যে অক্রূর কোনভাবে কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে জড়িত। একমাত্র অক্রূরকেই পূর্ণ বিশ্বাস করে কংস তাঁর গোপন পরিকল্পনা খুলে বলে অনুরোধ করলেন—হে অক্রূর! তুমি আমার পরম বন্ধু। ভোজ ও বৃষ্ণিবংশে তোমার তুল্য হিতকামী বন্ধু আমার আর কেউ নেই। তুমিই আমার একমাত্র সুহৃদ যে আমার প্রকৃত উপকার করতে পারে। তাই তুমিই নন্দব্রজে গিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মল্লযুদ্ধে আমন্ত্রণ করে এখানে নিয়ে এস।

অক্রূর সানন্দে সম্মত হলেন। রাজাকে সম্বোধন করে পুলকিত বেইমান অক্রূর বললেন--হে রাজা! বিচার করে তুমি যা স্থির করেছ তা ভালই হয়েছে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমভাবে চিন্তা করে তোমার এই সিদ্ধান্ত যথোচিত হয়েছে। এতে তোমার মৃত্যু নিবারিত হবে। আমি অবশ্যই তোমার আজ্ঞা পালন করব।

কংসকে বাক্য দ্বারা তুষ্ট করে অক্রূর নির্দিষ্ট দিনে সানন্দে কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে আসার জন্য ব্রজের দিকে যাত্রা করলেন। পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনায় পুলকিত অক্রূর কিভাবে আরো বেশি করে কৃষ্ণের বিশ্বাসভাজন হওয়া যায় এবং কংসের পতনের পর তার হাতে কতটা ক্ষমতা আসে এই চিন্তা করতে করতে সূর্যাবসানের সময় রথে করে গোকুলে উপস্থিত হয়ে ব্রজের গো-দোহন স্থানে কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরকে যথোচিত সম্ভাষণ করে নিজগৃহে নিয়ে এলেন। তারপর প্রথানুযায়ী উৎকৃষ্ট ভোজনে ও ব্যজনে অতিথি সৎকার করলেন। সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ব্যঞ্জনে ভোজন গ্রহণ করে পরিতুষ্ট অক্রূর তারপর গোপনেতা নন্দ এবং কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে গোপন চক্রান্তের রূপদানে আলোচনায় বসলেন।

প্রথমে নন্দ অক্রূরকে কংসের রাজ্যশাসন ও প্রজাদের মনোভাব

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। স্পষ্টতঃই নন্দের উদ্দেশ্য ছিল কংসের বিরুদ্ধে প্রজা-অসন্তোষের মাত্রা কতটা তা জেনে নেওয়া। অক্রুর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে কিভাবে কংসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছেন এবং কংসের অন্যান্য অমাত্য ও বন্ধুদের মনোভাব কি তা বর্ণনা করলেন। তারপর কংসকে বিভ্রান্ত করে চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব উপলক্ষে কৃষ্ণ ও বলরামের জন্য কংসের কাছ থেকে মল্লযুদ্ধের আমন্ত্রণ আদায় করার কথা জানালেন। সেই সঙ্গে অক্রুর নন্দকে কংসের গোপন পরিকল্পনার কথাও জ্ঞাপন করলেন। কংস কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরামের নিধনের জন্য মহাবলশালী রাজমল্লদের প্রস্তুত করেছেন এবং মল্লযুদ্ধকে কিভাবে নিজের আত্মরক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চান বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। নন্দ অক্রুরের কাছ থেকে কংসের এই পরিকল্পনা জ্ঞাত হয়ে কিভাবে কংসকে নিধন করে কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ করা যায় অক্রুরের সঙ্গে সেই আলোচনা শুরু করলেন। নন্দ অক্রুরকে জানালেন গোপবাহিনী কিভাবে কতটা প্রস্তুত হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষ্ণ ও বলরাম কংসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মথুরায় যাবেন এবং তাঁদের সঙ্গে সুশিক্ষিত গোপবাহিনী জনসাধারণের ছদ্মবেশে দর্শক হিসাবে যাবে ও দর্শকের আসন গ্রহণ করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে স্থির হল।

নির্দিষ্ট সময়ে কৃষ্ণ ও বলরাম অক্রুরের রথে চড়ে রাজা কংসের রাজধানী মথুরার দিকে যাত্রা করলেন। নন্দ ও অন্যান্য গোপেরা পূর্ব-পরিকল্পনানত প্রয়োজনানুযায়ী প্রস্তুত হয়ে শকটে মথুরার দিকে যাত্রা করলেন। দিনের শেষে তাঁরা মথুরায় এসে পৌঁছলেন। সেখানে পূর্বেই অক্রুরের রথে চড়ে কৃষ্ণ ও বলরাম উপস্থিত হয়েছিলেন। নন্দ ও অন্যান্য গোপদের উপস্থিত হতে দেখে কৃষ্ণ অক্রূরকে নগরে প্রবেশ করে নিজগৃহে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন। অক্রুর কৃষ্ণ, বলরাম ও নন্দকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানালে সাবধানী ও চতুর কৃষ্ণ বিনীতভাবে তা প্রত্যাখান করে জানালেন যে তাঁরা এখানেই বিশ্রাম করবেন এবং

পরে নগর পরিদর্শনে যাবেন। অক্রূর অগত্যা একাই নগরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। কৃষ্ণ অক্রূরের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করলেন এই জন্য যে নগরে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিয়ে চূড়ান্ত ভাবে প্রস্তুত হয়ে শত্রুনগরীতে প্রবেশ করা প্রয়োজন। অক্রূরকে বিশ্বাস করলেও কৃষ্ণ, বলরাম ও নন্দ পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না, প্রয়োজনের তাগিদে অক্রূরের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র। তাই তাঁরা শত্রুনগরীর ভিতরে অক্রূরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করা উপযুক্ত মনে করলেন না কারণ শত্রুনগরীতে প্রবেশ করে হঠাৎ কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে তৎক্ষণাৎ তার মোকাবিলা করার জন্য আগেই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য নিজের লোকজনের সঙ্গেই সবসময় থাকা বাঞ্ছনীয়।

অক্রূর নগরে প্রবেশ করে রাজা কংসকে কৃষ্ণ, বলরাম ও তাদের সঙ্গে আগত গোপদের আগমনবার্তা জানিয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। পরে কৃষ্ণ গোপবাহিনী পরিবৃত হয়ে নগরীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। মল্লযুদ্ধের সময় পূর্বপরিকল্পনা মত গোপবাহিনী প্রস্তুত হয়ে দর্শকের আসন গ্রহণ করল। রাজা কংস রাজমঞ্চে বিশেষ আসন গ্রহণ করলেন। মল্লযুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশে পুরবাসীদের জন্য নির্মিত মঞ্চে মথুরার নাগরিকেরা আসন গ্রহণ করলেন। ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব যাদব সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ উৎসব। রাজানুকূল্যে এই উৎসব তৎকালীন যাদব সমাজে সর্বপ্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছিল। উৎসব উপলক্ষে মল্লযুদ্ধের মঞ্চ মালা, পতাকা প্রভৃতি দিয়ে সাজান হয়েছিল। সমস্ত সম্প্রদায়ের মথুরাবাসীরা বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দর্শকের মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। কংসের অমাত্যরাও রাজা কংসের জন্য নির্মিত রাজমঞ্চের চারিপাশে আসন গ্রহণ করলেন। আসন গ্রহণ সম্পূর্ণ হলে কৃষ্ণের সমভিব্যাহারী গোপেরা রাজা কংসকে উপঢৌকন প্রদান করলেন। সামাজিক রীতি বিনিময়ের পালা শেষ হলে শুরু হল বাদ্য। রঙ্গস্থানে তূরী ও ভেরী বাজতে লাগল। তারপর রাজা কংসের

মল্লরা একে একে ক্রীড়া মঞ্চে প্রবেশ করতে লাগলেন। প্রথমে এলেন চানুর, তারপর মুষ্টিক, তোশল, কূট, শল প্রভৃতি খ্যাতনামা মল্লরা। কংসের মল্লদের মঞ্চে প্রবেশ শেষ হলে কৃষ্ণ ও বলরাম মঞ্চে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করলেন তাঁদের একান্ত ঘনিষ্ঠ ও মল্লযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী কয়েকজন বিশিষ্ট গোপ।

কৃষ্ণ ও বলরামকে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখে চানুর এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলেন। চানুর বললেন—হে কৃষ্ণ ও বলরাম! রাজা কংস তোমাদের বাহুবল ও বীরত্বের খ্যাতি শুনে তোমাদের শক্তি পরীক্ষার জন্য এখানে আহ্বান করেছেন। রাজার মনোরঞ্জন করা প্রজাদের কর্তব্য। একথা সকলেরই বিদিত যে তোমরা প্রত্যহ বনে সানন্দে মল্লযুদ্ধক্রীড়া করে গোপালন কর। অতএব এস আমরা রাজার ইষ্টসাধনের জন্য বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। কৃষ্ণ বাহুযুদ্ধে দক্ষ ছিলেন, কাজেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন। কিন্তু চানুরের মুখোমুখি হয়ে মনে মনে একটু ভয় পেয়ে চানুরকে বললেন—আমরাও ভোজরাজের বনচর প্রজা। রাজার মনোরঞ্জন করা আমাদেরও কাম্য। আমরা তাঁর প্রিয় কার্য অবশ্যই সম্পাদন করব, কিন্তু আমরা অল্পবয়স্ক, আমাদের সমান বলশালী মল্লদের সঙ্গে যুদ্ধ না করলে মল্লসভায় অধর্ম হবে।

চানুর কৃষ্ণের ধূর্ততা বুঝতে পেরে বললেন—তোমরা কেউই বালক নও। বাহুযুদ্ধে ইতিপূর্বে তোমরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছ এবং অনেক বলের পরিচয় দিয়েছ। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে কোনো অধর্ম হবে না; যেহেতু আমরা উভয়পক্ষই সমান বলশালী। হে কৃষ্ণ! এস তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর আর বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে যুদ্ধ করুক। কৃষ্ণ উপায়ান্তর না দেখে এবং জনসাধারণের সামনে নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াসে মনে বল সঞ্চয় করে বাহুযুদ্ধে সম্মত হলেন।

এবার বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হল। কৃষ্ণ চানুরের এবং বলরাম মুষ্টিকের মুখোমুখি হলেন। জয়ের অভিলাষে তাঁরা পরস্পরের বাহু আকর্ষণ

করে জড়াজড়ি করে পরস্পরের দেহ উত্থাপন, চালন ও আরো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় একজন আরেকজনকে আঘাত করতে লাগলেন। চানুর ও কৃষ্ণ বাহুযুদ্ধের বিশেষ নিয়ম অনুসারে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বলরাম এবং মুষ্টিকও সেইভাবে নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধ করতে লাগলেন। কৃষ্ণের সবল আঘাতে চানুর বারবার আহত হতে লাগলেন। চানুর ক্ষিপ্রতার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বাজপাখীর ন্যায় ক্ষিপ্রতায় তিনি শূন্যে লাফিয়ে উঠে কৃষ্ণের বক্ষস্থলে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে কৃষ্ণ চোখে অন্ধকার দেখে ভূপাতিত হলেন। চানুর কৃষ্ণকে ভূপাতিত হতে দেখে তাঁকে জ্ঞানহীন মনে করে ক্ষণমাত্র সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হলেন. সেই সুযোগে সুযোগ সন্ধানী কৃষ্ণ তড়িৎগতিতে ভূমি থেকে উঠে মল্লযুদ্ধের কৌশলে চানুরকে ভূপাতিত করে দ্রুত বারবার আঘাত করতে লাগলেন। আচমকা আঘাতে চানুর দুর্বলতাপ্রাপ্ত হলে কৃষ্ণ তাকে উত্থাপন করে ভূপৃষ্ঠে সবলে আছাড় মারলেন। এইভাবে বার কয়েক ভূপৃষ্ঠে আছড়ানোর ফলে চানুর জ্ঞান হারালেন। কৃষ্ণ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে অচৈতন্য চানুরকে হত্যা করলেন। বলরাম তখনো মুষ্টিকের সঙ্গে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। চানুরকে হত্যা করার পর কৃষ্ণ দ্বৈরথ যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে বলরামের সঙ্গে মুষ্টিকের বিরুদ্ধে যোগ দিলেন। একা মুষ্টিকের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ ও বলরাম দুজনে লড়াই করতে লাগলেন। এদিকে চানুরের মৃত্যুতে উত্তেজিত কংসের অন্যান্য মল্ল শল, তোশল, কূট প্রভৃতিরা কৃষ্ণকে দ্বৈরথ যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে অন্যায়ভাবে মুষ্টিককে আক্রমণ করতে দেখে ক্রোধে সমবেতভাবে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলেন। মল্লক্রীড়াভূমি রণক্ষেত্রে পরিণত হল! কৃষ্ণও এটাই চাচ্ছিলেন, উপযুক্ত সুযোগ বুঝে দর্শকের আসনে আসীন গোপ বাহিনীকে কৃষ্ণ ইশারা করলেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে কংসের মল্লদের দ্বারা বেষ্টিত হতে দেখে চোখের পলকে গোপবাহিনী দর্শকের আসন ত্যাগ করে কংসের মল্লদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চারিদিকে এক ভীষণ বিশৃংখলার সৃষ্টি হল। সংখ্যায় বেশী হওয়ায় কৃষ্ণ পক্ষাবলম্বী

গোপেরা সহজেই রাজা কংসের মল্লদের নিহত করলেন। কৃষ্ণের সমর্থকদের হাতে নিজের মল্লদের নিহত হতে দেখে এবং ক্রীড়ামঞ্চে বিশৃংখলার সৃষ্টি হওয়ায় কংস বাদ্য বাজাতে ও ক্রীড়া বন্ধ করতে আদেশ দিলেন।

কূটকৌশলী কৃষ্ণ দেখলেন এই সুযোগ! বিশৃংখলায় বিভ্রান্ত দেহরক্ষী বিহীন মল্লক্রীড়াদর্শক রাজা কংসকে তিনি অনুচর গোপগণ সহ আচমকা আক্রমণ করলেন। আচমকা আক্রমণে অরক্ষিত রাজা কংস কোনো প্রতিরোধ করতে পারলেন না। মল্লযুদ্ধে পটু বলশালী ও দুঃসাহসী কৃষ্ণ কংসকে দুহাতে উত্থাপন করে উঁচু রাজমঞ্চ থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিলেন এবং নিজে লাফিয়ে কংসের উপর নিপতিত হয়ে নিষ্পেষণ করে কংসকে হত্যা করলেন। বলরাম বাহুযুদ্ধের চেয়ে গদাযুদ্ধে অধিক পটু ছিলেন বলে গদা ঘুরিয়ে কংসের ভাই কঙ্ক প্রভৃতিকে হত্যা করলেন। বাহুযুদ্ধ গদাযুদ্ধে রূপান্তরিত হল। যে কৃষ্ণ-বলরাম চানুরের ও মুষ্টিকের সঙ্গে বাহুযুদ্ধে অসমতার কথা তুলে অধর্ম হবে বলেছিলেন, তাঁরাই সেই যুদ্ধে নিজেদের প্রয়োজনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে গদা ব্যবহার করে নিয়ম বিরুদ্ধ উপায়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করলেন। অবশ্য বাস্তব প্রজ্ঞা সম্পন্ন কৃষ্ণের কাছে তুচ্ছ নিয়ম পালনের চেয়ে নিজের উদ্দেশ্যসাধন চিরকালই বড় হল, বিশেষতঃ কংসের মত নিষ্ঠুর ও অধার্মিক যেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার এই ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। প্রচলিত প্রথাগত নিয়ম ভঙ্গ করে সাফল্যের দ্বারে নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন। অন্যেরা যেখানে শুধু নির্বোধের মত মানসিক দুর্বলতার শিকার হয়েছেন নিজেরাই নিজেদের কাছে।

কংস নিহত হলেন। নন্দ-অক্রূর-বসুদেব চক্রের পরিকল্পনা সফল হল। যে দৈববাণীর কথা কংস প্রচার করেছিলেন নিজের আত্মরক্ষার জন্য, সেই দৈববাণীই তাঁর জীবনহরণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। কৃষ্ণ পিতা-মাতা ও বংশের শত্রুকে বিনষ্ট করলেন। মথুরার রাজনীতিতে

একটি পর্ব শেষ হল। যাদব সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই গোষ্ঠী-বংশের শত্রুতার অবসান হল এক গোষ্ঠীর নেতা কংসের মৃত্যুতে। পরাক্রমশালী রাজা কংসের মৃত্যুর পর মথুরার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এক নতুন মোড় নিল সুকৌশলী তরুণ নেতা কৃষ্ণের প্রভাবে। ধীরে ধীরে মথুরার সবচেয়ে শক্তিমান রাজনৈতিক পুরুষরূপে দেখা দিলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের দূরদর্শিতা ও কূটনীতিতে মথুরা অচিরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যরূপে তৎকালীন ভারতের রাজনীতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল। কংসের রাজ্যশাসনকালে মথুরার যাদব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল অনৈক্য ছিল। অনেক প্রভাবশালী যাদব মথুরা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। কংসের মৃত্যুর পর সুচতুর কৌশলী কৃষ্ণ নিজে মথুরার সিংহাসনে উপবেশন না করে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে কংসের বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনের দায়িত্ব নেবার জন্য অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ জানতেন যে বৃদ্ধ উগ্রসেন শক্তিহীন কিন্তু প্রভাবশালী। যাদব সম্প্রদায়ে উগ্রসেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরূপে পূজিত। তাই উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে পুনরায় বসিয়ে তাঁর প্রভাবের ছত্রচ্ছায়ায় কংসহত্যা জনিত প্রজা-ক্ষোভের মাত্রা কৃষ্ণ কিছুটা কমাতে চাইলেন. যদিও তিনি জানতেন যে কংস হত্যায় প্রজা-ক্ষোভের মাত্রা খুবই কম। তবু অক্রুর প্রভৃতি শক্তিশালী অমাত্যদের অধিক ক্ষমতাবান হওয়ার পথকে আটকানোর জন্যই কৃষ্ণ বিশেষ করে উগ্রসেনের পুনরায় রাজ্যাভিষেকে আগ্রহী ছিলেন। কৃষ্ণ জানতেন যাদব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভোজ ও অন্ধকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যালঘু বৃষ্ণি সম্প্রদায়ের থেকে তাঁর মতো তরুণ রাজা হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করলে কেউ তা মেনে নেবেন না এবং এই সুযোগে অক্রূরের মতো ক্ষমতালোভী অমাত্যের দল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যত অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার চেষ্টা করবেন। যদিও অক্রূরের সহযোগিতাতেই কৃষ্ণ কংসকে বধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবু তিনি অক্রূরের প্রকৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণের এই দূরদর্শিতা যে

কতখানি সঠিক ছিল পরবর্তীকালে স্যমন্তক মনির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণের সঙ্গে অক্রুরের বিরোধই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্বফল্কের পুত্র অক্রুর পিতার সুনামের উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং যাদব সমাজের বয়োবৃদ্ধব্যক্তিরা তাকে মান্য করতেন। কৃষ্ণ অক্রুরের এই বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করে অক্রুরের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাকে বিবাহ করলেন, অক্রুরের ক্ষমতা খর্ব করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। ক্রুর অক্রুর কৃষ্ণের এই কার্যে বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু মুখে কিছু না বলে সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। একসময় দ্বারকায় কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে অক্রুর উপযুক্ত সুযোগ বিবেচনা করে শতধনুকে প্ররোচিত করলেন সত্রাজিতকে হত্যা করার জন্য। এই ব্যাপারে কৃতবর্মাও শতধনুকে নীরব সমর্থন জানালেন কারণ কৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় কৃতবর্মা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রধানতঃ অক্রুরের প্ররোচনায় শতধনু সত্রাজিতকে হত্যা করলেন এবং ঘটনাটি যাতে রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ না করে সেইজন্য অক্রুরের পরামর্শে সত্রাজিতের বহুমূল্য স্যমন্তক মনিটি অপহরণ করে দ্বারকা ত্যাগ করে চলে যান। দ্বারকা ত্যাগের আগে শতধনু অবশ্য অক্রুরকেই স্যমন্তক মনিটি দিয়ে যান। কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে শতধনুকে খুঁজে বের করে হত্যা করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে অক্রুর দ্বারকা ত্যাগ করে চলে যান। যদিও প্রকাশ্যে তিনি শতধনুর হত্যার প্রতিবাদে দ্বারকা ত্যাগ করেন তবু প্রকৃতপক্ষে অক্রুর কৃষ্ণের ভয়ে ভীত হয়েই দ্বারকা ত্যাগ করেছিলেন। শুধু প্রতিবাদের ভান করে যাদব সমাজকে অক্রুর কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সক্ষম হন নি। কারণ জরাসন্ধ বধের পর কৃষ্ণের রাজনৈতিক ভিত তখন যথেষ্ট মজবুত। অক্রুরের দ্বারকা ত্যাগে আপামর জনসাধারণের মনে তেমন বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া না হলেও কিছু বিশিষ্ট বৃদ্ধ যাঁরা অক্রুরের পিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরা কৃষ্ণকে অনুরোধ করতে লাগলেন অক্রুরকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনার জন্য। বৃদ্ধজনগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে কৃষ্ণ অক্রুরকে আমন্ত্রণ

জানিয়ে পুনরায় দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন। পরে অবশ্য কৃষ্ণ ধীরে ধীরে অক্রূরকে গুরুত্বহীন করে দ্বারকার রাজনৈতিক চিত্র থেকে একেবারে মুছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর অদ্ভুত দূরদর্শিতার জন্যই অক্রূরের বিরুদ্ধে সফল হয়েছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই কৃষ্ণ মানবচরিত্র অনুধাবনের এক অতুলনীয় স্বাক্ষর রেখেছেন বর্তমানের আপাত বন্ধুত্বের মধ্যে ভবিষ্যতের শত্রুতার বীজ আবিষ্কার করে।

এসবই উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ও জরাসন্ধ বধের বহু পরের ঘটনা। উগ্রসেনের পুনর্বার রাজ্যাভিষেকের পর কৃষ্ণ মথুরার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির দিকে দৃষ্টি দিলেন। কংসের ভ্রান্ত নীতির ফলে অনৈক্যে বিধ্বস্ত যাদব সম্প্রদায় তখন হৃৎপিণ্ডহীন শবের ন্যায় গতিহীন। কৃষ্ণ অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত যাদবদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সচেষ্ট হলেন। দূরদর্শী কৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে নিজ রাজ্যে ঐক্য স্থাপন করতে না পারলে তিনি কোনদিনই শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন না। উগ্রসেনকে দ্বিতীয়বার রাজপদে স্থাপন করার পর কৃষ্ণ তাই পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্যে দূত পাঠিয়ে প্রবাসী যাদবদের স্বদেশে ফেরার আমন্ত্রণ জানালেন এবং মথুরায় তাঁদের সম্মানজনক জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কৃষ্ণ-প্রতিশ্রুতি পেয়ে কংসের অত্যাচারে দেশত্যাগী কংসবিরোধী যাদবরা আবার মথুরায় ফিরে এলেন। প্রবাসী যাদবদের শক্তিতে কৃষ্ণ মথুরার অভ্যন্তরে কংস বিরোধী শক্তি অনেকটা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেন এবং যাদব সম্প্রদায়ের অনৈক্যও দূর হল। উগ্রসেনের নামে কৃষ্ণই মথুরার শাসন কার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

চার

কংস নিহত হবার পর কংসের দুই পত্নী অস্তি ও প্রাপ্তি মথুরা ত্যাগ করে পিতৃগৃহে ফিরে গেলেন। তাঁরা ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা। মগধ তখন ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। পরাক্রান্ত জরাসন্ধের নামে সমস্ত ভারত কম্পমান। জরাসন্ধের পিতার নাম বৃহদ্রথ। তিনি মগধের অধিপতি ছিলেন। বৃহদ্রথের দুই পত্নী কাশীরাজের কন্যা ছিলেন। জরাসন্ধ বৃহদ্রথের একমাত্র পুত্র। জরাসন্ধ অসীম শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং পিতার পরে মগধের নৃপতি রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বীয় বাহুবলে পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমূহের প্রায় সমস্ত নৃপতিকে জরাসন্ধ নিজের অধিকারে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজারূপে জরাসন্ধ খ্যাতিলাভ করেন। সমরকৌশলী রাজা জরাসন্ধের সঙ্গে ভারতের কোনো রাজাই সামরিক স্পর্ধা করতে সাহস করতেন না। জরাসন্ধ নিজের দুই কন্যাকে হঠাৎ পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে বিস্মিত হলেন এবং পিতৃগৃহে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অস্তি ও প্রাপ্তি দুই ভগ্নি পিতা জরাসন্ধকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে নিজেদের বৈধব্যের কারণ বর্ণনা করলেন। জরাসন্ধ এই অপ্রিয় সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। জামাতার মৃত্যুতে তিনি খুবই শোকাভিভূত হলেন। কন্যাদ্বয়কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি কৃষ্ণকে ও যাদবদের একটু শাস্তি দেওয়া স্থির করলেন।

অপরাজেয় মগধের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হল। একুশ অক্ষৌহিনী সৈন্য নিয়ে সম্রাট জরাসন্ধ মথুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দূর থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত মগধবাহিনী দৃশ্যমান হওয়ামাত্র মথুরায় ক্রন্দন-রোল পড়ে গেল। ভয়ে ভীত যদুকুল তাড়াতাড়ি উদীয়মান নেতা

কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কৃষ্ণেরও একই অবস্থা। দূর থেকে মগধের পতাকা দেখেই তিনি বুঝেছিলেন জরাসন্ধের এই অভিযানের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু কৃষ্ণের এমন কোন সামর্থ্য ছিল না যে সম্রাট জরাসন্ধের মত মহাবীরের সঙ্গে সামরিক শক্তিতে তিনি পাল্লা দেন। কৃষ্ণ অবিলম্বে নগরীর পুরদ্বার বন্ধ করে দেবার আদেশ দিলেন। কৃষ্ণের আদেশ মথুরা নগরীর পুরদ্বার তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একুশ অক্ষৌহিনী মগধবাহিনী সম্রাট জরাসন্ধের নেতৃত্বে মথুরা অবরোধ করল।

কৃষ্ণ অমাত্য ও বন্ধুগণসহ ইতিকর্তব্য নির্ধারণে আলোচনায় বসলেন। সর্বসম্মত আলোচনায় কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা থেকে পলায়নই শ্রেয় বলে বিবেচিত হল। কারণ সম্রাট জরাসন্ধের এই বিপুল বাহিনী ধ্বংস করার কোন সম্ভাবনা যাদব সৈন্যকুলের মধ্যে পরিলক্ষিত হলনা। মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত সমস্ত রাজাদের পদাতিক, অশ্ব, হাতি ও রথ সমন্বয়ে গঠিত এই বিপুল সংখ্যক সৈন্য দর্শন করা মাত্র যাদবদের মধ্যে প্রবল ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, কাজেই ভয়ে ভীত দুর্বল সৈন্য-বাহিনী যুদ্ধ জয় করবে কিভাবে। জরাসন্ধের কাছে পরাজিত হলে চিরকাল মথুরার যাদবদের জরাসন্ধের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। কূট-কৌশলী কৃষ্ণ জানতেন সম্রাট জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণের উদ্দেশ্য। তিনি জানতেন সম্রাট জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত বীর হলেও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। ধার্মিক রূপে জরাসন্ধ ন্যায়নিষ্ঠার জন্য সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করলে তিনি কখনোই মথুরার অন্যান্য অধিবাসীদের বা বৃদ্ধ পুতুলরাজা উগ্রসেনকে হত্যা করবেন না। অকারণ হত্যায় জরাসন্ধের ধর্মপরায়ণ বিবেক বাধা দেবে। জরাসন্ধের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ ও বলরামের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। কৃষ্ণ ও বলরামকে ধরতে না পারলে জরাসন্ধ মথুরার অবরোধ পরিত্যাগ করে নিজ রাজ্য মগধে ফিরে যাবেন। মথুরাও আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

পলায়ন কর্তব্য নির্ধারিত হল। কিন্তু ঐ সমুদ্র সমান মগধ সৈন্যের

মধ্যে দিয়ে পলায়ন একান্ত অসম্ভব বিবেচনা করে বুদ্ধিমান কৃষ্ণ সৈন্য-প্রস্তুতের আদেশ দিলেন। সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হলে কৃষ্ণ ও বলরাম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিজেরা প্রস্তুত হলেন এবং দারুককে সারথি করে দ্রুতগতির রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম নিজেদের রথ যদু-সৈন্যের মাঝখানে স্থাপন করে মথুরা নগরীর পুরদ্বার উন্মুক্ত করে শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শুনে মগধবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যদুবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হল। অগুনতি মগধ সেনা সমস্ত যদুসৈন্যকে আবৃত করে ফেলল। কৃষ্ণ ও বলরাম নিজেদের রথ থেকে তাড়াতাড়ি গরুড় ও তালবৃক্ষ চিহ্নিত পতাকা খুলে ফেললেন। কৃষ্ণ ও বলরামের রথ পতাকাহীন হওয়ায় মগধের সৈন্যদলের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল। যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ব পরিকল্পিত উপায়ে কৃষ্ণ ও বলরাম মাগধীয় সৈন্যের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে ছদ্মবেশে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দ্রুতগতিতে পথ চালিয়ে প্রবর্ষণ নামক নিকটবর্তী উচ্চ পর্বতে আত্মগোপন করলেন। সম্রাট জরাসন্ধ যথেচ্ছভাবে যদুসৈন্য সংহার করেও কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখতে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে অযথা প্রাণ হানি না করে নিজরাজ্য মগধে ফিরে গেলেন।

জরাসন্ধ মগধে ফিরে যাওয়ার পর কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। যুদ্ধে মথুরার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল এবং মথুরা নগরীর সমস্ত ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাদবদের রাজধানী শ্রীহীন রূপ ধারণ করেছিল। জেষ্ঠ্য যাদবেরা অতঃপর শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গসহ কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে কি ভাবে জরাসন্ধের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার উপায় নির্ধারণে আলোচনায় বসলেন। বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে যাদবদের দ্বিতীয় একটি রাজধানী স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হল। নতুন রাজধানীর জন্য স্থান নির্বাচন করা হল মানুষের দৃষ্টি-অবহেলিত দুরগম্য সুদূর জলবেষ্টিত দ্বারকা। মথুরার অবশিষ্ট ধনসম্পদ কাজে লাগিয়ে জরাসন্ধ পুনর্বার মথুরা আক্রমণ করার আগেই জরা-ভীত কৃষ্ণ

অতি দ্রুত দ্বারকায় এক বিশাল জলবেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করলেন। ঐ দুর্গে আত্মীয়-পরিজন ও প্রশাসন গোপনে স্থানান্তরিত করে মথুরায় নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হলেন।

কংস হত্যার পর কৃষ্ণ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শক্তিশালী রাজা কংসকে হত্যা করতে সক্ষম হওয়ায় অন্যান্য রাজারা কৃষ্ণকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। কৃষ্ণ এইসব রাজন্যবর্গের সহায়তা প্রার্থনা করলেন জরাসন্ধের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো রাজাই জরাসন্ধের বিরুদ্ধে কৃষ্ণকে সহায়তা করার জন্য প্রকাশ্যে সক্রিয় ভাবে এগিয়ে এলেন না। কৃষ্ণ একাই অন্যান্যদের পরোক্ষ সহযোগীতায় নিজের সৈন্যবল বৃদ্ধি করতে লাগলেন। সম্রাট জরাসন্ধ চরমুখে খবর পেলেন কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন. তেইশ অক্ষৌহিনী সৈনা নিয়ে জরাসন্ধ আবার মথুরা আক্রমণ করলেন। কৃষ্ণ পূর্বের তুলনায় কিছু বলবৃদ্ধি করেছিলেন বলে এবার জরাসন্ধকে দেখা মাত্রই পলায়ন না করে মগধসৈন্যের গতিরোধ করার চেষ্টা করলেন। যদুসৈন্যের সঙ্গে মগধবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘষ হল। অগুণতি যদুসেনা নিহত হল। কৃষ্ণ রণে ভঙ্গ দিয়ে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে পুর্নবার পলায়ন করলেন। সম্রাট জরাসন্ধ সমস্ত যদুসেনা নিহত করে প্রবর্ষন পর্বত অবরোধ করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। আগুনে পর্বতের সমস্ত বৃক্ষাদি ভস্মীভূত হল। কিন্তু জরাসন্ধ যাদব ভ্রাতাদ্বয়কে পেলেন না: তাঁরা আগেই পলায়ন করেছিলেন দ্বারকার দিকে। জরাসন্ধ আবার মগধে ফিরে গেলেন. যাদববাহিনীকে পরাজিত করে। এইভাবে বহুবার জরাসন্ধের হাতে সম্মুখ সমরে বিপর্যস্ত হয়ে কূট-কৃষ্ণ নতুন কৌশল চিন্তা করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর একার শক্তিতে জরাসন্ধকে জয় করা সম্ভব হবে না। নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণ তাই বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। তখনকার দিনে বিবাহের মাধ্যমে আত্মীয়তা স্থাপন রাজনীতির এক প্রধান অঙ্গ ছিল। কৃষ্ণ কোশল রাজের কন্যাকে বিবাহ করলেন। কোশল তখন ভারতের একটি গুরুত্ব

পূর্ণ রাজ্য। কোশলরাজ নগ্নজিৎকে আত্মীয়তায় আবদ্ধ করে কৃষ্ণ নিজের শক্তি অনেকটা বৃদ্ধি করলেন।

ঠিক একই সময়ে উত্তর ভারতে আরেকটি রাজ্য শৌর্য্যে বীর্য্যে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিল। হস্তিনাপুর এই রাজ্যের রাজধানী। রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বৃদ্ধ অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সঙ্গে মৃত রাজভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্রদের জ্ঞাতিবিরোধ চলছিল। পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র শৌর্য্যে বীর্য্যে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অপর দিকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ জেষ্ঠ্যভ্রাতা দুর্য্যোধনের নেতৃত্বে পরম শক্তিশালী হয়ে পঞ্চ-পাণ্ডবকে রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। একক শৌর্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু রাজনৈতিক শক্তিতে দুর্বল পাণ্ডব ভ্রাতারা নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত রকম উপায়ে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই বিফল হওয়া সত্বেও তাঁরা কৌরব ভ্রাতাদের বিপক্ষে যুদ্ধের ঝুঁকি নেবার মত রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করতে না পেরে অপমানিতের জীবনযাপন করছিলেন। পঞ্চ-পাণ্ডবের তৃতীয়, অর্জ্জুন কৃষ্ণের সমবয়স্ক ও খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। জরাসন্ধের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াসে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে এই বন্ধুত্বকে দৃঢ় করার চেষ্টায় নিজের ভগ্নী সুভদ্রার বিবাহ অর্জ্জুনের সঙ্গে দেওয়া স্থির করলেন। কারণ কৃষ্ণ জানতেন যে জরাসন্ধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের মত সাহায্য তাঁকে আর কেউ করতে পারবেন না এবং ভীমকে জরাসন্ধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সম্মত করাতে অর্জ্জুনের প্রয়োজন কৃষ্ণের কাছে সবচেয়ে বেশী। নিজের ভবিষ্যত পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনকে বন্ধুত্ব থেকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন।

একসময় যাদবদের মহোৎসব উপলক্ষে অর্জ্জুন কৃষ্ণের আমন্ত্রণে দ্বারকায় আতিথ্য গ্রহণ করেন। রৈবতক পর্বতে যাদবদের মহোৎসব পরিদর্শন কালে সর্বাঙ্গ সুন্দরী কৃষ্ণ-ভগীনি সুভদ্রাকে দেখে অর্জ্জুন মোহিত হন। অর্জ্জুনের মনোভাব বুঝতে পেরে কৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত

হয়ে অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করে সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করার পরামর্শ দিলেন। কৃষ্ণ জানতেন অর্জ্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ প্রস্তাবে বলরাম ও যাদবদের আপত্তি থাকতে পারে, তাই তিনি সকলের অজ্ঞাতে অর্জ্জুনকে সুভদ্রাকে অপহরণের পরামর্শ দিলেন, কারণ জরাসন্ধের দ্বারা বারবার উত্যক্ত হবার পর অর্জ্জুন তাঁর কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলেন।

কৃষ্ণের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেন। অর্জ্জুনের এই কাজে বলরামসহ সমস্ত যাদব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এব অপমানিত বোধ করেন। যাদবেরা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। বলরামও অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনুমোদন করেন। কিন্তু কৃষ্ণের উপস্থিতবুদ্ধি ও অসাধারণ বাক্য-বিন্যাসে গঠিত যুক্তির কাছে ক্রুদ্ধ যাদবেরা আত্মসমর্পণ করেন। কৃষ্ণ যুক্তির দ্বারা যাদবকুল ও বলরামকে বুঝিয়ে শান্ত করে নিরস্ত করেন। যাদবেরা এই ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়ার পর প্রথাসম্মত-ভাবে অর্জ্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ হয় এবং দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

যাদবদের সঙ্গে আত্মীয়তায় উৎসাহিত হয়ে হীনবল যুধিষ্ঠিরের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করে নিজের রাজ-নৈতিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করেন। যুধিষ্ঠিরের নিজের এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না যার দ্বারা তিনি নিজে একক ক্ষমতায় রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারতেন। যুধিষ্ঠির তাই কৃষ্ণকে দূত পাঠিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে এলেন এবং তাঁর কাছে রাজসূয় যজ্ঞ করা উচিত কিনা তার পরামর্শ চাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন যে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে রাজসূয় যজ্ঞ করার পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু প্রকৃতই তাঁর রাজসূয় যজ্ঞ করা উচিত কিনা অথবা করলে তিনি সফল হবেন কিনা এ বিষয়ে পরামর্শ লাভের জন্যই তিনি কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ পেয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে আসার আগে কৃষ্ণ দ্বারকায় তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও উপদেষ্টাদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসেছিলেন। কৃষ্ণের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা তাঁকে জরাসন্ধবধে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের সাহায্য নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মল্লযুদ্ধে ভীম সেইসময়ে সারা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাজা জরাসন্ধকে শত শত অক্ষৌহিনী সেনা দ্বারাও পরাজিত করা যাবেনা জেনে তাঁরা জরাসন্ধ বধের জন্য প্রতারণার পথ ধরলেন। তখনকার দিনে যুদ্ধের চরিত্র প্রধানতঃ দু'-প্রকার ছিল। প্রথম, উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সম্মুখ লড়াই। দ্বিতীয়, উভয়পক্ষের প্রধান নায়কদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সম্মত হয়ে পরাজিত হলে সেই পরাজয়কে সৈন্যবাহিনীসহ যুদ্ধে পরাজয়ের সমান গুরুত্ব দেওয়া হত। যাদব নায়কেরা জানতেন রাজা জরাসন্ধ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর হলেও অত্যন্ত ধর্মভীরু। তিনি তৎকালীন সামাজিক প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণদের খুব ভক্তি করতেন। তাঁরা জরাসন্ধের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করবেন স্থির করলেন। ঠিক হল ভীম, কৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মগধে জরাসন্ধের কাছে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করবেন। ব্রাহ্মণভক্ত, ধর্মভীরু জরাসন্ধ ব্রাহ্মণের প্রার্থনা কখনই প্রত্যাখান করবেন না এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে মহাবল ভীমের হাতে মৃত্যুবরণ করবেন। এইরকম পরিকল্পনা স্থির হওয়ার পর পাণ্ডবগণের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কৃষ্ণ আর দেরী না করে অবিলম্বে ইন্দ্রপ্রস্থে যাওয়া স্থির করলেন।

প্রচুর উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছলেন। যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ কৃষ্ণ রক্ষা করেছেন দেখে পাণ্ডবগণ খুব খুশী হলেন। যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে পাণ্ডব ভ্রাতারা কৃষ্ণকে উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রদান করলেন। আগে বিভিন্ন বিপদের সময় পাণ্ডব ভ্রাতারা কৃষ্ণকে দুর্যোধনের বিপক্ষে নিজেদের সহায়করূপে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চতুর কৃষ্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে শত্রুতা পরিহার করার জন্য প্রতিবারই পাণ্ডবদের স্তোকবাক্য ও তত্ত্বকথায় স্বান্তনা দিয়ে এড়িয়ে যান। বাস্তব সাহায্য তিনি কিছুই

করেন নি। এখন যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণকে উপলক্ষ্য করে প্রচুর উপঢৌকন সহকারে কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আসতে দেখে বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন যে এই আসা শুধুই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা নয়, কৃষ্ণের নিজেরও কোনো স্বার্থ নিশ্চয়ই আছে। এই ঘটনায় যুধিষ্ঠির মনেমনে খুবই উৎফুল্ল বোধ করলেন এবং কৃষ্ণকে সাহায্য করে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করার সুযোগ পেলেন। কুন্তীসহ সমগ্র পাণ্ডববংশ কৃষ্ণকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা জানিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা উপযুক্তভাবে চর্চিত হয়ে কৃষ্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করার পর অন্তঃপুরে পাণ্ডবদের মন্ত্রণা-কক্ষে একান্তে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে রাজসূয় যজ্ঞ করার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করার প্রস্তাবের মধ্যে নিজের পরিকল্পনা রূপায়নের সম্ভাবনা আবিষ্কার করলেন। বুদ্ধিমান কৃষ্ণ তাই যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ প্রদান করে বললেন যে যুধিষ্ঠির সর্বগুণান্বিত, কাজেই তাঁর রাজসূয় যজ্ঞ করা অবশ্যই উচিত। কিন্তু রাজসূয় অতি কঠিন যজ্ঞ, অন্য ভূপতিদের বশীভূত করতে পারলেই এই যজ্ঞে সফল হয়ে সম্রাট উপাধি ধারণ করা যায়। যুধিষ্ঠির অন্য রাজাদের বশীভূত করতে পারলেও জরাসন্ধ প্রবল শক্তিশালী, তাঁকে বশীভূত করা অসম্ভব ব্যাপার। জরাসন্ধ নিজের বাহুবলে অন্য রাজাদের পরাজিত করে বন্দী করে রেখেছেন। বিভিন্ন শক্তিশালী রাজা, জরাসন্ধের বলবীর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন মহাশক্তিশালী রাজার আনুগত্য লাভ করে এবং তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে জরাসন্ধ প্রবলপ্রতাপে ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করেছেন। কংসের মৃত্যুর পর জরাসন্ধের সঙ্গে যাদবদের বিবাদ শুরু হয় এবং জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণ নিজে অন্যান্য যাদবদের সঙ্গে দ্বারকায় এক সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে যাদবদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সামর্থ্যযুক্ত হয়েও যাদবেরা শুধু জরাসন্ধের বিক্রমের ভয়ে মথুরা থেকে পলায়ন করেছেন, আর যুধিষ্ঠিরের তো কোনো সামর্থ্যই নেই, কাজেই কিভাবে তিনি

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন? কাজেই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হলে যুধিষ্ঠিরকে প্রথমে জরাসন্ধকে বধ করতে হবে।

এইভাবে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বোঝালেন যে তাঁর রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের পথে জরাসন্ধই একমাত্র বাধা। কৃষ্ণের নিজের কথায়—হে ভরত সত্তম! আপনি সম্রাটতুল্য গুণশালী, অতএব আপনার সম্রাট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি কখনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া, সিংহ যেমন পর্বত কন্দর মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুরাত্মা রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপানুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল। পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল।

সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া আপনার পুরে আনয়নপূর্বক বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছি। হে মহারাজ! যদি আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ ভূপালগণকে মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন করুন, নচেৎ আপনি কোনক্রমে রাজসূয় সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। হে কুরুনন্দন! আমার এই মত। এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয়, বলুন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের ওপরেই নির্ভর করেছিলেন রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করার ব্যাপারে। কিন্তু কৃষ্ণের মুখে এই ধরণের কথা শুনে তিনি দ্বিধাগ্রস্থ হলেন। কৃষ্ণের বক্তব্যের যৌক্তিকতা একদিকে যেমন তিনি অস্বীকার করতে পারছিলেন না আবার তেমনি অন্যদিকে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে কৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞের অছিলায় নিজের শত্রুকে আগে নিপাত করতে চাচ্ছেন। এইরকম মানসিক দ্বিধার কবলে পড়ে সিদ্ধান্ত

গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভ্রাতাদের মন্ত্রণাকক্ষে ডাকিয়ে এনে কৃষ্ণের বক্তব্য জ্ঞাপন করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন জরাসন্ধকে কোনো ভাবে বধ করা সম্ভব কিনা ?

ভীম ও অর্জ্জুনসহ সব পাণ্ডব ভ্রাতারাই যুধিষ্ঠিরের মুখে কৃষ্ণের বক্তব্য শুনে বুঝতে পারলেন যে কৃষ্ণ আগে নিজের শত্রু জরাসন্ধকে হত্যা করতে চান রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের সাহায্য করার ছলে। কৃষ্ণের এই মনোভাবে পাণ্ডব ভ্রাতারা আনন্দিতই হলেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে কৃষ্ণকে সাহায্য করতে পারলে ভবিষ্যতে নিজেদের বিপদের সময়ও কৃষ্ণের কাছ থেকে সাহায্য আদায় করা যাবে। উপরন্তু সম্রাট জরাসন্ধ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সঙ্গে বিশেষ সখ্যতায় আবদ্ধ। তাই জরাসন্ধ বধে কৃষ্ণকে সাহায্য করতে পারলে কৌরবদের কাছে কৃষ্ণের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তিরও ক্ষতিসাধন করা যাবে এবং কৃষ্ণকে পাণ্ডবদের বন্ধুরূপে চিহ্নিত করে কৌরবমনে কুরু-পাণ্ডব দ্বন্দ্বে কৃষ্ণের ভূমিকাকে সন্দিহান করে তোলা যাবে।

ভীম যুধিষ্ঠিরের দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাব লক্ষ্য করে যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহিত করে বললেন—যে রাজা যুদ্ধচেষ্টা পরাঙ্মুখ এবং যে দুর্বল ও উপায়শূন্য হইয়া বলীর সহিত যুদ্ধ করিতে যায়, ইহারা উভয়েই অবসন্ন হয়। যে ব্যক্তি দুর্বল, কিন্তু আলস্যশূন্য, সে সম্যক্ যুদ্ধাদি প্রয়োগ দ্বারা বলবান শত্রুকে জয় করিতে পারে এবং নীতিদ্বারা আপনার হিতকর অর্থলাভ করে। দেখ কৃষ্ণে নীতি, আমাতে বল এবং অর্জ্জুনে জয় নির্ধারিত আছে, অতএব যেমন ত্রেতাগ্নি যজ্ঞসাধন করে সেইরূপ আমরা তিনজনে একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব।

ভীমের মুখে এই কথা শুনে কৃষ্ণ খুব উৎসাহিত হলেন। তিনি এরকমই চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ ভাবলেন ভীম মল্লযুদ্ধে অপরাজেয় এবং অর্জ্জুন ধনুর্যুদ্ধে, এঁদের সহায়তায় জরাসন্ধকে অবশ্যই বধ করা যাবে। কিন্তু অপরপক্ষে দুর্য্যোধন পরম শক্তিশালী ও সম্রাট জরাসন্ধের বন্ধু, তাই কৌরবদের কাছে জরাসন্ধের বিপক্ষে কোনো সাহায্য পাওয়া

যাবে না, উপরন্তু জরাসন্ধ ও কৌরবেরা মিলিত হয়ে যাদবকুলের বিপদ সৃষ্টি করতে পারেন। দুর্বলের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়াই শ্রেয় কারণ পরে সাহায্য করতে হলেও রাজনীতিতে দুর্বল পাণ্ডবদের নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। কৌরবদের কাছে সে আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাই পরস্পরের প্রয়োজনে এক স্বার্থের ঐক্য রচিত হল। প্রয়োজনভিত্তিক এই বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করতে উভয় পক্ষই বিশেষ যত্ন নিলেন। বন্ধুত্বের অলিখিত সূত্র হল জরাসন্ধের বিপক্ষে কৃষ্ণকে পাণ্ডবরা সহায়তা করবেন এবং কৌরবদের বিপক্ষে পাণ্ডবদের সহায়তা করবেন কৃষ্ণ। শুধু যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে জরাসন্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাতে একটু দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের সেই দুর্বলতা দূর করে দেন বিভিন্ন বীরত্বব্যঞ্জক বাক্য দ্বারা।

আলোচনাপর্ব সমাপ্ত হলে কৃষ্ণ তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন এবং ঠিক হল কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন এই তিনজনে ছদ্মবেশে জরাসন্ধের বাসস্থানে জরাসন্ধকে হত্যা করার জন্য যাবেন। কৃষ্ণ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই যে রকম কৌশলী ও বাস্তববোধসম্পন্ন ছিলেন এবং যে গুণের দ্বারা তিনি কংসকে হত্যা করতে সক্ষম হন, কৃষ্ণের সেই বিশেষ গুণটি, শত্রুর সামর্থ্য অনুমান করে সেই অনুযায়ী শত্রুকে পরাজিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া. জরাসন্ধ বধের সময়েও বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, জরাসন্ধ-অভিযানের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠিরকে বলা কথার ভিতরে। যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ বললেন— হে যুধিষ্ঠির। হংস ও ডিম্বক নিহত হইয়াছে ; কংসও সগণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে জরাসন্ধ বধের সময় সমুপস্থিত। সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে পারে না ; অতএব আমার মতে উহাকে প্রাণযুদ্ধে জয় করা উচিত। দেখুন, আমি নীতিজ্ঞ, ভীমসেন বলবান এবং অর্জ্জুন আমাদের রক্ষয়িতা, অতএব যেমন তিন অগ্নি একত্র হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেইরূপ আমরা তিনজন একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব। আমরা তিনজন নির্জনে আক্রমণ করিলে জরাসন্ধ

অবশ্যই একজনের সহিত সংগ্রাম করিবে। সে, অবমাননা, লোভ ও বাহুবীর্য্যে উত্তেজিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই। যম যেমন উদ্ধত লোকের বিনাশে সমর্থ, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন জয়দ্রথতনয়কে সংহার করিতে পারিবেন। অতএব যদি আপনি আমার হৃদয়জ্ঞ হন এবং যদি আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে শীঘ্র ভীম ও অর্জ্জুনকে ন্যাস স্বরূপ আমার হস্তে সমর্পণ করুন।

একদিকে রাজসূয় যজ্ঞ করে রাজচক্রবর্তী সম্রাট হওয়ার ইচ্ছা অন্যদিকে নিজের অসামর্থ্যের জন্য কৃষ্ণের বন্ধুত্ব লাভের আগ্রহ—যুধিষ্ঠিরের এই দ্বিধান্বিত মনোভাবটি কৃষ্ণ ঠিকমত বুঝতে পেরেছিলেন বলেই নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাণ্ডব ভ্রাতাদের তিনি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শুনে কোনো বিপরীতভাব প্রকাশ করলেন না, বরং আনন্দের সঙ্গেই তিনি কৃষ্ণসহ ভীম ও অর্জ্জুনকে জরাসন্ধ বধে যাত্রার অনুমতি দিলেন। কারণ যুধিষ্ঠিরের করার কিছু ছিল না। সম্রাট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর দুর্বল হৃদয়ে ক্ষণস্থায়ী স্বার্থপর কাঠিন্য আনয়ন করেছিল।

যুধিষ্ঠিরের সম্মতি আদায় করে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন তিনজনে স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গোপন অস্ত্রসহ মগধের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে পূর্ব পরিকল্পনামত যাত্রা করলেন। মগধে পৌঁছে তাঁরা ক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট জরাসন্ধের নগর চৈত্যের কাছে উপস্থিত হলেন। চৈত্য প্রাকার অতিক্রম করে কৃষ্ণসহ ভীম ও অর্জ্জুন জরাসন্ধের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করার অভিলাষে সমস্ত গোপন অস্ত্র পরিত্যাগ করে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে পুরপ্রবেশ করে জরাসন্ধের আবাসে হাজির হলেন। সম্রাট জরাসন্ধ তাঁদের দর্শন করা মাত্র অতিথিব্রাহ্মণ জ্ঞানে গাত্রোত্থান করে পাদ্য, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করে স্বাগতঃ প্রশ্ন করলেন। ভীম ও অর্জ্জুন কৃষ্ণের পরিকল্পনামত কোন কথা না বলে মৌন হয়ে রইলেন। শুধু কৃষ্ণ একা জরাসন্ধ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত

হয়ে জরাসন্ধকে জানালেন যে এঁরা স্নাতক ব্রতধারী, অর্ধরাত্র উপস্থিত হলেই কেবল এঁরা মৌনতা ভঙ্গ করে রাজার সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের কথা শুনে তাঁদের যজ্ঞাগারে থাকার অনুমতি দিয়ে প্রস্থান করলেন। ধর্মপরায়ণ রাজা অতিথি তিনজনকে স্নাতক ব্রাহ্মণ মনে করে অর্ধরাত্রে আবার তাঁদের কাছে গেলেন এবং যথাবিহিত অর্চনা করে তাঁদের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন যজ্ঞাগারে আসন গ্রহণ করে রাজা জরাসন্ধের সামনে উপবেশন করলেন।

জরাসন্ধ অতিথি তিনজনের বিচিত্রবেশ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এঁরা ব্রাহ্মণ নন। সন্দেহপ্রবণ হয়ে জরাসন্ধ অতিথিত্রয়কে বললেন, তিনি জানেন যে স্নাতকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ব্যতীত কখনো মাল্য বা চন্দন ধারণ করেন না। কিন্তু তাঁরা ধারণ করেছেন, তাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ, অঙ্গপুষ্পমাল্য ও অনুলেপনে সুশোভিত, ভুজে জ্যা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আকার দর্শনে ক্ষাত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তবু তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিচ্ছেন, অতএব সত্য বলুন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কে? কি তাঁদের সত্য পরিচয়? তাঁরা রাজার কাছে এসেছেন এবং রাজা তাঁদের যথাবিহিত পূজা ও অর্চনা করেছেন, তবু তাঁরা সেই পূজা গ্রহণ করলেন না কেন? তাঁদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্যই বা কি?

জরাসন্ধের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে দেখে কৃষ্ণ বুঝলেন এবার সত্যি কথা বলা প্রয়োজন। যজ্ঞাগারে তিন অপরিচিত বীরের বিরুদ্ধে একক জরাসন্ধকে কৃষ্ণ বললেন যে যদিও রাজা জরাসন্ধ তাঁদের স্নাতক ব্রাহ্মণ ভাবছেন কিন্তু আসলে তাঁরা ব্রাহ্মণ নন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা ক্ষত্রিয়, সেইজন্য বাহুবল সম্পন্ন। যদি তাঁদের বাহুবল দেখার জন্য রাজা জরাসন্ধের ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে তিনি অচিরেই তা দেখতে পাবেন। শত্রুগৃহে গোপনে প্রবেশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজকার্য

সাধনের জন্য শত্রুগৃহে প্রবেশ করে তাঁরা শত্রুপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করেন না।

জরাসন্ধ বিচিত্র বেশধারী তিন আগন্তুকের মুখে এই ধরনের অদ্ভুত কথা শুনে বিস্ময়াপন্ন হলেন। তিনি স্মরণ করতে পারলেন না কবে কোথায় এঁদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেছেন যার জন্য এঁরা প্রতিশোধ নিতে গোপনে তাঁর রাজপ্রাসাদে এসেছেন। তিনি একান্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনকে বললেন যে তিনি কখনও বিনাপরাধে কারুর প্রতি শত্রুতাচরণ করেননি এবং ক্ষাত্রধর্ম যথাযথ ভাবে পালন করেছেন. প্রজাদেরও কোনো ক্ষতি করেন নি, কাজেই মনে হয় আগন্তুকত্রয় ভুল করে তাঁকে শত্রু বলে স্থির করছেন।

কৃষ্ণ জরাসন্ধের মানসিক বিভ্রান্তি দূর করে দিলেন মুহূর্তের মধ্যেই আত্মপরিচয় প্রদান করে। অন্যান্য রাজাদের বন্দী করে রাখার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বিস্তর তিরস্কার করলেন, যেন ঐ বন্দী রাজাদের মুক্ত করার জন্যই কৃষ্ণের জরাসন্ধসমীপে আগমন। কৃষ্ণ জরাসন্ধকে মধ্যরাত্রিতে একা পেয়ে নিজের মনোমত ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের কার্য সমর্থন করে বললেন—হে রাজন! তোমাকে কপটে সংহার করিবার মানসে এরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, আমরা বস্তুত ব্রাহ্মণ নহি. ক্ষত্রিয়। আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।

জরাসন্ধ আগন্তুকত্রয়ের পরিচয় পেয়ে একটুও ভীত হলেন না. তিনি বুঝতে পারলেন এঁদের আগমনের উদ্দেশ্য কি? বন্দী রাজাদের মুক্ত করা প্রসঙ্গে কৃষ্ণের বক্তব্য যে শুধু একটি ছলমাত্র তা বুঝতে জরাসন্ধের একটুও বিলম্ব হল না। ধর্মপরায়ণ রাজা জরাসন্ধ শত্রু হলেও আগন্তুকত্রয়কে অতিথির মর্যাদা দান করেছিলেন, তাই অতিথির অবমাননা না করে দানশীল উদার রাজা দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ বলগর্বে গর্বিত রাজা জরাসন্ধের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই

তিনি জরাসন্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান? বীর জরাসন্ধকে এর আগে তাঁর প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করে কেউ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার সাহস করেননি। জরাসন্ধ আত্মশ্লাঘা পরবশ হয়ে একাধিকবার পরাজিত ও পলায়নকারী কৃষ্ণকে ভীরুজ্ঞানে এবং অর্জ্জুনকে বয়সে কনিষ্ঠজ্ঞানে বাদ দিয়ে ভীমকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কৃষ্ণ এটাই চেয়েছিলেন, তাঁর পরিকল্পনা সফল হল। যে মুহূর্তে জরাসন্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করলেন, সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং আগামী দিনের এক মহান রাজনীতিকের জয়যাত্রার সূচনা হল। ভীমও চাচ্ছিলেন জরাসন্ধ তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ করুন, কারণ তিনি জানতেন বাহুযুদ্ধে কৃষ্ণ অথবা অর্জ্জুন কেউই জরাসন্ধের সমকক্ষ নন।

মধ্যরাত্রিতে যজ্ঞাগারে তিনি অনাহুত শত্রুর আহ্বানে রাজা জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। দুই মহাবীর জয়ের আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরকে আঘাত প্রত্যাঘাত করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুজনেই সমান বলশালী, এবং সমান কৌশলী। তাঁরা পরস্পর পৃষ্ঠভঙ্গ, বাহু-দ্বারা সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা এবং পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি যুদ্ধের নানাবিধ কলাকৌশল প্রদর্শন করলেন ও বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ করতে লাগলেন। বহু সময় যুদ্ধে অতিবাহিত হতে লাগল কিন্তু ভীম জরাসন্ধকে পরাজিত করার কোনো আশাই দেখতে পেলেন না। এইভাবে বেশ কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ চলল জয়াভিলাষী দুই মহাবীরের। দিনে যুদ্ধ এবং রাত্রিতে সহাবস্থান চলতে লাগল! নিরুপায় হয়ে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন অতঃপর এক চক্রান্তজাল রচনা করলেন জরাসন্ধকে বিপর্যস্ত করার জন্য! পুনরায় যথানিয়মে দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ হলে বীরদ্বয় প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অনুকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ ও জানুদ্বারা আঘাত করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধের নিয়ম ছিল, যদি কেউ যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত বোধ করেন তবে তিনি সাময়িক ভাবে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবেন। মগধরাজ জরাসন্ধ এক সময় যুদ্ধ করতে করতে

ক্লান্ত হয়ে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হলেন। জরাসন্ধকে ক্লান্ত হয়ে নিবৃত্ত হতে দেখে কৃষ্ণ ভীমকে ইশারা করলেন। মল্লযুদ্ধে সুকৌশলী ভীম এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন দেখে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গকরে ভীম প্রবল বিক্রমে অপ্রস্তুত জরাসন্ধকে আক্রমণ করে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূর্ণিত করতে লাগলেন এবং বহুবার ঘূর্ণিত করে জানুদ্বারা আকুঞ্চনপূর্বক জরাসন্ধের পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ করলেন ও ভূপতিত রাজার দুই পা সবলে টেনে দেহের মধ্যভাগ বরাবর চিরে ফেললেন। সম্রাট জরাসন্ধের প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করল। দ্বিধাবিভক্ত সম্রাট নিজনামের তাৎপর্য বহন করে মৃত্যুবরণ করলেন। মধ্যরাত্রের কূটনীতিতে যজ্ঞাগারের যুদ্ধে মগধের পরাক্রমশালী সম্রাট জরাসন্ধ নিহত হলেন। কৃষ্ণের চরম শত্রুর মৃত্যু হল। শত্রুর মৃত্যুতে আনন্দে উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণ, ভীমকে আলিঙ্গন করলেন। সম্রাটের প্রজারা হাহাকার করে উঠল। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ, জরাসন্ধের পতাকাশালী রথ সংযোজিত করে সেই রথে নিজে ভীম ও অর্জ্জুনসহ আরোহণ করে রাজধানী পরিভ্রমণ করলেন। বিস্ময়াবিষ্ট প্রজারা বিজয়ীদের ভয় শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরীক্ষণ করল। অসাধারণ কূটনৈতিক প্রতিভা ও নিখুঁত সামরিক পরিকল্পনার বলে কৃষ্ণ মগধের সম্রাটকে পাণ্ডব ভ্রাতাদের সহায়তায় বধ করে এক অনন্য সাধারণ রাজনৈতিক গৌরব লাভ করলেন। ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী নৃপতিকে বধ করে কৃষ্ণ সর্বভারতীয় সম্ভ্রমের অধিকারী হয়ে উঠলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ মৃত মগধরাজের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে পুতুলরূপে বসালেন। মগধ কৃষ্ণের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে এল এবং সেইসঙ্গে মগধের অনুগত সমস্ত রাজ্যও। সম্রাট জরাসন্ধ বহু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁদের সবাইকে মুক্তি প্রদান করে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং নিজ নিজ রাজ্যে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত নৃপতিরা কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলেন। কৃষ্ণ নৃপতিদের বন্দীত্ব মোচনের

বিনিময়ে তাঁদের বন্ধুত্ব আদায় করলেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কৃতজ্ঞ নরপতিরা সানন্দে কৃষ্ণকে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। যে জরাসন্ধকে সমস্ত ভারত ভয়ের চোখে দেখত, যাঁর পরাক্রমের কথা স্মরণ করে ভারতীয় নৃপতিরা কম্পিত হতেন, সেই জরাসন্ধ বধ কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার দ্বারা তিনি ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর নিজরাজ্য দ্বারকার ভিতরেও তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা চুপ করে যেতে এবং গুরুত্বহীন হয়ে যেতে বাধ্য হলেন। আভ্যন্তরীণ ও বহিরাজনীতি দুদিকেই কৃষ্ণ অসাধারণ সাফল্য লাভ করলেন। তাঁর রাজনৈতিক মেধা অস্বীকার করার কোনো উপায় রইল না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় নৃপতিরা তাঁকে ভয় ও সম্ভ্রম করে তাঁর পরামর্শে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁদের কাছে কৃষ্ণের এক ধর্ম-পরায়ণ ভাবমূর্তি গড়ে উঠল। কারণ সম্রাট জরাসন্ধ যুদ্ধে পরাজিত বহু রাজাকে (পূজায় বলী দেবার উদ্দেশ্যে) বন্দী করে রেখে যে অধর্ম করেছিলেন, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে হত্যা করে সেইসব রাজাকে মুক্তি দিয়ে জরাসন্ধকৃত সেই অধর্মের অবসান ঘটালেন এবং ধর্ম সংস্থাপন করলেন। যদিও সম্রাট জরাসন্ধ পরাজিত রাজাদের বন্দী করে তৎ-কালীন ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে কোনো অন্যায় করেননি। কিন্তু মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের জীবন পুনর্দান করতে সক্ষম হওয়ায় তাঁদের কাছে কৃষ্ণের চেয়ে বড় ধার্মিক আর কেউ নন। কারণ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে যিনি জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি যদি ধার্মিক না হন তবে কে ধার্মিক হবেন? যদিও যিনি বন্দীদের জীবন নিতে চেয়েছিলেন তিনিও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস অনুসারেই ত. করেছিলেন। তবুও জীবন ফিরে পাওয়ার কৃতজ্ঞতায় বন্দী রাজাদের কাছে কৃষ্ণের রাজনীতির চেয়ে ধর্মীয় রূপটিই প্রধান হয়ে দেখা দিল।

অসাধারণ কূটনীতিবিদ ও নীতিজ্ঞ রূপে তাঁর খ্যাতি যতই বিস্তৃত হতে লাগল ততই কৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হতে থাকল। কেউ কৃষ্ণের রাজনৈতিক মেধাকে আবার কেউ কৃষ্ণের ধর্মপ্রবণ ভাবমূর্তিকে অভিনন্দিত করলেন। কৃষ্ণ একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণে ধর্মপরায়ণ রাজনীতিক রূপে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। তাঁর বহু অনুরাগী ও স্তাবকের সৃষ্টি হল। শুধু ব্যতিক্রম রইলেন কৌরবেরা। ধনে জনে বলীয়ান রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত কৌরবেরা কৃষ্ণের রাজনৈতিক মেধাকে স্বীকার করলেও তাঁকে শক্তিশালী রাজনীতিক রূপে মর্যাদা দিলেন না। সেইসঙ্গে কৌরবদের অনুগত রাজন্যবর্গের চোখেও কৃষ্ণ গুরুত্বহীন হয়ে রইলেন।

কৌরবেরা আপন আধিপত্যে অটল থেকে পূর্বের মতই রাজ্যশাসন করে যেতে লাগলেন। ফলে কৃষ্ণের নাম জরাসন্ধ বধের পরে সারা ভারতে প্রচারিত হলেও তিনি কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হলেন না শুধু কৌরবদের অবহেলার জন্য। তবে কৃষ্ণের প্রতি বিভিন্ন রাজন্যবর্গের জরাসন্ধের মৃত্যুর পর যে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছিল তা অক্ষুণ্ণই থাকল। রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ আরোপ না করলেও কৃষ্ণ নামের উদীয়মান তারকাটির প্রতি সবাই বিশেষভাবে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে রইলেন। জরাসন্ধ বধের পর কৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা রাজনীতিতে আরো কাছাকাছি আসতে বাধ্য হলেন। তাঁদের মধ্যে আগের চেয়ে আরো বেশী ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। কারণ পাণ্ডব-সহায়তায় জরাসন্ধ বধের পরে কৌরবেরা কৃষ্ণকে পাণ্ডবদের বন্ধু বলেই মনে করলেন এবং পাণ্ডব ভ্রাতাদের ও কৃষ্ণের প্রতি একই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হতে লাগলেন। সেই সঙ্গে পাণ্ডবদের ভাগ্যে ক্রমাগত আরো বেশী লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ জুটতে লাগল, কারণ জরাসন্ধ বধের মাধ্যমে কৃষ্ণকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে পেরে পাণ্ডবেরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে মনে করে গর্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কৌরবনায়ক দুর্যোধন কিন্তু

কৃষ্ণকে একটুও অতিরিক্ত রাজনৈতিক গুরুত্ব দিলেন না। কৃষ্ণ বিভিন্ন উপায়ে অনুগত রাজা ও স্তাবকদের মাধ্যমে যতই নিজের দৈব মহিমা প্রচার করতে লাগলেন ততই তিনি কৌরবদের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলতে লাগলেন।

শক্তিশালী কৌরবগণের উপেক্ষা কৃষ্ণ নিরুপায় হয়ে ধৈর্য্য ধরে নীরবে হজম করেছেন এবং তত্বকথার আড়ালে নিজের দুর্বলতা গোপন করার প্রয়াস লাভ করেছেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে মহাযুদ্ধের আগের মুহূর্ত পর্যান্ত কৃষ্ণ সুকৌশলে শান্তির প্রবক্তা রূপে নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে নিজেকে কৌরব-রোষ থেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করেছেন। যখন একান্তই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল এবং কৃষ্ণের ভূমিকাকে কৌরবগণ উপেক্ষা করায় কৃষ্ণের নিরপেক্ষ থাকার আর কোনো উপায় রইল না, কেবল মাত্র তখনই তিনি অনিচ্ছা সত্বেও পাণ্ডবপক্ষে বাধ্য হয়ে যোগদান করলেন। তাও ভগ্নীপতি অর্জ্জুনের সারথি রূপে, যাতে কৌরবদের তিনি বোঝাতে পারেন যে তিনি কৌরবদের শত্রু নন। তার আগে পর্যন্ত কৃষ্ণ কৌরবদের অগোচরে পাণ্ডব শিবিরে কেবল তর্জনগর্জনই করেছেন। কৃষ্ণ-নির্ভর পাণ্ডবদের অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা কৃষ্ণের যুদ্ধপূর্ববর্তী ভূমিকায় এতই হতাশ হয়েছিলেন যে তাঁরা নিজেরা বাধ্য হয়ে সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে এক আলোচনা সভায় বসলেন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য।

পাঁচ

বিরাটরাজের গৃহে সভা অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন রাজা ও পাণ্ডব সমর্থকেরা বিরাটরাজের গৃহে এসেছিলেন তাঁর কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। নিমন্ত্রণপর্ব সমাপ্ত হলে বিরাটরাজ নিজেই পাণ্ডবদের অভিভাবক রূপে উদ্যোগী হয়ে পাণ্ডব-শুভানুধ্যায়ী রাজন্যবর্গকে আহ্বান করলেন এক সভায়। পাণ্ডবদের প্রধান প্রধান মিত্র রাজগণ সভায় এলেন। কৃষ্ণ ও বলরামও এলেন! আসন গ্রহণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর কৃষ্ণ পাণ্ডবদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে আলোচনার ভূমিকা শুরু করলেন। সমবেত রাজন্যবর্গকে উদ্দেশ্য করে কৃষ্ণ বললেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় শঠতাপূর্বক পরাজিত হয়ে সত্যরক্ষার জন্য তেরবৎসর বনবাসব্রত পালন করেছেন। কিন্তু তবু রাজা দুর্যোধন তাঁকে তাঁর প্রাপ্য রাজ্যাংশ ফেরৎ দেননি। যুধিষ্ঠিরের বিস্তর প্রশংসা করে কৃষ্ণ সমবেত রাজাদের অতঃপর কৌরব-পাণ্ডব সম্বন্ধ বিচার করে কর্তব্য নির্ধারণের আহ্বান জানালেন। পাণ্ডবদের বীরত্বের ওপর যথেষ্ট আস্থা প্রদর্শন করে তিনি বললেন যে পাণ্ডবেরা সংখ্যালঘু হলেও কৌরবগণকে নিহত করতে সক্ষম। কিন্তু যদি উপস্থিত রাজন্যবর্গ মনে করেন যে পাণ্ডবেরা কৌরবদের পরাজিত করতে পারবেন না তাহলে পাণ্ডবদের সমস্ত সুহৃদ-গণের একত্রে কৌরবদের পরাজিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এইভাবে প্রথমে পাণ্ডবদের সপক্ষে কথা বলে সমবেত সবার মন জয় করে কৃষ্ণ সুকৌশলে যুক্তির আড়ালে নিজের মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যদিও এখনই কৌরবদের পরাজিত করা সম্ভব তবু তা করা উচিত নয় কারণ দুর্যোধন কি করবেন তা জানা যায় নি। অন্যের অভিপ্রায় না জেনে কার্যারম্ভ করা কখনই উচিত নয়। হয়ত দুর্যোধন তাঁর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করতে পারেন এবং আপসেই

যুধিষ্ঠিরকে অর্ধেকরাজ্য দিয়ে দিতে পারেন। যদিও ততদিনে সবাই জেনে গেছেন যে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে সূচ্যগ্র ভূমিও বিনা যুদ্ধে দেবেন না। তবু কৃষ্ণের এই যুক্তি জালের অবতারণা। কারণ প্রথমতঃ তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধ পরিহার করতে। তাঁর নিজের আত্মবিশ্বাস বলে কৃষ্ণ ভেবেছিলেন যে দুর্যোধনকে তিনি রাজী করিয়ে শান্তির পথে যুধিষ্ঠিরকে তাঁর প্রাপ্য রাজ্যাংশ ফেরৎ পাইয়ে দিতে পারবেন। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ কৌরবপক্ষের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানতেন যে যুদ্ধ শুরু হলে এই বিরাট মহাভারতীয় যুদ্ধে তাঁর নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, কারণ কৌরবেরা তাঁকে উপেক্ষা করলেও যুদ্ধের সময় শত্রু হিসাবেই ধরবেন। মুখে মুখে কৃষ্ণ যতই কৌরবদের পরাজিত করুন না কেন, একজন দূরদর্শী রাজনীতিক ও যোদ্ধা হিসাবে তিনি জানতেন যে ব্যাপারটি মোটেই তত সহজ নয়। তাই তিনি এই রকম যুক্তির অবতারণা করে প্রস্তাব দিলেন যে দুর্যোধনের কাছে সন্ধির অভিপ্রায়ে একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে পাঠানো উচিত। আসলে কৃষ্ণের নিজেরই ইচ্ছা ছিল দূত হয়ে দুর্যোধনের কাছে গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করে মধ্যস্থের ভূমিকা পালনের সুযোগ পাওয়ার। নিজেকে মধ্যস্থ হিসাবে দেখাতে পারলে নিজের অস্তিত্ব অনেকটা নিরাপদ হয় একথা কৃষ্ণ খুব ভালকরেই জানতেন। কিন্তু উপস্থিত রাজন্যবর্গের কেউই এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন না, একমাত্র কৃষ্ণ ভ্রাতা বলরাম ছাড়া।

বলরাম কৃষ্ণের মত সুকৌশলী ছিলেন না। বাক্য দ্বারা কূটযুক্তি-জালের অবতারণা করে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি জানতেন না। তিনি যা বললেন সোজাসুজি বললেন, এবং তাঁর কথাতেই পরিষ্কার ফুটে উঠল দুর্যোধন-ভীতি। তিনি প্রকাশ্যেই দুর্যোধন ও কৌরবদের চাটুকারিতা করে সন্ধির সপক্ষে বক্তব্য রাখলেন। বলরাম বললেন, কৃষ্ণের সন্ধির প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত। একজন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির কৌরব-

সমীপে গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিবেদন করা উচিত। যদিও কৌরবরা বলপূর্বক পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ অধিকার করেছেন কিন্তু তার জন্য সব-সময়েই তাঁদের দোষারোপ করা উচিত নয়। প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করে বলরাম বললেন, যুধিষ্ঠির নিজের দোষেই রাজ্য হারিয়েছেন। অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ না হয়েও তিনি শকুনির মত অক্ষ পারদর্শী ব্যক্তির সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়ে পরাজিত হয়েছেন। দুর্যোধনের সভায় আরো অনেক ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের যুধিষ্ঠির পরাজিত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে রাজ্যপণ করে খেলে শকুনির হাতে পরাজিত হয়েছেন। এতে দুর্যোধনের বা কৌরবদের দোষ কোথায়? দোষ থাকলে তা যুধিষ্ঠিরেরই। স্তাবকতার শিখরে আরোহণ করে বলরাম বললেন দুর্যোধন ও কৌরবেরা খুবই ধর্ম-পরায়ণ। উপযুক্ত ব্যক্তি সন্ধির প্রস্তাব দিলে তাঁরা তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন, কাজেই যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই। সন্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদই প্রকৃত সম্পদ, যুদ্ধের দ্বারা অর্জিত সম্পদ কোনো কাজের নয়। অতএব সন্ধিই সর্বাংশে অভিপ্রেত, বিশেষতঃ পাণ্ডবদের স্বার্থেই।

প্রকাশ্যে বলরামের এই দুর্যোধন প্রশস্তি স্পষ্টতঃই দুর্যোধনের সামর্থ্যের পরিচায়ক। রাজনীতিতে চিরকালই শক্তিমানের চাটুকারিতা প্রচলিত। পরাক্রমশালী রাজা দুর্যোধনের প্রশস্তি করে বলরাম নিজেদের ও যাদবকুলকে কৌরবদের রোষবহ্নি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের এই ভূমিকা একদিকে প্রমাণ করে কৌরবকুলের রাজনৈতিক শক্তিসামর্থ্য এবং অন্যদিকে কৌরব অনুগ্রহ লাভে কৃষ্ণ ও বলরামের ব্যগ্রতা। বলরামের এই অপ্রত্যাশিত ও কাপুরুষোচিত ঘৃণ্য ভূমিকা সমবেত রাজন্যবর্গকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করে তুলল।

সাত্যকি ও দ্রুপদ তৎক্ষণাৎ তীব্র কণ্ঠে সন্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলরামের এই ভূমিকার নিন্দা করলেন। বলরামকে কাপুরুষ ও অন্যান্য অপমানজনক বাক্য বলে সাত্যকি প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের মত পাণ্ডব-

হিতৈষীর উপযুক্ত মন্ত্রণা দিলেন। তিনি বললেন সন্ধি কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। পাণ্ডবদের কপট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করে দুর্য্যোধন তাঁদের রাজ্য অধিকার করেছেন এবং তের বছর পাণ্ডবরা বনবাসে থাকার পর ও বলছেন যে আত্মগোপনের একবছর কালে তাঁদের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। কাজেই তাঁরা কোনো মতেই ধার্মিক হতে পারেন না। এছাড়া একথা সকলেই জানেন যে দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে রাজ্য প্রত্যর্পণ করবেন না। এই অবস্থায় তাঁদের অনুগ্রহ লাভের জন্য সন্ধির কোনো দরকার নেই। অধার্মিকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। কৌরবদের কাছ থেকে বলপূর্বক রাজা যুধিষ্ঠির নিজরাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন। পাণ্ডব পক্ষে ভীম ও অর্জ্জুন সহ অনেক মহাবীর আছেন, অতএব বলরামের ন্যায় কৌরবভীতির কোনো কারণ নেই। যুদ্ধই শ্রেয়, জীবন পণ করে যুদ্ধ করলে কৌরবকুলকে পরাজিত করে পাণ্ডবেরা অবশ্যই নির্মূল করতে পারবেন।

যদিও সাত্যকি কৃষ্ণের মতই যাদববংশোদ্ভূত ছিলেন এবং কৃষ্ণের একজন বিশিষ্ট অনুগামী ও সমর্থক ছিলেন তবু তিনি কৃষ্ণের ন্যায় রাজনীতির সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি প্রকৃতই পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কৌরবদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। কৌরবদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত ক্রোধে তিনি কৃষ্ণের বিরোধিতা করা হচ্ছে জেনেও যুদ্ধের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, নিজের ওপর সংযম হারিয়ে। তিনি জানতেন যুদ্ধ অনিবার্য, কৌরবদের কাছে আত্মসম্মান বিক্রয় করে কোনো লাভ হবে না। তাই তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ প্রস্তুতির মন্ত্রণা দিলেন।

রাজা দ্রুপদও সাত্যকির বাক্য সমর্থন করে যুদ্ধ অনুমোদন করলেন। দ্রুপদ অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে তিনি তৎকালে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। দ্রুপদ বললেন, মহান্ বীর সাত্যকির বাক্য প্রকৃতই যুক্তিযুক্ত, তিনি নিজেও যুদ্ধ সমর্থন করেন এবং যুদ্ধই হবে। দুর্য্যোধন কিছুতেই বিনা

যুদ্ধে রাজ্য প্রদান করবেন না। এই অবস্থায় বলরামের বাক্য নিতান্তই অযৌক্তিক। দুর্যোধনের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিলে তিনি আমাদের দুর্বল মনে করবেন এবং তাতে আমাদের কোনো লাভ হবে না। কাজেই অবিলম্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়াই শ্রেয়। রাজনীতি ও কূটনীতিতে অভিজ্ঞ দ্রুপদ বললেন—মিত্র রাজগণের কাছে অবিলম্বে দূত পাঠান প্রয়োজন। কারণ যুদ্ধ সম্ভাবনায় রাজা দুর্যোধনও ঐ সকল রাজন্য-বর্গের কাছে দূত প্রেরণ করবেন। রাজনীতির তৎকালীন রীতি অনুযায়ী যাঁর দূত আগে পৌঁছত, ধর্মপরায়ণ রাজা তারই পক্ষ অবলম্বন করতেন। এই কথা মনে করিয়ে দিয়ে রাজা দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন, বাহ্লীক, চেদীপতি ও কলিঙ্গেশ্বর সহ বিভিন্ন রাজার কাছে অবিলম্বে দূত প্রেরণ করতে পরামর্শ দিলেন। প্রভাব-শালী দ্রুপদের বাস্তবোচিত বাক্য শ্রবণ করে উপস্থিত অন্যান্য রাজাও যুদ্ধ অনুমোদন করলেন এবং সন্ধির বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন।

কৃষ্ণ ও বলরামের প্রস্তাব সভায় উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন উপস্থিত মহান্ রাজন্যবর্গের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গুরুত্ব-হীন হয়েছেন। বুদ্ধিমান কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সমবেত নৃপতিগণের মন জয় করার চেষ্টায় বললেন; রাজা দ্রুপদের কথাই একান্ত যুক্তিযুক্ত। তিনি বয়সে ও জ্ঞানে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁর কথাই সভায় উপস্থিত প্রত্যেকের শোনা উচিত। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবদের সঙ্গে যাদবদের ও তাঁদের নিজেদের সমান সম্পর্ক। কৌরবরা কখনও কৃষ্ণ ও যাদবদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি, সেইজন্য তিনি এখনই কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনুমোদন করতে পারছেন না। নিজের রাজনৈতিক অবস্থা ও সামর্থ্য অনুমান করে কৃষ্ণ একমুহূর্তে পাণ্ডব হিতৈষীর ভূমিকা থেকে নিরপেক্ষ মধ্যস্থের ভূমিকায় সরে গেলেন। কৃষ্ণ আরো বললেন, যদি দুর্যোধন সন্ধি স্থাপন করেন, তাহলে ভ্রাতৃবিরোধ হয় না। আর যদি সন্ধি কোন মতেই সম্ভব না হয় তাহলে অন্যান্য রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করার পর সবার শেষে তাঁদের কাছে যেন দূত পাঠানো

হয়। দুর্যোধন সন্ধি করবেন না জেনেও বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তিতে সমবেত রাজারা কৃষ্ণের অতিরিক্ত সন্ধিপ্রীতিতে বিরক্ত হলেন। আর কৃষ্ণ সভায় নিজের প্রস্তাব অবহেলিত হওয়ায় মনঃক্ষুন্ন হয়ে সবার কাছে বিদায় প্রার্থনা করে পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন।

যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ বধের পর কৃষ্ণের কাছে অনেক কিছু আশা করছিলেন। কৃষ্ণের নীতি ও পরামর্শের ওপর যুধিষ্ঠিরের বিশেষ আস্থা ছিল। কিন্তু হঠাৎ কৃষ্ণের এই ভূমিকা পরিবর্তনে যুধিষ্ঠির কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন না তাঁর কি করা উচিত, কৃষ্ণের এই ভূমিকা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত। তিনি খানিকটা হতবিহ্বল হয়ে রাজা দ্রুপদের ওপরেই সবকিছু ছেড়ে দিলেন। অভিজ্ঞ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের হয়ে তাঁর অভিভাবক রূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু প্রাজ্ঞ দ্রুপদের অভিজ্ঞতা বুঝেছিল যে কৃষ্ণের প্রস্তাব সভায় গৃহীত না হওয়ায় কৃষ্ণ মনঃক্ষুন্ন হয়েছেন। মনঃক্ষুন্ন কৃষ্ণ যাতে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে না যান এবং যাতে কৌরবেরা কৃষ্ণের মনোভাবকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারেন সেইজন্য দ্রুপদ কৃষ্ণের মন রাখার প্রচেষ্টায় নিজের পুরোহিতকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে কৌরবসমীপে প্রেরণ করলেন। কারণ দ্রুপদ জানতেন যে আত্মাভিমানী কৃষ্ণকে সক্রিয়ভাবে পাণ্ডব পক্ষে না রাখতে পারলে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক শক্তি অনেকটা কমে যাবে এবং দুর্যোধনের মত ধূর্ত রাজা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন। এদিকে গুপ্তচর মুখে রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও কৃষ্ণের যুদ্ধে অনিচ্ছার কথা সবই জানতে পারলেন। রাজনীতিতে অভিজ্ঞ দুর্যোধন বুঝলেন যে এইবার কৃষ্ণকে গুরুত্ব দেবার সময় এসেছে। কারণ পাণ্ডব পক্ষে কৃষ্ণের যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং কৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে কৌরবদের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি করতে চান না। কাজেই কৃষ্ণকে নিজপক্ষে আনতে পারলে অথবা নিরপেক্ষ করে রাখতে পারলে পাণ্ডবদের শক্তি

কিছুটা কমবে তাতে সন্দেহ নেই। এইরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে রাজা দুর্যোধন বিরাটরাজের সভা থেকে কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। দুর্যোধন স্বয়ং এসেছেন শুনে কৃষ্ণ মনে মনে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, তা না হলে দুর্যোধনের মত দাম্ভিক রাজা নিজে তাঁর কাছে আসতেন না। কিন্তু দুর্যোধনকে সেই মনোভাব বুঝতে না দিয়ে কৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। কিছুক্ষণ রাজনৈতিক আলোচনার শেষে দুর্যোধন কৃষ্ণের কাছে প্রথাসম্মতভাবে পাণ্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কৃষ্ণ এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, দুর্যোধনের সাহায্য প্রার্থনা শুনেই তিনি বুঝলেন যে এইবার সুযোগ এসেছে কৌরবদের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। কৃষ্ণ সানন্দে দুর্যোধনকে সাহায্য করতে সম্মত হয়ে এক অর্বুদ যাদবসেনা কৌরবপক্ষে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। দুর্যোধন কৃষ্ণকে স্বয়ং কৌরবপক্ষে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানালে বুদ্ধিমান কৃষ্ণ সেই প্রস্তাব একেবারে প্রত্যাখ্যান করে দুর্যোধনকে রুষ্ট করলেন না। তিনি দুর্যোধনকে কৌরবদের বিপক্ষে অস্ত্র না ধরার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কৃষ্ণকে কৌরবদের বিপক্ষে যুদ্ধে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়ে এবং এক অর্বুদ যাদবসেনা কৃষ্ণের কাছ থেকে সাহায্য হিসাবে আদায় করে দুর্যোধন খুশী মনে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণের কাছে তাঁর এর চেয়ে বেশী কিছু প্রত্যাশা ছিল না।

প্রথানুযায়ী দুর্যোধন সব রাজার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তারই অঙ্গ হিসাবে তিনি কৃষ্ণের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, যদিও কৃষ্ণ পাণ্ডবদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে দুর্যোধন কৃষ্ণকে একটু বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেই সময়। কিন্তু কৃষ্ণ এই সুযোগে দুর্যোধনকে সাহায্য করতে পেরে এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন। প্রথম, দুর্যোধনকে সাহায্যের দ্বারা কৌরবপক্ষের

মধ্যে এতদিন কৃষ্ণের প্রতি যে কঠোর মনোভাব ছিল তার অবসান হল এবং কৌরবদের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি সহানুভূতিশীল এক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। কিছু কিছু কৌরব কৃষ্ণকে আর আগের মত পুরোপুরি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বনকারী মনে করতে লাগলেন না। দ্বিতীয়, দুর্যোধনকে সাহায্যের ফলে পাণ্ডব ভ্রাতাদের মনে বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কৃষ্ণের ভূমিকা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিল। যুধিষ্ঠির ভয় পেলেন যে কৃষ্ণ হয়ত পুরোপুরি কৌরবপক্ষে যোগদান করতে পারেন। এর ফলে কৃষ্ণ যাতে হাতছাড়া না হয়ে যান তার জন্য যুধিষ্ঠির আরো বেশী করে কৃষ্ণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন এবং কৃষ্ণের পরামর্শ মত চলতে বাধ্য হলেন। এইভাবে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডব ভ্রাতাদের আগের চেয়ে অনেক বেশী নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। দুর্যোধন কৃষ্ণের সাহায্য লাভ করে যতটা না উপকৃত হলেন তার চেয়ে দুর্যোধনকে সাহায্য করে কৃষ্ণ অনেক বেশী লাভবান হলেন। যে উপেক্ষা তিনি কৌরবদের কাছ থেকে এতদিন পাচ্ছিলেন এবার তার অবসান হল। রাজা দুর্যোধনকে সাহায্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করে কৃষ্ণ নিজের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করে যুযুধান দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে নিজেকে ভারসাম্যের এক নতুন রাজনৈতিক কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। কৌরবদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি নিজেকে কৌরবদের রোষবহ্নি থেকে বাঁচিয়ে নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করলেন। তিনি জানতেন বিপুল শক্তির অধিকারী কৌরবরা যুদ্ধে জয়লাভ করলে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করবেন। কৌরবদের মিত্র হিসাবে রাজনীতিতে পরিচিত হতে পারলে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৌরবদের অনুগত রাজারাও তাঁর প্রতি বৈরীভাব পরিত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন এবং কৃষ্ণের রাজনৈতিক মর্যাদা সর্বভারতীয় স্তরে আরো ব্যাপক আকারে বিস্তৃতি লাভ করবে।

অন্যদিকে পাণ্ডবরা তাঁকে বন্ধু বলেই স্বীকার করেন এবং তাঁর বুদ্ধি ও পরামর্শের ওপর তাঁরা যথেষ্ট নির্ভরশীল। কাজেই তিনি যদি শুধু পাণ্ডবদের মন্ত্রণাদাতার ভূমিকায়ও থাকেন তবু মনোবলহীন পাণ্ডবদের কাছে তাই যথেষ্ট হবে। কারণ তাঁরা কিছুতেই চাইবেন না যে স্বয়ং কৃষ্ণ কৌরবপক্ষে যোগদান করুন। আর পাণ্ডবরা যদি অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন, যদি তাঁরা জয়লাভ করেন তাহলে সেই জয় তো কৃষ্ণের বুদ্ধি প্রভাবেই হবে। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের ভগ্নীপতি, ভীম এবং যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত, কাজেই সেই জয়ের কৃতিত্ব কৃষ্ণ ছাড়া আর কে পাবেন ? সারা ভারতে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব তখন অপ্রতিহত গতিতে এগোবে। যদিও কৌরবদের সামরিক শক্তি পাণ্ডবদের থেকে বেশী থাকায় এবং কৌরবপক্ষে একাধিক মহারথী থাকায় কৃষ্ণের ব্যক্তিগত ধারণা ছিল যে যুদ্ধে কৌরবপক্ষেরই জয়ের সম্ভাবনা বেশী। সেইজন্যই কৃষ্ণ হিসাব কষে দেখলেন যে নিরপেক্ষ থাকাতেই তাঁর লাভ সবচেয়ে বেশী, কিন্তু পাণ্ডবদের তিনি একেবারে পরিত্যাগও করতে পারেন না। তাই নিরস্ত্র সারথিরূপে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের মানসিক সমর্থন ও শুভেচ্ছা ছিল পাণ্ডবদের দিকেই কিন্তু কৌরবদের বিপুল সামরিক শক্তির কথা চিন্তা করে কৃষ্ণ নিজে ব্যক্তিগত কোনো ঝুঁকি নিতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। সেইজন্য অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করে যুদ্ধকালে উপযুক্ত মন্ত্রণা প্রদানের সুযোগ তিনি অবহেলা করতে চাইলেন না। কৃষ্ণের এই সারথ্য গ্রহণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধকালে মানসিক বল প্রদান ছাড়া আর কিছুই নয়। সামরিক শক্তির বিচারে এর গুরুত্ব অসীম।

কৃষ্ণের এই ভূমিকা বাস্তবানুগ এবং রাজনীতির নিয়ম সম্মত। তিনি মনে মনে বুঝতে পারছিলেন যে পাণ্ডবরা অত্যাচারিত এবং বঞ্চিত কিন্তু তবু দূরদর্শী রাজনীতিকের ন্যায় তিনি আগে নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেন। সংকটকালে আপন ভবিষ্যতের কথা

চিন্তা করে নিজেকে নিরাপদ স্থানে স্থাপন করা প্রত্যেক দূরদর্শী রাজনীতিকের কর্তব্য। একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানব রূপে তিনি নিজ স্বার্থের রূপায়নে সাধারণ আবেগ জড়িত মানবিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কের উর্দ্ধে নিজেকে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে রাজনীতিতে কৃষ্ণের এই উত্তরণই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকের যা কাম্য। অবশ্য পরবর্তীকালে যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রের দ্রুততার মধ্যে কৃষ্ণের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন হয় এবং কৃষ্ণ অস্ত্রধারণ না করেও পুরোপুরি পাণ্ডব পক্ষের হয়ে এক অস্ত্রবিহীন মানসিক যুদ্ধ পরিচালনা করে যেতে বাধ্য হন।

ছয়

রাজা দ্রুপদের পুরোহিত সন্ধির বার্তা বহন করে কৌরবসভায় গেলেন। একজন দূতের যেভাবে সন্ধি প্রস্তাবের জন্য কথা বলা উচিত পুরোহিত তা না করে দম্ভ সহকারে পাণ্ডবদের নায্য পাওনা দাবী করে বললেন যে পাণ্ডবেরা কেবল শান্তিপ্রিয় বলেই সন্ধি চান, তা না হলে তাঁরা এখনই কৌরবদের পরাজিত করতে পারেন।

ফল যা হবার তাই হল পুরোহিতের সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। ভীষ্ম সন্ধি প্রস্তাবে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করলেও ধর্মপ্রাণ কর্ণ পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, রাজা দুর্যোধন ধর্মানুসারে শত্রুকে সমগ্র পৃথিবী দান করতে পারেন কিন্তু ভয় দেখালে একপদ ভূমিও প্রদান করবেন না। পুরোহিত ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

দ্রুপদ রাজের পুরোহিত দৌত্যকার্যে ব্যর্থ হওয়ার পর পাণ্ডব ভ্রাতাদের মধ্যে একান্ত দুর্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির আবার কৃষ্ণের উপদেশ প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির দুর্বলচিত্ত ছিলেন বলে কৃষ্ণ তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণনির্ভর করে তুলেছিলেন। কিন্তু ততদিনে কৃষ্ণ নিজেও বুঝে গেছেন যে সন্ধি অসম্ভব, অন্ততঃ পাণ্ডবদের শর্তে। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। যুধিষ্ঠিরের ওপর প্রভাব খাটাতে লাগলেন যাতে যুধিষ্ঠির সন্ধির শর্ত কিছুটা কমান। অন্য পাণ্ডব ভ্রাতারা কিন্তু রাজা দ্রুপদ ও সাত্যকির সহায়তায় যুদ্ধের জন্য পুরোদমে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কৃষ্ণের প্রভাবে যুধিষ্ঠির অন্য ভ্রাতাদের মতের বিপক্ষেই সন্ধির শর্ত কমিয়ে অর্ধেকরাজ্য থেকে মাত্র পঞ্চগ্রামে নেমে এলেন। কৌরব দূত সঞ্জয়ের মাধ্যমে তিনি বলে পাঠালেন যে পাণ্ডব ভ্রাতারা কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অন্য যে কোন একটি গ্রাম পেলেই সন্তুষ্ট থাকবেন। কৌরবদের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করে

ঐ পঞ্চগ্রামে শান্তিতে বসবাস করবেন। সঞ্জয় হস্তিনায় গিয়ে পাণ্ডবদের মনোবাসনা নিবেদন করলেন। কিন্তু ততদিনে কৌরবরাও যুদ্ধের জন্য অনেকটা প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। এই অবস্থায় একদিকে পাণ্ডবদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ও অন্যদিকে শান্তির প্রস্তাব এই পরস্পর বিরোধী কার্য্যধারা দুর্য্যোধনের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলনা। তিনি পঞ্চগ্রামের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। যুদ্ধ ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগল।

যুদ্ধ যত নিকটবর্তী হতে লাগল পাণ্ডবদের মধ্যে মানসিক অস্থিরতা ততই বাড়তে লাগল। পাঁচ ভাইয়ের এক একজন এক একরকম মত প্রকাশ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির নিরুপায় হয়ে আবার কৃষ্ণের মন্ত্রণা চাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সেই এক কথা, সন্ধি। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি কৌরবসভায় গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে নিজের নিরপেক্ষতা ও উভয়পক্ষের হিতৈষীরূপ দেখাতে পারছেন ততক্ষণ তিনি হাল ছাড়বেন না। নামে মাত্র হলেও একবার তাঁর কৌরবসভায় যাওয়া চাই। তিনি তাই নিজেই দূত হয়ে দুর্য্যোধনের কাছে যাবার সঙ্কল্প নিলেন।

যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ বললেন, কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের হিতসাধনের জন্য তিনি নিজেই কৌরবসভায় যাবেন। সেখানে পাণ্ডবদের স্বার্থের হানি না করে যদি সন্ধি স্থাপন করতে পারেন তাহলে এই মহাযুদ্ধ নিবারিত হয়ে সবাই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবেন। অর্দ্ধেক রাজ্য থেকে পঞ্চগ্রামে নেমে আসার পর প্রত্যাখ্যাত হয়েও কৃষ্ণ পাণ্ডবদের স্বার্থের হানি না করে সন্ধির কথা বললেন। স্বার্থের আর কি হানি হতে পারে পাণ্ডব ভ্রাতারা তা বুঝতে পারলেন না। যুধিষ্ঠির তীব্রভাবে এই প্রথম কৃষ্ণের দূত হয়ে কৌরবসভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন যে কৌরবসভায় তাঁর যাওয়া উচিত নয় কারণ কৌরবসভায় গিয়ে কৃষ্ণ হিতকর বাক্য বললেও দুর্য্যোধন তা শুনবেন না। সেখানে অন্যান্য যে সমস্ত রাজা আছেন তাঁরা সকলেই দুর্য্যোধনের বশবর্তী! তাঁরা দুর্য্যোধনের কথাই সমর্থন করবেন এবং সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নিবারিত করার জন্য যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে সেখানে গেলে কৃষ্ণের অনিষ্ট হতে পারে কারণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি অতি দুর্বিনীত প্রকৃতির। কিন্তু কৃষ্ণ নিজ সিদ্ধান্তে অটল, তিনি কৌরবসভায় যাবেনই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বোঝালেন যে দুর্য্যোধন ও অন্যান্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁরা ওঁর কোন ক্ষতি করতে পারবেন না, তিনি একবার কৌরবসভায় গেলেই সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। তাঁর দৌত্য প্রয়াস কখনই ব্যর্থ হবে না। পাণ্ডবদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখেই সন্ধি সংস্থাপিত হবে। কৃষ্ণের পীড়াপীড়িতে যুধিষ্ঠির বাধ্য হয়েই সম্মত হলেন। তিনি বললেন, তুমি আমাদের ভাইয়ের মতন এবং অর্জ্জুনের বিশেষ বন্ধু যদি তুমি একান্তই যেতে চাও তাহলে যাও, তবে আমাদের পক্ষে যা মঙ্গলজনক তাই কৌরবসভায় বলবে। তাতে সন্ধি হলে ভালকথা, নাহলে যুদ্ধই করব।

কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে সন্ধির কথা বারবার বলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও সন্ধির জন্য হস্তিনায় তাঁর যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যুধিষ্ঠির খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরের মনরক্ষার প্রয়াসে একদম বিপরীত কথা বলতে শুরু করলেন। একটু আগেই তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দৌত্য প্রয়াস ব্যর্থ হবে না। এখন তিনি বলতে শুরু করলেন, দুর্য্যোধন ও তাঁর অনুগত বন্ধুরা অধার্মিক, তাঁদের মনোভাব শত্রুতামূলক। বিশেষতঃ তাঁরা অনেক বন্ধু ও সৈন্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁদের পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ থাকায় তাঁরা গর্বিত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। যুধিষ্ঠির দুর্বলতা প্রদর্শন করলে তাঁরা আর পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ ফেরৎ দেবেন না। অথচ কৃষ্ণ নিজেই যুধিষ্ঠিরকে সন্ধির নামে দুর্বলতা প্রদর্শনে বাধ্য করলেন, তবু তিনিই আবার যুধিষ্ঠিরকে দুর্বলতা প্রদর্শন না করতে বলছেন। যুধিষ্ঠির দুর্বলচিত্ত ছিলেন ঠিকই কিন্তু দ্রুপদ-রাজের পুরোহিত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনায় গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হবার পরে যুধিষ্ঠির নিজের মনোবল বৃদ্ধি করে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে সমর-

সজ্জার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেইসময়ে পাণ্ডব হিতৈষী কৃষ্ণের এই ভূমিকায় পঞ্চ ভ্রাতার সমরোৎসাহে ভাঁটা পড়ল। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তিনি কৌরবসভায় গিয়ে দুর্মতি দুর্য্যোধনকে ধর্মপথে ফেরাবার শেষ চেষ্টা করবেন। কিন্তু মনে হয় কৌরবরা তা শুনবেন না এবং সন্ধিতে রাজি হবেন না, তাঁরা যুদ্ধই করবেন। সেইজন্য পাণ্ডবদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকাই বাঞ্ছনীয়। যোদ্ধাদের হাতি, ঘোড়া, রথ, অস্ত্রশস্ত্র, কবচ ও অন্যান্য যুদ্ধ-প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির যত্ন নিয়ে সুসজ্জিত করে রাখা প্রয়োজন। যুদ্ধে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন সেইসব সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য পুরোদমে প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ কৌরবরা কিছুতেই হাতে পাওয়া রাজ্য ফেরৎ দেবেন না।

ভীম কৃষ্ণের এই দ্বিমুখী ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারলেন। অর্জ্জুনের বিশেষ সখা ও অর্জ্জুনের পত্নী সুভদ্রার ভাই বলে ভীম কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করতেন না। কিন্তু এখন কৃষ্ণের এই স্ববিরোধী বাক্যে ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলেন। ভীম বললেন, কৃষ্ণ তুমি কৌরবসভায় যাও, গিয়ে শান্তির কথা বল। যুদ্ধের কথা একদম বলো না, দুর্য্যোধনকেও কোন কটূক্তি করো না। দুর্য্যোধনের প্রশস্তি করো, কারণ দুর্য্যোধন খুব ক্রোধী। সে ক্রুদ্ধ হলে সন্ধি হবেনা এবং সে কারো কাছে নত হয় না। দুর্য্যোধন ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করেছে। মহান্ ভরতবংশ ধ্বংস করা আমাদের উচিত নয়। তার চেয়ে আমাদের উচিত দুর্য্যোধনের কাছে নতি স্বীকার করে শান্তিতে হীনভাবে জীবন যাপন করা। সেইজন্য তুমি দুর্য্যোধনকে তাঁর স্বার্থের বিরোধী কোন কথা বলো না। আমরা দুর্য্যোধনের অধীনে নীচভাবে জীবন যাপন করতে রাজি কিন্তু তবু শান্তি চাই। যুদ্ধে আমার কোন ইচ্ছা নেই, অর্জ্জুনও যুদ্ধ চায় না, আর যুধিষ্ঠিরেরও একই মত। তাই তুমি হস্তিনায় গিয়ে শান্তির জন্য চেষ্টা করো।

যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডব ভ্রাতারা ভীমের মুখে শান্তির বাণী শুনে অবাক হলেন। তাঁরা ভাবলেন ভীম হয়ত সত্যিই যুদ্ধে অনিচ্ছুক-

হয়ে শান্তি চান। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে ভীম তাকে ব্যঙ্গ করছেন। কৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে ভীমকে ব্যঙ্গ করে ভীতু, ক্লীব ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করে পাণ্ডব ভাইদের সামনে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে ভীম সত্যিই ভয় পেয়ে এত শান্তির কথা বলছেন। কৃষ্ণ বললেন, যে ভীমসেন সব সময় আস্ফালন করে বল-গর্ব প্রকাশ করে থাকেন, একাই কৌরবদের নিধন করতে সক্ষম বলে অহমিকা প্রকাশ করেন। যিনি ভ্রাতাদের সামনে গদা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুর্যোধনের উরু চূর্ণ করবেন, আজ তিনিই কৌরবদের ভয়ে ভীত হয়ে ক্লীবের ন্যায় পুরুষত্ববিহীন কথা বলছেন। এইজন্যই বলা হয় যে বিপদকালে বিপরীত বুদ্ধির উদয় হয়। এই পুরুষত্ববিহীন কথা শুনে পাণ্ডবদের মন একদম নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। অথচ পাণ্ডবরা মোটেই যুদ্ধে নিরুৎসাহ হননি একথা কৃষ্ণ ভাল করেই জানতেন।

কৃষ্ণের সঙ্গে ভীমের বাক্‌যুদ্ধ শুরু হওয়ায় অর্জ্জুন অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে অর্জ্জুনেরও ইচ্ছা ছিল যে যুদ্ধ হোক, কিন্তু কেবল ঘনিষ্ঠ সখা কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়েই অর্জ্জুন চুপ করে ছিলেন এবং শান্তি প্রস্তাবের বিপক্ষে কোন কথা বলেন নি। কিন্তু হঠাৎ ভীমসেনকে উত্তেজিত হতে দেখে অর্জ্জুন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি জানতেন যদি ভীম বিরক্ত হয়ে যুদ্ধ প্রত্যাখ্যানের সঙ্কল্প করেন তাহলে পাণ্ডব পক্ষের ঘোর বিপদ হবে এবং যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠবে। তাই অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি ভীমসেনের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধের স্বপক্ষে কথা বললেন। ভীমের এবং কৃষ্ণের মনোভাব অর্জ্জুন খুব ভালভাবেই জানতেন। তাই বুদ্ধিমান অর্জ্জুন কৃষ্ণের প্রশংসা করে বললেন যে কৃষ্ণ কৌরবসভায় গেলেই সন্ধি সংস্থাপিত হবে। তবে কৌরবরা অত্যন্ত দুর্বিনিত হওয়ায় সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন। সেইজন্য আমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। কৃষ্ণ কৌরবসভা থেকে ঘুরে এলে কৌরবদের মনোভাব বুঝে আমরা কর্তব্য স্থির করব। তবে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী কারণ

মরুভূমিতে বীজ নিক্ষেপ করলে তা কোনদিন অঙ্কুরিত হয় না। আর কৃষ্ণের নিজেরও যখন যুদ্ধে আপত্তি নেই তখন যুদ্ধের রাস্তা তো খোলাই আছে। এইভাবে অর্জ্জুন একইসঙ্গে কৃষ্ণ ও ভীম উভয়েরই মন রক্ষা করে কথা বলে তাঁদের শান্ত করলেন। সেই সঙ্গে তিনি একথা জানিয়ে দিতে ভুল করলেন না যে তিনি নিজেও যুদ্ধের স্বপক্ষে। কনিষ্ঠ পাণ্ডব ভ্রাতারা সাধারণতঃ বিশেষ কোন মত প্রকাশ করতেন না। কিন্তু এবার তাঁরাও নিজের নিজের মত প্রকাশ করলেন। নকুল যুধিষ্ঠিরের বিশেষ অনুগামী ছিলেন, তিনি যুধিষ্ঠিরের মতই কৃষ্ণের উপর খানিকটা নির্ভরশীল ছিলেন। সেইজন্য নকুল যুধিষ্ঠিরের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করলেন সহদেব। সন্ধির তীব্রতম প্রতিবাদ করে সহদেব অতীতে কৌরবদের হাতে অপমানিত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করে বললেন কেউ যুদ্ধ না করলে কৌরবদের সঙ্গে তিনি একাই যুদ্ধ করবেন। কৃষ্ণকে তিনি সন্ধির প্রস্তাব পরিত্যাগ করে কৌরবসমীপে যুদ্ধের কথা জানাতে বললেন। সহদেব বললেন যে, এর জন্য যদি তাঁকে অধর্মের পথ নিতে হয় ধর্ম পরিত্যাগ করে তিনি তাতেও রাজি। সহদেবের বাক্যকে অভিনন্দন করে সাত্যকিও যুদ্ধের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা পুনর্বার ব্যক্ত করলেন। এমনকি দ্রৌপদী পর্য্যন্ত যুদ্ধের সমর্থন করলেন।

কিন্তু এসব স্বত্ত্বেও যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন এই দুই প্রধান পাণ্ডব নায়কের মৌন সমর্থনে কৃষ্ণ কৌরবসভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্‌যোগী হলেন। অনেকটা স্ব-নিয়োজিত দূতের মতই। কিন্তু কৃষ্ণ কৌরবদেব কাছে নিজের মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিকেরা যেমন নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকেন সেই রকম। কৃষ্ণ জানতেন যে কৌরবপক্ষে তিনি এক অর্বুদ যাদব সেনা দিয়ে সাহায্য করে নিজের ভূমিকাকে নিরপেক্ষ হিতৈষীর স্থানে আনতে পারলেও দুর্য্যোধনের শক্তিমত্তার কাছে তা বিশেষ গুরুত্ব পায় না। দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে যেটুকু গুরুত্ব বর্তমানে দিচ্ছেন তা একান্তই

রাজনীতির তাগিদে। যে কোন সময় দুর্যোধন কৃষ্ণকে হেনস্থা করতে সক্ষম। একা একা হস্তিনায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গেলে নিরাপত্তার দিক থেকে সেটা বোকামি হবে। কৃষ্ণ তাই নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার তাগিদে পাণ্ডবদের অকৃত্রিম বন্ধু ও নিজের অনুগামী মহাবীর সাত্যকিকে তাঁর সঙ্গে হস্তিনায় যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের দৌত্যপ্রয়াসের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বরাবরই সন্দিহান ছিলেন। তবু কৃষ্ণ অনুরোধ করামাত্র তিনি রাজী হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও সঙ্গীসাথী সমেত কৃষ্ণের সহযাত্রী হলেন যাতে কৃষ্ণের সঙ্গে থেকে তিনি কৃষ্ণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারেন।

এদিকে দুর্যোধন ও অন্যান্যরা খবর পেলেন কৃষ্ণ দূত হয়ে পাণ্ডবদের বার্তা কৌরবসভায় বহন করে আনছেন। সেইসময় দূতকে বিশেষ রূপে সম্মান প্রদর্শন করাই ছিল রাজনৈতিক রীতি। বিশেষ করে কৃষ্ণের মত দূত, পাণ্ডবদের ওপরে যাঁর বিরাট প্রভাব এবং ভারতের বহু বিশিষ্ট রাজা যাঁর অনুগত তাঁকে মহা অভ্যর্থনা প্রদান করাতো রাজনীতিতে অভিজ্ঞ যে কোন রাজার অবশ্য কর্তব্য। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ও ভীষ্ম প্রমুখ জ্যেষ্ঠ কৌরবদের অনুরোধে দুর্যোধন কৃষ্ণের আগমন পথের বিভিন্ন স্থানে তোরণ, সভা ও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ আবাসস্থান নির্মাণ করলেন।

হস্তিনায় পৌঁছে কৃষ্ণ বৃকস্থলে দুর্যোধন নির্মিত অনুপম প্রাসাদে অবস্থিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র এই সংবাদ পেয়ে দুর্যোধনকে আদেশ দিলেন যে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেন বিবিধ প্রকারের ও বহুসংখ্যক ভোগ্যদ্রব্য সমূহ প্রস্তুত রাখা হয়। অমূল্য মনি ও রত্নরাজী, অশ্ব ও হস্তি, দ্রুতগতি রথ ও শত শত দাসী যেন কৃষ্ণকে প্রদান করা হয়। কূটনীতিতে অভিজ্ঞ দুর্যোধন বুঝতে পারলেন যে তাঁর পিতা ধৃতরাষ্ট্র উপঢৌকন প্রদান করে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দুর্যোধন এতে সম্মত হলেন না। তাঁর কাছে কৃষ্ণের গুরুত্ব যতটুকু ছিল ততটুকু সম্মান তিনি ইতিমধ্যেই কৃষ্ণকে প্রদর্শন করেছেন কৃষ্ণের

আগমন পথে সুন্দর বিলাসবহুল সভা প্রভৃতি নির্মাণ করে। এখন আবার কৃষ্ণকে বহুমূল্য ও বিবিধ উপঢৌকন সহকারে অভ্যর্থনা করলে কৃষ্ণের মনে ধারণা জন্মাবে যে কৌরবরা দুর্বল। তাঁরা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার প্রয়াসেই এত উপঢৌকন প্রদান করে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন। এতে যেমন কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য রাজাদের কাছে কৃষ্ণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে তেমনি পাণ্ডবদের কাছে কৌরবদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। একাজ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবমাননাকর কাজেই তা করণীয় নয়। কৃষ্ণের কাছে নিজেদের ভীতু প্রমাণ করার কোন দরকার নেই। তবে প্রচলিত রীতি অনুসারে সাধারণ অভ্যর্থনা কৃষ্ণ নিশ্চয়ই পাবেন।

কৃষ্ণ বৃকস্থল থেকে ধৃতরাষ্ট্র-প্রাসাদে আগমনে উদ্‌যোগী হলে রাজা দুর্যোধন নিজের রাজ পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করতে না গিয়ে, ভ্রাতা দুঃশাসন ও ভীষ্ম এবং দ্রোণকে পাঠালেন অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে। ভীষ্ম, দ্রোণ ও দুঃশাসন আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে কৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে কৃষ্ণ প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে বন্দনা করলেন। তারপর বয়ঃক্রমানুসারে উপস্থিত অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কৃষ্ণের অভিষ্ট আংশিক সিদ্ধ হল। তিনি চেয়েছিলেন দূত হিসাবে আগমন করে কৌরব অনুগত রাজাদের কাছে নিজেকে পরিচিত করাতে। কৌরবসভায় সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শক্তিশালী রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পূর্বেই কৃষ্ণের নাম শুনেছিলেন, এখন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হওয়ায় কৃষ্ণ সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করলেন। বিশেষতঃ কৃষ্ণের বুদ্ধিদীপ্ত নম্র ব্যক্তিত্বে অনেক রাজাই অভিভূত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে কৃষ্ণ আসন গ্রহণ করে আতিথ্য স্বীকার করলেন এবং উপস্থিত কৌরবপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বাক্যালাপ ও পরিহাস প্রভৃতি করতে লাগলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তিনি কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পঞ্চপাণ্ডব যে বার্তা প্রেরণ করেছিলেন তাঁর

মারফৎ, তা জ্ঞাপন করলেন এবং পুত্রদের প্রতি কুন্তীর বার্তা গ্রহণ করলেন।

কিন্তু দুর্যোধনের সঙ্গে কৃষ্ণের তখনও সাক্ষাৎ হয়নি। রাজা দুর্য্যোধন নিজ প্রাসাদে অমাত্য ও বন্ধু পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। তিনি জানতেন যথা সময়ে কৃষ্ণ তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে আগমন করবেন। এইজন্যই তো কৃষ্ণের হস্তিনায় আগমন। কৃষ্ণ কুন্তীর গৃহ থেকে বেরিয়ে দুর্য্যোধনের প্রাসাদের দিকে এগোলেন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় ছিল পরের দিন কৌরবসভায় প্রথাসম্মতভাবে সন্ধির প্রস্তাব তোলার আগে রাজা দুর্য্যোধনকে একটু পরীক্ষা করে দুর্যোধনের মনোভাব অনুমান করা এবং সেইমত উপযুক্ত বাক্যে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করা। কৃষ্ণ ভেবেছিলেন দুর্য্যোধনই প্রধান ব্যক্তি, তাঁর মতামতের ওপরেই সন্ধির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তাই ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে দুর্য্যোধনকে প্রভাবিত করে তাঁর মনোভাব সন্ধির অনুকূলে আনতে পারলে পরের দিন সভায় সন্ধির প্রস্তাব পেশ করা মাত্র কৌরবপক্ষ তাতে সম্মত হবেন। কৃষ্ণ ঠিকই অনুমান করেছিলেন, কিন্তু ভুল করেছিলেন দুর্য্যোধনের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন ভেবে। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাজনীতিতে অভিজ্ঞ কূটকৌশলী দুর্যোধন আগের থেকেই কৃষ্ণের মনোভাব বুঝতে পেরে নিজ প্রাসাদে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। কৃষ্ণ দুর্বলচিত্ত যুধিষ্ঠিরকে প্রভাবিত করতে পারলেও রাজা দুর্য্যোধনের ব্যক্তিত্বের কাছে পরাজিত হলেন। দুর্য্যোধন জানতেন কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার সুযোগ চান। যার উদ্দেশ্য একটাই, যুক্তি দ্বারা তাঁকে সন্ধির প্রস্তাব বোঝানো। কিন্তু দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ব্যক্তিগত আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানোর মত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করলেন না। একজন সাধারণ দূতকে তৎকালীন প্রথানুযায়ী যতটুকু অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হতো দুর্যোধন তাই করলেন, কোন অতিরিক্ত সম্মান কৃষ্ণ পেলেন না। এইখানেই কৃষ্ণ হতাশ হলেন। জীবনের চরমতম

হতাশায় কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে অঙ্কে ভুল হয়েছে। এক অর্বুদ যাদবসেনা দুর্যোধনকে দান করে কৃষ্ণ কৌরবপক্ষে যতটা গুরুত্ব পাবেন ভেবেছিলেন তা হল না। শুধু কৃতজ্ঞতার খাতিরে অভিজ্ঞ রাজনীতিক দুর্যোধন কাউকে এমন কোন সম্মান বা গুরুত্ব প্রদান করতে নারাজ, যাতে তাঁর নিজের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

দুর্যোধনের বাসগৃহে গিয়ে কৃষ্ণ দেখলেন বহু অমাত্য ও বীর পরিবৃত হয়ে রাজা দুর্যোধন বসে আছেন। কৃষ্ণকে দেখে দুর্যোধন প্রথাসম্মত অভিবাদন করলেন। কৃষ্ণ প্রত্যাভিবাদন করে কৌরবপক্ষাবলম্বী বিভিন্ন রাজার সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণের আশা ছিল দুর্যোধন নিজের থেকেই কুরু-পাণ্ডব বিবাদ সম্বন্ধীয় কথা তুলে আলোচনার সূত্রপাত করবেন। কিন্তু দুর্যোধন মামুলি আলাপ করে কৃষ্ণকে ভোজন করতে নিমন্ত্রণ করলেন। এমন কোন পরিবেশ কৃষ্ণ সেখানে পেলেন না যা একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দূতের আগমনে সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণের দুর্যোধনের বাসগৃহে গমন আপাত দৃষ্টিতে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার হলেও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে ভোজনের উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণ পরিচিত বন্ধুরূপে যাননি। যে সম্মান ও গুরুত্ব তিনি দুর্যোধনের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আশা করেছিলেন তা পূরণ হল না দেখে তিনি ক্রোধে ও হতাশায় জ্বলে উঠে ভোজনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি সমভিব্যাহারে দুর্যোধনের অবহেলায় কৃষ্ণ ততক্ষণে স্থির নিশ্চিত যে কৌরবপক্ষে তিনি অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্ব-হীন এবং অপাংক্তেয়। এই অবহেলার পরেও দুর্যোধনের গৃহে ভোজন গ্রহণ করা নিতান্তই অপমানজনক।

দুর্যোধন কৃষ্ণের মনোভাব অনুমান করে ভোজনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার কারণ জানতে চাইলে কৃষ্ণ যা বলেছিলেন তার চেয়ে বড় হতাশাপূর্ণ উক্তি আর হয় না। এই উক্তি সর্বাংশে কৃষ্ণের হতাশ ও ব্যর্থ মনোভাবের পরিচায়ক। কৃষ্ণ দুর্যোধন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে

উত্তর দিলেন, আমি দূত হয়ে এসেছি। দূতেরা দৌত্যকার্য্যে সফল হলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকেন। "আমিও দৌত্যকার্য্যে সফল হলেই কেবলমাত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দুর্য্যোধন কপট অনুনয়ে কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করলে অনুনয়ের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গার্থ উপলব্ধি করে কৃষ্ণ ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হলেন। কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। নিজের ভূমিকা ভুলে গিয়ে একজন দূতের যা করা কখনই উচিত নয় কৃষ্ণ তাই করলেন। তীব্র ভাষায় দুর্য্যোধনকে কটুবাক্য বলে নিন্দা-মন্দ করে ক্রোধে দুর্য্যোধনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিদুরের ঘরে আশ্রয় নিলেন। হতাশা ও ব্যর্থতা এর চেয়ে বেশী প্রকট হতে পারে না। যার সঙ্গে সন্ধি করতে যাওয়া তাকেই কটুবাক্য বলা উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী কাজ। তার ভূমিকা যতই নিরুৎসাহের হোক না কেন ধৈর্য্য ধরে তার মন জয়ের চেষ্টা করাই অভিজ্ঞ দূতের লক্ষণ। কৃষ্ণ নিজের সম্মানের কথা বিবেচনা করে দুর্য্যোধনের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন না। কিন্তু দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা তাঁর উচিত ছিল। এর দ্বারা তিনি দুর্য্যোধনের মন জয় করার একটা সুযোগ পেতেন। যদিও রাজা দুর্য্যোধন নিজ কর্তব্য স্থির করেই রেখেছিলেন তবু পরের দিন সন্ধির প্রস্তাব উঠলে কৌরবপক্ষের অন্যান্য মহারথীদের চাপে পড়ে হয়ত তিনি পঞ্চ গ্রামের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতেন। যদিও জোর দিয়ে একথা বলা যায় না, তবু দুর্য্যোধনের গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা কৃষ্ণের একটি অবিবেচনা প্রসূত রাজনৈতিক ভুল। কারণ রাজনীতিতে সবই সম্ভব। অন্ততঃ একজন দূতের পক্ষে এ কাজ অবিবেচনার।

কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গিয়ে ভোজন করে রাত্রি যাপন করলেন। সারা রাত্রি কৃষ্ণ বিদুরের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। বিদুর দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত হলেও মনে মনে পাণ্ডবপক্ষকে অধিক সমর্থন করতেন। দুর্য্যোধনকে বিদুর কৃষ্ণের চেয়ে অনেক বেশী চিনতেন। কৃষ্ণের মুখে

দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কথা শুনে বিদুর চিন্তিত হলেন। কৃষ্ণকে তিনি শঙ্কিত মনে কৌরবসভায় যেতে নিষেধ করলেন। কারণ তিনি জানতেন দুর্যোধনকে কৃষ্ণ কটুবাক্য বলার পর কিছুতেই আর সন্ধি স্থাপিত হবে না। উল্টে কৌরবসভায় গিয়ে কৃষ্ণ বড় বড় কথা বললে বিপদ হতে পারে। কিন্তু ততক্ষণে দুর্যোধন-গৃহে অপমানিত কৃষ্ণ ক্রোধ সংবরণ করে অন্য পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। তৎকালীন ধর্মভিত্তিক সমাজের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ধর্মকে তিনি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করলেন। বিদুরকে তিনি বোঝালেন যে কৌরবসভায় তিনি ধর্মের সংস্থাপক রূপেই যাবেন। ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই সন্ধির প্রয়োজন। সন্ধি স্থাপিত হলে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ বন্ধ হয়ে আত্মীয় হনন ও লোকক্ষয়রূপ অধর্ম নিবারিত হবে। আসলে দুর্যোধনের মনোভাব অনুমান করেই কৃষ্ণ এই পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে সন্ধির আর কোন আশা নেই, কিন্তু এখন কৌরবসভায় না গিয়ে এমনিই ফিরে গেলে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের কাছেই হাস্যাস্পদ হতে হবে। কারণ পাণ্ডবরা তাঁকে আগেই হস্তিনাপুরে যেতে বারণ করেছিলেন। কৃষ্ণ তাই পরিকল্পনা করলেন, ধর্মীয় তত্ত্বকথায় কৌরব-সভার বৃদ্ধ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে দুর্যোধনের সঙ্গে মতভেদ সৃষ্টি করতে হবে। সন্ধির একটা ধর্মীয় ব্যাখ্যা পেলে ধার্মিক ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ জ্যেষ্ঠ কৌরবরা সন্ধির সমর্থন করবেন যা দুর্যোধনের মনঃপুত হবে না এবং এইভাবে কৌরবশিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করে দুর্যোধনকে কৌরবপক্ষের জ্যেষ্ঠ মহারথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণও সবার প্রশংসা পাবেন। কারণ পরে যুদ্ধ হলে এবং কৌরবরা পরাজিত হলে সবাই বলবেন কৃষ্ণতো আগেই কৌরবদের বুঝিয়েছিলেন কিন্তু কৌরবরা কৃষ্ণের কথায় কর্ণপাত করেননি বলেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন।

অপমানের ক্রোধ সংবরণ করে কৃষ্ণের এই পরিকল্পনা প্রকৃতই একজন প্রাজ্ঞ কূটনীতিকের উপযুক্ত। এই পরিকল্পনার ফল সুদূর

প্রসারী হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদের বীজও এই পরিকল্পনাতেই বপন করা ছিল। সন্ধির ব্যর্থতা কৃষ্ণের পক্ষে অগৌরবের সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর এই শেষ চেষ্টার ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনি সন্ধির সপক্ষে দুঃশাসনের মত ব্যক্তিরও সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন যার মূল্য নেহাৎ কম নয়।

সাত্যকি ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ কৌরবসভায় পরের দিন সকালে উপস্থিত হলেন। প্রথাসম্মতভাবে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন বিনিময় হবার পর সবার সঙ্গে কৃষ্ণ আসন গ্রহণ করলেন। আসন গ্রহণ সম্পূর্ণ হলে কৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে সন্ধির প্রস্তাব সভায় পেশ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের পিতা এবং কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষের অভিভাবক। তাঁকে সম্বোধন করে সন্ধির প্রস্তাব আনয়ন রীতিসম্মত ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। বিশেষতঃ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত ও ধর্মভীরু হওয়ায় সহজে তাঁর মন জয় করা সম্ভব। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন, কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যাতে পরস্পর সন্ধি স্থাপন হয় সেইজন্যই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করতে এসেছেন। তাঁর অন্য কিছু প্রার্থনীয় নেই। ধৃতরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠকুলজাত তিনিই কৌরবদের প্রকৃত শাসনকর্তা। কিন্তু তাঁর বর্তমানেই কৌরবরা দুর্যোধন প্রভৃতির নেতৃত্বে প্রকাশ্যেই অনুচিত ব্যবহার করছে। ধৃতরাষ্ট্র ইচ্ছা করলে এই মহাযুদ্ধের হাত থেকে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলকেই রক্ষা করতে পারেন। এই সভায় বহু ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সন্ধি হওয়াই বাঞ্ছনীয় না হলে সভার ধর্ম নষ্ট হবে। ধৃতরাষ্ট্রের বহু প্রশংসা করে এবং উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মানোচিত বাক্য বলে কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব সভামধ্যে আনয়ন করলেন। কৃষ্ণ বরাবরই বাক্যে সুপটু ছিলেন, তাঁর কথায় কৌরবসভার জ্যেষ্ঠ মহারথীরা বিশেষ প্রভাবিত হলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজেও বিশেষভাবে কৃষ্ণের কথায় প্রভাবিত হলেন। কিন্তু প্রভাবিত হলে কি হবে সমস্ত ক্ষমতা তো দুর্যোধনের হাতে

কুক্ষিগত। ধৃতরাষ্ট্র তাই সন্ধির প্রতি সমর্থন জানিয়েও সন্ধি স্থাপনে অক্ষমতা প্রকাশ করে কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন দুর্যোধনকে বলার জন্য।

কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন তাঁর পরিকল্পনার প্রথম ধাপ রূপায়িত হয়েছে। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছেন সন্ধির সপক্ষে। কৃষ্ণ এবার দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন। তাঁর ভাষা ও বলার ভঙ্গি ছিল অনেকটা অভিভাবকের মত, যাতে তাঁর কথা কৌরবপক্ষের অভিভাবকদের মন স্পর্শ করে। কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বললেন, মহাপ্রাজ্ঞকুলে জন্মগ্রহণ করে পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে ধর্মবিরুদ্ধ যুদ্ধ করা দুর্যোধনের উচিত নয়। ধৃতরাষ্ট্রের সমর্থন পেয়ে কৃষ্ণ সভার মধ্যে দুর্যোধনকে উপদেশ প্রদান করতে শুরু করলেন। কৃষ্ণ জানতেন যত তিনি এই সভায় রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে টেনে আনতে পারবেন ততই তিনি সাফল্য লাভ করবেন। আর দুর্যোধন ততই উপস্থিত ধর্মভীরু ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। কৃষ্ণ দুর্যোধনকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির করণীয় কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ দিতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, প্রাজ্ঞগণের কর্ম ত্রিবর্গ সংযুক্ত; অন্যান্য লোক ত্রিবর্গ সাধনে অসমর্থ হইয়া কেবল ধর্ম ও অর্থের অনুগামী হয়; কিন্তু ধীর ব্যক্তি পৃথক পৃথক কর্ম লভ্য ত্রিবর্গের মধ্যে কেবল ধর্মকেই লক্ষ্য করিয়া চলেন। মধ্যম লোকে কলহের মূল অর্থের নিমিত্ত কর্ম করে, আর বালকেরাই কেবল কামনার বশবর্তী হয়। যে নীচ ব্যক্তি লোভ পরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি প্রকৃত উপায়ের অভাবে কেবল কাম ও অর্থের অভিলাষী হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেননা কাম ও অর্থ কদাপি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে না। অতএব যিনি কাম ও অর্থলাভের কামনা করেন, প্রথমে তাহার ধর্ম লাভ করাই নিতান্ত কর্তব্য। ধর্মই ত্রিবর্গ লাভের উপায়। যে ব্যক্তি ধর্মস্বরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গ লাভের অভিলাষ করেন, তিনি কক্ষগত পাবকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

এইভাবে কৃষ্ণ দার্শনিকের ন্যায় কৌরবসভায় এক ধর্মমিশ্রিত রাজনৈতিক দর্শন ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। দুর্যোধন কৃষ্ণের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেও কৃষ্ণকে থামাবার কোন চেষ্টা করলেন না। কারণ কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষের দূত, কৌরবদের সম্মানীয় অতিথি তার ওপর পিতা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বাক্য সমর্থন করছেন, এই অবস্থায় কৃষ্ণকে কথা বলায় বাধা দিলে সভায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যেই সভায় সন্ধির সপক্ষে মত প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। দুর্যোধন তাই অস্বস্তি সহকারে চুপ করে রইলেন, কোন কথা বললেন না।

কৃষ্ণের কথা শুনে কৌরবপক্ষের প্রধান ভরসা ভীষ্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে দুর্যোধনকে সদুপদেশ প্রদান করে সন্ধি স্থাপন করতে বললেন। দুর্যোধন এবার চিন্তিত হলেন। কৌরবরা যেসব মহারথীর ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ভীষ্ম তাঁদের অন্যতম। ধার্মিক পুরুষ রূপেও ভীষ্ম যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পিতামহ ভীষ্মের এই বাক্যে প্রভাবিত হয়ে সভাস্থিত অন্যান্য অমাত্য ও দুর্যোধন বান্ধবদের সন্ধি সমর্থন করার যথেষ্ট সম্ভাবনা। দুর্যোধন যে ভয় করছিলেন তাই হল। ভীষ্মের কথা শেষ হতে না হতেই আচার্য্য দ্রোণ দুর্যোধনকে সম্বোধন করে সন্ধি স্থাপন করতে পরামর্শ দিলেন। দ্রোণাচার্য্য উভয় কুলের অস্ত্রগুরু এবং কৌরব-অন্নে জীবন ধারণ করলেও তিনি অর্জুনকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তিনি ভীষ্মের কথার পুনরাবৃত্তি করে সভাস্থিত সমবেত কৌরবদের নিরুৎসাহ করে বললেন যে যদি দুর্যোধন সন্ধি স্থাপন না করেন তাহলে যুদ্ধে পাণ্ডবদের নিকট কৌরবদের অবশ্যই পরাজিত হতে হবে। কারণ অর্জ্জুনের তুল্য বীর ভূভারতে আর কেউ নেই।

দ্রোণাচার্য্যের ওপরে কৌরবপক্ষ বিশেষ ভাবে যুদ্ধ-নির্ভর ছিলেন। তার ওপর দ্রোণাচার্য্য গুরু। তৎকালীন সমাজে আচার্য্যের স্থান ছিল সবার ওপরে। আচার্য্যের বাক্য অবশ্যই পালনীয় একথাই সবাই মনে করতেন। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করার কথা কারুর মনেও

আসত না। দ্রোণের সন্ধি সমর্থনে দুর্যোধন খুবই অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়ে গেলেন। প্রকৃতপক্ষে ভীষ্ম-দ্রোণের সন্ধিকে সমর্থন কৌরব রাজসভায় এক দুর্যোধন-বিরোধী হাওয়া বইয়ে দিল। একের পর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সন্ধির সপক্ষে মত প্রকাশ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ এটাই চাচ্ছিলেন। রাজসভায় দুর্যোধন-বিরোধী হাওয়া বইয়ে দিয়ে দুর্যোধনকে কৌরব মহারথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করাইতো কৃষ্ণের পরিকল্পনা। দুর্যোধন যাদের ওপর ভরসা করে যুদ্ধ করার স্বপ্ন দেখছেন তাদের যুদ্ধপরাঙ্মুখ করতে পারলেই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সফল হবে। কারণ দুর্যোধন তাহলে যুদ্ধ করবেন কাদের নিয়ে? যুদ্ধ না হলে সন্ধি ছাড়া দুর্যোধনের তখন আর কোন উপায় থাকবেনা। কৃষ্ণও দৌত্যকার্যে সফলতা লাভ করে উভয়পক্ষের কাছে প্রিয় হতে পারবেন, যা তাঁর একান্তই অভিলাষ। কিন্তু দুর্যোধন জানতেন কখন কোথায় কিভাবে কথা বলতে হয়। বিদুর সন্ধির সপক্ষে কথা বলার পরেই দুর্যোধন নিজের মত সভায় প্রকাশ করলেন। দুর্যোধন সভার গতি আর নিজের বিপক্ষে প্রবাহিত হতে দিলেন না। তিনি পরিষ্কার যুক্তি দেখিয়ে কৃষ্ণ সহ ভীষ্ম, দ্রোণ ও সভাস্থ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ কৌরবদের বুঝিয়ে দিলেন যে পাণ্ডবরা নিজের দোষেই রাজ্য হারিয়েছেন, তাঁদের রাজ্য জোর করে কেউ কেড়ে নেয়নি। এখন যুদ্ধের আয়োজন করে ভয় দেখিয়ে রাজ্য আদায় করা যাবে না। দুর্যোধন কৃষ্ণের ধর্মকে রাজনীতিতে ঢোকানো সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কি তা বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণকে বুঝিয়ে দিলেন যে সন্ধির কোন আশা নেই। কিন্তু ইতি-মধ্যেই কৃষ্ণ কূটনীতিতে বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছেন। যা তাঁর একান্ত অভিপ্রেত তাই ঘটেছে, কৌরবপক্ষে দুর্যোধনের দক্ষিণ হস্ত রূপ মহারথীদের মনোবলে চিড় ধরেছে। এমনকি দুর্যোধনের প্রিয়তম ভ্রাতা দুঃশাসন পর্যন্ত পিতা ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম ও গুরুদেব দ্রোণের কথায় ভয় পেয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্যোধনকে সন্ধি করার

পরামর্শ দিলেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে সন্ধি গ্রহণ না করলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্র অন্যান্য কৌরবদের সহায়তায় দুর্যোধনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের হাতে সমর্পন করবেন। দুঃশাসনের কথা শুনে দুর্যোধন বুঝলেন যে দুঃশাসন ভয় পেয়েছেন। কাজেই এই সভায় আর থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সভায় থাকলেই এই ভয় একে একে সবার মনেই সংক্রামিত হবে। দুর্যোধন তাই বিরক্তি সহকারে গাত্রোত্থান করে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। দুর্যোধনের ভ্রাতারা সকলেই তাঁর অনুগমন করলেন। হঠাৎ দুর্যোধনের সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কৃষ্ণ এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি দুর্যোধনের অনুপস্থিতির সুযোগে বিভিন্ন প্রকারের কথা বলে সভাস্থ সবাইকে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন। কুরুবৃদ্ধদের বারবার প্রশংসা করে ও ধর্মের কথা শুনিয়ে কৃষ্ণ সভাস্থ কৌরবমণ্ডলীকে প্রায় সম্মোহিত করে এক দুঃসাহসী প্রস্তাব আনলেন। উগ্রসেন ও তাঁর অবাধ্য পুত্র কংসের তুলনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন বৃদ্ধ কৌরবদের উচিত অবাধ্য দুর্যোধনকে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বন্দী করে পাণ্ডবদের হস্তে সমর্পন করা। তাহলে সমগ্র কৌরবকুল আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। একজনের জন্য সবার ধ্বংস হওয়া উচিত নয়।

কৌরবসভায় কৃষ্ণের এই ভূমিকা তুলনাহীন। দৌত্যকার্য্যের শুরুতে দুর্যোধনকে তোষন করার যে নীতি কৃষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন, দুর্যোধন কর্তৃক অবহেলিত হয়ে তা কাটিয়ে উঠে দৃঢ়ভাবে কৌরবসভায় উপস্থিত হয়ে ধর্মকে সামনে রেখে কৌরবপক্ষে বিভেদ সৃষ্টি করা প্রকৃতই একজন প্রাজ্ঞ কূটনীতিকের কাজ। কুরুবৃদ্ধদের মনোভাব অনুমান করে এবং বৃদ্ধের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের মন জয় করা কৃষ্ণের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দেয়। কৃষ্ণ জানতেন বৃদ্ধরা সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয় হন, তাই শান্তির প্রস্তাবে সর্বপ্রথম সমর্থন লাভ করা যাবে তাঁদের কাছ থেকে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ,

দুর্বলচিত্ত ও বৃদ্ধ, তাই তিনি সন্ধির সমর্থন করবেন বিশেষতঃ দুর্যোধন যখন তাঁর অবাধ্য। ভীষ্ম ও দ্রোণের মত প্রভাবশালী বৃদ্ধদের কাছ থেকে শান্তির প্রস্তাবে সমর্থন পেলে প্রকাশ্যে দুর্যোধন ছাড়া আর কেউ তার বিরোধিতা করতে সাহস পাবেন না এবং যিনি বিরোধিতা করবেন তিনিই কৌরবদের একাংশের কাছে নিন্দিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হবেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃষ্ণ কৌরবসভায় সুচতুর বাক্যবিন্যাস দ্বারা প্রায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন, শুধু বাধা পেলেন দুর্যোধনের রাজনৈতিক বিবেচনা শক্তির কাছে।

দুর্যোধন সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠালেন গান্ধারীকে সভায় আনার জন্য। যদি মাতা গান্ধারী শেষবারের মত পুত্রকে বোঝাতে পারেন। কৃষ্ণের দুর্যোধনকে বন্দী করার প্রস্তাবে কেউই কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। কারণ কৌরবপক্ষীয় ব্যক্তিগণ জানতেন দুর্যোধনকে বন্দী করা অসম্ভব ব্যাপার। সমস্ত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্যোধনের করায়ত্ত। তাঁকে বন্দী করতে গেলে নিজেরই বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা। গান্ধারী সভায় আসার পর ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে বিদুর গিয়ে দুর্যোধনকে আবার অনুরোধ করে সভায় নিয়ে এলেন। যথারীতি মাতা গান্ধারীর অনুরোধও প্রত্যাখ্যাত হল। দুর্যোধন মাতার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন বটে কিন্তু চিন্তিত হলেন সভার অবস্থা দেখে। কৌরবদের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য এবার তিনি এক দৃঢ় পদক্ষেপের কথা চিন্তা করলেন। ইতিমধ্যে বুদ্ধিমান সাত্যকি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণের ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, এবার বিপদ ঘটবে। দুর্যোধন সভার মধ্যে অপমান নীরবে হজম করার পাত্র নন। সাত্যকি তাড়াতাড়ি সভা থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে আগত অনুচরদের অস্ত্রসহ প্রস্তুত হয়ে সভার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন যাতে সভা থেকে বেরোনোর সময় কেউ কৃষ্ণকে বাধা প্রদান করতে না পারে। তারপর সভার ভিতরে প্রবেশ করে কৃষ্ণকে জানালেন দুর্যোধনের কৃষ্ণকে বন্দী করার অভি-

সন্ধি। ধৃতরাষ্ট্র, ও বিদুর সহ অন্যান্যরাও দুর্যোধনের কূটনীতির রীতি-বিরুদ্ধ অভিপ্রায়ের কথা জ্ঞাত হলেন।

কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনায় আসার আগে থেকেই বিদুর পাণ্ডবদের কৌরবসভার খবরাখবর নিয়মিত জানাতেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর প্রথম থেকেই যোগাযোগ ছিল। বিদুরের একটা ধার্মিক ভাবমূর্তি প্রচলিত থাকায় কৌরবদের ওপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে তাঁর ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। যখন বিদুর দেখলেন ধার্মিক যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত কৃষ্ণের অনুগামী এবং একান্তই কৃষ্ণ নির্ভর তখন তিনিও অতি সহজেই কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কৃষ্ণের দৈব ভাবমূর্তি গড়ে তোলায় প্রচারকের ভূমিকা পালন করতে লাগলেন। এখন সাত্যকির মুখে দুর্যোধনের কৃষ্ণকে বন্দী করার অভিপ্রায় শুনে বিদুর তৎক্ষণাৎ নিজের ভূমিকা পালন শুরু করে দিলেন। সভার মধ্যে তিনি কৃষ্ণের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী বর্ণনা করে কৃষ্ণের দৈবমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। উদ্দেশ্য একটাই, কৃষ্ণকে দেবতা প্রমাণ করে উপস্থিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দ্বারা দুর্যোধনকে বাধা প্রদান। দূতকে বন্দী করার প্রয়াসে উপস্থিত কুরুবৃদ্ধরা সবাই ক্ষুব্ধ হলেন। কৃষ্ণ নিজে ভয় পেয়ে সভার মধ্যে বিস্তর তর্জনগর্জন করে তাড়াতাড়ি সাত্যকি ও অন্যান্য অনুচরদের দ্বারা রক্ষিত ও পরিবেষ্টিত হয়ে রথে আরোহণ করে পলায়ন করলেন। কৃষ্ণের দৌত্যপ্রয়াস এখানেই শেষ হল। রাজা দুর্যোধন সন্তুষ্ট হলেন এই ভেবে যে কৃষ্ণকে ভয় দেখিয়ে তিনি কৌরবদের মনোবলের ওপর চাপ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করতে পেরেছেন।

কৃষ্ণের কৌরবসভায় বিশ্বরূপ দর্শন করানোর কথা বিশ্বাস করতে গেলে ধরে নিতে হয় যে কৃষ্ণ সম্মোহন বিদ্যা জানতেন। তা না হলে আর কিভাবে একজন মনুষ্যদেহধারী রাজনৈতিক দূতের মুখের মধ্যে অনল, আদিত্য বায়ুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র ও ত্রয়োদশ বিশ্বদেবের দেখা পাওয়া যায়। শুধু কি তাই, তাঁর লোমকূপ থেকে সূর্য্যকিরণের

মত তেজঃরশ্মির বিকিরণ ও বাহুদ্বয়ের থেকে মহা মহা বীরের উৎপত্তি গণসম্মোহন বিদ্যা করায়ত্ত না থাকলে আর কিভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব? আসলে এইসব ঘটনার প্রচারের উদ্দেশ্য সেই একটাই, দেবতা সৃষ্টি। কৃষ্ণকে দেবতা তৈরী করা চাই। যখনি কৃষ্ণ কোন বড় রকমের বিপদে বা অসুবিধায় পড়েছেন তখনি সাধারণের যুক্তির অগম্য ঘটনাবলী দিয়ে তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ নিজের প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্বের জন্য হয়ত অনেক বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেইসব ঘটনার ব্যাখ্যা সাধারণের যুক্তির অগম্য। আসলে দুর্যোধন কৃষ্ণকে প্রকৃতই বন্দী করতে চাননি চাইলে তিনি অবশ্যই তা করতে সক্ষম হতেন। কৌরব রাজধানীতে মহা মহা বীরের বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণকে বন্দী করতে চাইলে কৃষ্ণের সঙ্গে আগত বীরদের এমন কোন ক্ষমতা ছিলনা যে সমগ্র কৌরবসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁরা কৃষ্ণকে রক্ষা করেন। দুর্যোধন কৃষ্ণকে ভয় দেখাতেই চেয়েছিলেন। যখন দুর্যোধন দেখলেন সভার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন তিনি প্রথমে সভা ত্যাগ করে আলোচনার গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা হলনা দেখে বুদ্ধিমানের মত তিনি কৃষ্ণকে ভয় দেখিয়ে সভাত্যাগে বাধ্য করে সন্ধির আলোচনা পণ্ড করে দিলেন। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আলোচনায় আলোচনার গতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিকূল হলে সেই আলোচনা যে কোন উপায়ে পণ্ড করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কৃষ্ণের দৌত্যপ্রয়াস সফল হলনা কেন? তিনি তো হস্তিনায় যাত্রা করার সময় পাণ্ডবদের বলে এসেছিলেন কৌরবসভায় উপস্থিত হতে পারলে তিনি সন্ধি স্থাপনে অবশ্যই সক্ষম হবেন। যে আত্মপ্রত্যয় কৃষ্ণ পাণ্ডবদের হস্তিনায় আসার আগে দেখিয়েছিলেন তা কি প্রকৃতই আন্তরিক ছিল? কৃষ্ণের দৌত্যপ্রয়াস ব্যর্থ হবার কারণঃ প্রথম, দুর্যোধন কৃষ্ণের কাছ থেকে যাদবসেনা গ্রহণ করেও কৃষ্ণের প্রতি

কৃতজ্ঞ ছিলেন না। দ্বিতীয়, কৌশলে পাণ্ডবদের রাজ্য কুক্ষিগত করে দুর্যোধন পাণ্ডবদের চেয়ে রাজনীতিতে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন এবং সন্ধির নামে সেই সুবিধা বোকার মত তিনি ত্যাগ করতে চাননি। তৃতীয়, কৌরব সেনাবাহিনী ও প্রশাসন তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তাঁর প্রশাসনে কোন আভ্যন্তরীণ-বিরোধ ছিলনা। চতুর্থ, সামরিক শক্তির বিচারে কৌরবপক্ষের শক্তি পাণ্ডবদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। পঞ্চম, দুর্যোধনের মন জয় করতে না পেরে কৃষ্ণের হতাশ ও ক্রোধী ভূমিকা। ষষ্ঠ, কৃষ্ণ নিজেও জানতেন সন্ধি হবার নয় তবু কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই তিনি হস্তিনায় গিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দৌত্যপ্রয়াসের মাধ্যমে নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা।

কৃষ্ণ সন্ধি স্থাপনে সক্ষম হননি একথা সত্য কিন্তু কৌরবসভায় তাঁর কূটনৈতিক ভূমিকার দ্বারা তিনি পাণ্ডবদের হয়ে অর্ধেক যুদ্ধজয় তখনি করে ফেলেছিলেন। সমবেত কৌরব অমাত্যদের দুর্যোধনের থেকে মানসিক বিচ্ছিন্নকরণ কৃষ্ণের কূটনীতির এক আশ্চর্য্য সাফল্য। কৌরবসভা থেকে বেরিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে যাবার আগে কৃষ্ণ আবার এক সাহসী কূটনৈতিক প্রয়াস নিলেন। কৃষ্ণ জানতেন কৌরবপক্ষের অন্যতম ভরসা মহান্ কর্ণ অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। সন্ধির প্রস্তাবে কৃষ্ণ সবার কাছ থেকেই সমর্থন পেয়েছিলেন, কিন্তু মহারথীদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন কর্ণ। কর্ণ দৃঢ়ভাবে রাজা দুর্যোধনকেই সমর্থন করেছিলেন। কর্ণের বীরত্ব সম্বন্ধে কৃষ্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। হস্তিনা ত্যাগ করার আগে কৃষ্ণ তাই শেষ চেষ্টা করলেন দুর্যোধনের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটিয়ে কর্ণকে স্বপক্ষে আনতে।

একান্তে নির্জনে কর্ণকে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ কর্ণকে অনেক বোঝালেন। কর্ণের জন্ম রহস্য প্রকাশ করে কর্ণকে অনেক লোভ দেখালেন। কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, কুন্তীর কন্যাবস্থায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তাই ধর্মানুসারে তিনিই পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য তাঁরই প্রাপ্য। দুর্যোধনকে ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে এলে পাণ্ডব ভ্রাতারা

তাঁকেই সিংহাসনে বসাবেন। পাণ্ডবদের অনুগত সমস্ত রাজারাও কর্ণের বশীভূত হয়ে থাকবেন এমনকি কৃষ্ণ নিজেও কর্ণের অধীনতা স্বীকার করবেন। পাণ্ডব ভ্রাতাদের সহায় রূপে পেলে কর্ণ নিষ্কণ্টক রাজ্য সুখে ভোগ করবেন। তাই কর্ণের দুরাত্মা দুর্যোধনকে ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করাই শ্রেয়। কৃষ্ণ ভেবেছিলেন তাঁর বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং রাজ্যলোভে কর্ণ কৃষ্ণের কথায় কৌরবপক্ষ ত্যাগ করবেন। কিন্তু তা হলনা, মহাভারতের এক উজ্জ্বল চরিত্র কর্ণ রাজ্যের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রয় করলেন না। বিনীত ভাবে তিনি কৃষ্ণকে জানালেন যে রাজ্যে তাঁর প্রয়োজন নেই। আর কৃষ্ণের কথামত যদি কর্ণ রাজ্য লাভ করেন, তবু সেই রাজ্য তিনি নিজে ভোগ না করে দুর্যোধনকেই দেবেন, কারণ দুর্যোধনের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। কৃষ্ণকে কর্ণ জানিয়ে দিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রেই আবার তাঁদের দেখা হবে। কৃষ্ণ বিফল মনোরথ হয়ে বিষণ্ণচিত্তে যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে গেলেন।

কৃষ্ণের বিভিন্ন কূটনৈতিক প্রয়াস বারবার বাধা প্রাপ্ত হয়েছে, প্রত্যক্ষ ফললাভ বিশেষ কিছুই হয়নি কিন্তু পরোক্ষ ফললাভ যা হয়েছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। কুন্তীর কাছ থেকে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত জেনে নিয়ে কর্ণের কাছ তা প্রকাশ করা কর্ণের মনের ওপর চাপ সৃষ্টির এক সূক্ষ্ম প্রয়াস, পরবর্তীকালে যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের মনের ওপর যার প্রভাব পড়েছে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আগেই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের হয়ে একা এক স্নায়বিক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সমগ্র কৌরব মহারথীদের বিপক্ষে এবং এই স্নায়বিক যুদ্ধের সাফল্য কৃষ্ণের কূটনীতির সাময়িক ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে।

কৌরবসভায় কৃষ্ণ কিভাবে কৌরবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছিলেন কৃষ্ণের নিজের কথাই তার প্রমাণ। হস্তিনা থেকে ফিরে যুধিষ্ঠিরের কাছে যখন তিনি তাঁর দৌত্য কার্য্যের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন যুধিষ্ঠিরকে তিনি বললেন,······কিন্তু যখন দেখিলাম দুর্যোধন সন্ধিস্থাপনে সম্মত নহে, তখন সমুদয় ভূপতিগণকে একত্র করিয়া দেব-মানুষ সম্পর্কীয়

কার্য্যের কীর্তন, অদ্ভুত অমানুষ, দারুণ কর্মপ্রদর্শন, সেই সমুদয় ভূপতিগণকে ভৎসন, দুর্য্যোধনকে তৃণজ্ঞান, ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে কপট দ্যূতনিবন্ধন নিন্দা এবং কর্ণ ও শকুনিকে বারংবার ভয় প্রদর্শন পূর্বক ভেদোৎপাদন করিতে লাগিলাম।

এইরূপে সেই সমুদয় ভূপতিদিগকে বাক্য ও মন্ত্রণা দ্বারা ভেদিত করিয়া পরিশেষে কুরুবংশীয়গণের অভেদ ও স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত দানপক্ষ অবলম্বনপূর্বক দুর্য্যোধনকে কহিলাম, 'হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়! মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ স্ব স্ব মান পরিত্যাগপূর্বক ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও ভীষ্মের আজ্ঞানুবর্তী ও অধীন হইয়া কালাতিপাত করিবেন ও উঁহাদের বাক্যানুসারে তোমাকে সমুদয় রাজ্য প্রদানপূর্বক আপনারা অনীশ্বর হইয়া থাকিবেন। সমুদয় রাজ্য তোমারই হইবে, পিতামহ ভীষ্ম, বিদুর ও তোমার বাক্যানুসারে তোমাকে কেবল তাঁহাদের পঞ্চভ্রাতাকে পঞ্চগ্রাম প্রদান করিতে হইবে; পাণ্ডবগণ তোমার পিতার অবশ্য পোষ্য'।

হে ধর্মরাজ। দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমার এইবাক্যেও সম্মত হইল না; সুতরাং কৌরবগণের প্রতি চতুর্থ উপায় দণ্ডপ্রয়োগ ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতেছি না।

কৃষ্ণের নিজের মনে যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যার জন্য তাঁর হস্তিনায় সবার বাক্য অগ্রাহ্য করেও যাওয়া। সেই আশাও কৃষ্ণের আংশিক পূর্ণ হয়েছে। কৌরবসভায় ধর্মের ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি নিজেকে তত্ত্বজ্ঞানী ভাবমূর্তিতে সমবেত নরপতিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে সমবেত রাজন্যবর্গের শ্রদ্ধা অর্জন করে তাঁদের মানসিক দৌর্বল্যকে সামরিক পোষাকের আড়াল থেকে টেনে বের করা কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনের এক বহুমূল্য বিজয়।

সাত

কৃষ্ণের পরবর্তী ভূমিকা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের সামরিক উপদেষ্টা রূপে। এই ভূমিকায় কৃষ্ণ সত্যিই আন্তরিকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ কৃষ্ণ জানতেন যে কৌরবপক্ষে উপেক্ষিত হবার পর পাণ্ডবদের বিজয়ী না করা ছাড়া আর কোন গতি নেই। কৃষ্ণের নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে গেলে পাণ্ডবদের জয়ী করতেই হবে কারণ কৌরবরা তাঁকে শত্রু হিসাবেই ধরছেন। পাণ্ডবরা রণনিপুণ হলেও বড় যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণ বার বার জরাসন্ধের মত মহাবীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বড় যুদ্ধের সূক্ষ্ম ও মূল্যবান কৌশলগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কৃষ্ণ ইচ্ছা করলে নিজে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তাহলে সমগ্র রণক্ষেত্রের ওপর নজর রেখে প্রত্যেক পাণ্ডবপক্ষীয় বীরকে মুহূর্তোপযোগী মূল্যবান উপদেশ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। মহাবীর অর্জুনের নিরাপদ রথে আরোহণ করে অর্জুনের সারথিরূপে কৃষ্ণ সমস্ত রণক্ষেত্র পরিক্রমা করেছেন আর কখন কোথায় কোন্ পাণ্ডবপক্ষীয় বীর অজ্ঞাতে বিপদে পড়তে যাচ্ছেন তা দেখিয়ে দিয়ে পাণ্ডবপক্ষের অনেক অমূল্য বীরের জীবন বাঁচিয়েছেন। কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয় দ্বৈরথ যুদ্ধে অপরাজেয়। অর্জুন একাই বহু মহারথীকে পরাজিত করতে সক্ষম সেইজন্য অর্জুনের রথই সবচেয়ে নিরাপদ। তাছাড়া অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের বন্ধুত্বও গভীর ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন রক্ষার তাগিদ ও অর্জুনের প্রতি সখ্যতাই কৃষ্ণকে অর্জুনের সারথ্য গ্রহণে প্রেরণা দিয়েছিল। কেবল মাত্র দুর্যোধনের কাছে পূর্বে কথা দিয়েছিলেন বলেই কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। এই

আত্মসচেতনতাই কৃষ্ণের জীবন-রাজনীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের সমস্ত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপের মধ্যে এই আত্মসচেতনতা লক্ষ্য করা যায়।

যুদ্ধের শুরু থেকেই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সমরোপদেশ প্রদানকারী। সেনাপতি নির্বাচন নিয়ে যখন পাণ্ডবশিবির দ্বিধাবিভক্ত তখন কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় অর্জুনের ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি করার প্রস্তাব সবাই গ্রহণ করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরামর্শেই সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যের জন্য সাতজন সেনাপতি নির্বাচন করলেন। সাত সেনাপতি মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু ও শিখণ্ডীর সঙ্গে মহাবীর জরাসন্ধের পুত্র সহদেবও ছিলেন। যে সহদেবকে কৃষ্ণ তাঁর পিতা জরাসন্ধের হত্যার পর মগধের সিংহাসনে বসিয়ে পুতুলরাজা বানিয়ে রেখেছিলেন। এইভাবে কখনও নিজের অনুগত ব্যক্তির দ্বারা কখনও নিজের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা রণক্ষেত্রের পরিচালনা কৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। পাণ্ডবপক্ষে বিভিন্ন সেনাপতি এবং অর্জুন, ভীম ও অন্যান্য মহাবীরেরা থাকলেও পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধনিয়ন্ত্রণকর্তা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণই ছিলেন। তিনি ছিলেন সেনাপতিদের সেনাপতি। সেনাপতিরা তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হয়েছেন, তাঁরই যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে শত্রু সংহার করেছেন।

আবার যখন যুদ্ধের শুরুতে দুইপক্ষ মৃত্যু আহ্বান করার জন্য পরস্পরের মুখোমুখি তখন হঠাৎ বিষাদগ্রস্থ এবং যুদ্ধবর্জনে দৃঢ় সংকল্প অর্জুনের মনে কৃষ্ণ অনুঘটকের মত ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন বীরের কর্ম ব্যাখ্যা করে। দার্শনিকের প্রজ্ঞা দিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনের স্তিমিত, ভগ্নপ্রায় মনকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে নিরাসক্ত কর্মই প্রকৃত কর্মযোগীর কাম্য। একাধারে কৃষ্ণ রণক্ষেত্রের পরিচালক ও অন্যদিকে পাণ্ডব-মনোবল বৃদ্ধিকারী অনুঘটকের ভূমিকায় যথাযোগ্যভাবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্বমূহূর্তে যখন কৌরব ও পাণ্ডবসেনারা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন

একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং উভয়পক্ষের প্রধান পুরুষেরা সিংহনাদ করে শঙ্খধ্বনি করছেন তখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডব ভ্রাতারাও শঙ্খধ্বনি করলেন প্রত্যেকে নিজস্ব শঙ্খ বাজিয়ে। কৃষ্ণ পঞ্চজন নামে দৈত্যের অস্থিতে নির্মিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন, অর্জুন দেবদত্ত নামে তাঁর নিজস্ব শঙ্খ বাজালেন। ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে শঙ্খ এবং নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মনিপুষ্পক নামে শঙ্খ বাজালেন। উভয়পক্ষের মহারথীদের এই তুমুল শঙ্খনির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিত হতে লাগল। অর্জুন প্রতিপক্ষের মহারথী ও সৈন্যদের একবার যুদ্ধের আগে ভালকরে দেখে নেবার জন্য সারথি কৃষ্ণকে উভয়পক্ষের সেনাদলের মধ্যে তাঁর রথ স্থাপন করতে বললেন। অর্জুনের বাক্য অনুসারে কৃষ্ণ অর্জুনের রথ চালনা করে যে স্থান থেকে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের মহারথী ও সেনাদের ভালভাবে দেখা যায় সেইস্থানে স্থাপন করলেন।

পরম শত্রু দুর্যোধনের হয়ে কারা যুদ্ধ করতে এসেছেন দেখার জন্য কৌরবপক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই অর্জুন দেখলেন সর্বপ্রথমে পিতামহ ভীষ্মকে, তারপর অস্ত্রগুরু আচার্য্য দ্রোণকে, মাতুল শল্যকে, বন্ধু অশ্বত্থামা, ভ্রাতা দুর্যোধনাদি, পিতৃব্য ভূরিশ্রবা কেউই অর্জুনের দৃষ্টির বাইরে রইলেন না। এই বিপুল সংখ্যক আত্মীয় ও বন্ধুকে যুদ্ধের জন্য সমাগত দেখে অর্জুনের মনে এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়ে চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হল। তিনি স্মরণ করতে লাগলেন, যে পিতামহের ক্রোড়ে চড়ে শিশুকালে তিনি কত খেলা করেছেন, যে পিতামহ পিতৃহীন পাণ্ডব ভাইদের স্নেহ দিয়ে সবসময় আগলে রাখতেন, সেই পরমপ্রিয় পিতামহ ভীষ্মকে কি করে তিনি অস্ত্রাঘাত করবেন। যে আচার্য্য দ্রোণ পুত্রবৎ স্নেহে পরম যত্নে তাঁকে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর করে তুলেছেন সেই মহান্ অস্ত্রগুরু পিতৃতুল্য আচার্য্যকেও রাজ্যের লোভে অস্ত্রাঘাত করতে হবে। যে বন্ধুদের সঙ্গে শৈশবে একত্রে তিনি খেলা করেছেন সেই বন্ধুদের রাজ্যলোভে

অস্ত্রাঘাত করতে হবে। রাজ্যলোভে চারিদিকে দণ্ডায়মান আত্মীয়, বন্ধু ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে পরস্পরের হত্যার জন্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অর্জুনের মানসিক ভারসাম্য অন্তর্হিত হল। তিনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ভুলে গিয়ে নেহাৎই সাধারণ মানুষের মত মানবিক আবেগের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধের এবং রাজ্যজয়ের অসারতা উপলব্ধি করে কৃষ্ণকে তাঁর যুদ্ধে অনিচ্ছার কথা জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন যে তিনি যুদ্ধ জয়, রাজ্য এবং সুখভোগ কিছুই কামনা করেন না—ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে/ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥

আবেগজাত দুঃখে অভিভূত হয়ে অর্জুন কৃষ্ণকে বিলাপের মত বলতে লাগলেন যে, যদিও যুদ্ধার্থ সমবেত যোদ্ধারা রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ নিমিত্ত পাপ বুঝতে পারছেন না, কিন্তু এই বংশনাশজনিত দোষ উপলব্ধি করেও কেন তাঁরা এই পাপ হতে নিবৃত্ত হবেন না? এইভাবে বিলাপ করতে করতে নিজের হৃদয়ের দুর্বলতা প্রকাশ করে অর্জুন স্বজনহত্যায় একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন এবং রথের ওপরে বসে পড়লেন।

অর্জুনের চিত্ত বিকল হয়েছিল এইজন্য যে অর্জুন কৃষ্ণের মত মানব চরিত্রের গভীরতা উপলব্ধি করেননি। কৃষ্ণের মত তাঁর মানবচরিত্র সম্বন্ধে গভীর কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। মানুষের মনের বহুমুখী আকাঙ্ক্ষাসমূহ সম্বন্ধে অর্জুনের কোনো ধারণা না থাকায় অবাক বিস্ময়ে অর্জুন দেখলেন যে রাজ্যলোভে যুদ্ধক্ষেত্রে সবাই উপস্থিত হয়েছেন, কেউই বাদ নেই। এই বিরাট স্বার্থ ও লোভের সমুদ্রে অন্য সবার মত নিজেকে নিমজ্জিত করতে অর্জুনের বীর বীবেক বাধা দিয়েছিল। অর্জুন ছিলেন প্রধানতঃ যোদ্ধা এবং সেইজন্য স্বাভাবিক ভাবেই উদার। তাঁর বীর হৃদয়ের উদারতা তাই অন্য সবার মত স্বার্থের নীচতায় নিজেকে জড়াতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। শৈশব থেকেই বিভিন্ন প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে তিনি লালিত

হয়েছেন। কঠিন সংগ্রামে মহাশত্রুদের নিপাতিত করে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন রাজনীতিতে। যেক্ষণে অর্জুন কেবল অস্ত্রাভ্যাসে রত, সেইসময়ে কৃষ্ণ কংস ও জরাসন্ধের মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত সামরিক ও রাজনৈতিক দুই প্রান্ত থেকেই। কাজেই কৃষ্ণের মত স্বচ্ছদৃষ্টি অর্জুন পাবেন কোথেকে।

কৃষ্ণ কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেও অর্জুনের যুদ্ধে অনিচ্ছার সঠিক কারণটি বুঝতে পেরেছিলেন। অর্জুনের মনের গভীরে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, যে বিপরীতমুখী ভাবধারা তাঁর মনের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল কৃষ্ণ সঠিকভাবে সেটি অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় বাক্যের দ্বারা তা দূর করেছেন এবং অর্জুনের মনের মধ্যে আবার বীর-ভাব জাগিয়ে তুলেছেন। অর্জুনের কথা শোনার পর কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে, যাদের জন্য তাঁর শোক করা উচিত নয় তাদের জন্যই অর্জুন শোক করছেন আবার প্রাজ্ঞের মত কথাও বলছেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা মৃত বা জীবিত কারো জন্যই শোক করেন না। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম ও ধারণা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মার অবিনশ্বরতা বোঝালেন। কৃষ্ণ নিজে মৃত্যুর পর পরলোক ও আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন, সেই ধারণা অনুযায়ী অর্জুনকে তিনি বললেন যে আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। পূর্বে না থেকে পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম ও পূর্বে থেকে পরে না থাকার নাম মৃত্যু। আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনটিই নেই। আত্মা জন্ম ও মৃত্যু রহিত, অপক্ষয়হীন ও বৃদ্ধিশূন্য। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না। সুতরাং এই অবিনাশী আত্মাকে কিভাবে হত্যা করা সম্ভব? বস্ত্র জীর্ণ হলে তা পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেরকম জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু হলে দেহই কেবল বিনষ্ট হয় আত্মা অপরিবর্তিত থেকে যায়। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ / ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥—কোন শস্ত্র এই

আত্মাকে ছেদন করতে পারে না। অগ্নি এই আত্মাকে দহন করতে পারেন না। জলের দ্বারা এই আত্মা আর্দ্র হন না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না। কাজেই যে আত্মার এই রকম বিনাশ নেই সেই আত্মার জন্য অর্জুনের শোক করা উচিত নয়।

কৃষ্ণ জানতেন অর্জুনের মনের দুর্বলতা কোথায়। যদি কৃষ্ণ অর্জুনের প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের নাম ধরে যুক্তি ও উপদেশ দিয়ে অর্জুনকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন তাহলে সেইসব যোদ্ধাদের প্রত্যেকের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগত সম্পর্ক অর্জুনের মনে পড়ত এবং তিনি আবেগ-বিহ্বল হয়ে কৃষ্ণের উপদেশের সারমর্ম বুঝতে পারতেন না। কারণ তাঁর প্রতিপক্ষ যোদ্ধারা প্রায় সবাই তাঁর আত্মীয় ও বন্ধু কাজেই তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কিছু না কিছু আবেগজাত সম্পর্কে অর্জুন আবদ্ধ ছিলেন। ভীষ্মের নাম করে উপদেশ দিলে অর্জুনের মনে পড়ত পিতামহের স্নেহের কথা, দ্রোণাচার্য্যের উল্লেখ করলে গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা অর্জুনের মনে পড়ত, এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের মোহজালে অর্জুন আরো বেশী আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। কৃষ্ণ মানুষের মনের এই স্বাভাবিক দিকটি ভাল করে জানতেন বলেই ব্যক্তিগত ভাবে কারো নাম ধরে উপদেশ বা যুক্তি না দিয়ে তিনি সমগ্র মানব জগৎকেই তুলে ধরলেন অর্জুনের চোখের সামনে, যাতে এই বিরাট জগতের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে বিশালতার প্রভাবে অর্জুনের ব্যক্তিগত সম্পর্কজনিত ক্ষুদ্রতা দূর হয়ে যায়।

আত্মার অবিনশ্বরতা বুঝিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে, আর যদি অর্জুন মনে করেন যে আত্মা প্রত্যেক শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে সৃষ্ট হন এবং প্রত্যেক শরীরের বিনাশের সঙ্গে আত্মার মৃত্যু হয় তবুও অর্জুনের এর জন্যে কোনো শোক করা উচিত নয়। কারণ জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং স্বীয় কর্মানুসারে মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ অর্জুন আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তাঁর কিছুতেই শোক করা উচিত নয়। এইভাবে কৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝালেন যে

মানুষকে হত্যা করলেও প্রকৃতপক্ষে তার মৃত্যু হয় না কারণ আত্মা জন্মমৃত্যুর উর্দ্ধে। অর্জুনের শোক দূর করার প্রচেষ্টায় কৃষ্ণ এবার অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিভিন্ন উত্তেজক বাক্য বলতে লাগলেন। স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্যন বিকম্পিতুমর্হসি ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥—স্বধর্মের কথা স্মরণ করেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছুই নেই। অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি / ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥—যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে নিজের ক্ষত্রিয়ধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগ হেতু তুমি পাপভাগী হবে। কৃষ্ণ জানতেন অর্জুন ছিলেন বীর তাঁর ক্ষত্রিয়ের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, সেইজন্য যুদ্ধ না করলে তিনি ধর্মচ্যুত হবেন এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলেন। কৃষ্ণ আরো বললেন, অর্জুন যুদ্ধ না করলে সকলে চিরকাল অর্জুনের অখ্যাতি ঘোষণা করবে। অর্জুনের মত সম্মানিত ও যশস্কর ব্যক্তির পক্ষে অখ্যাতি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখদায়ক। মহারথগণ মনে করবেন যে অর্জুন ভয় পেয়েই যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হয়েছেন এবং যাঁরা তাঁকে সম্মান করতেন তাঁদের কাছে তিনি হেয় হবেন। কৃষ্ণ জানতেন একমাত্র মহাবীর কর্ণ অস্ত্র প্রতিযোগীতায় অর্জুনের সঙ্গে স্পর্ধা করতে সক্ষম এবং কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরের চিরবৈরী। কর্ণের কথা শুনলে কর্ণের প্রতি ঘৃণায় অর্জুনের মনে ক্রোধভাব জেগে উঠবে এবং অর্জুন ক্লীবত্ব পরিহার করে আবার যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ করবেন। সেই জন্যই কৃষ্ণ কারো নামোল্লেখ না করে ঘুরিয়ে মহারথদের উল্লেখ করে অর্জুনকে বোঝালেন যে তিনি প্রধানতঃ সেইসব মহারথদের কথাই বলছেন, যাঁদের কাছে অর্জুন তাঁর অস্ত্রনৈপুণ্যের জন্য ভয়ের বিষয় ছিলেন ও সম্মান লাভ করতেন কিন্তু অস্ত্র পরিত্যাগ করলে উপহাসের বিষয়ে পরিণত হবেন। তাঁরা তখন অর্জুনকে অনেক অকথ্য বাক্য প্রয়োগ করবেন, অর্জুনের মত মহাবীরের পক্ষে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই হতে পারে না। যুদ্ধে

জয়ী হলে অর্জুন রাজ্য ভোগ করবেন আর নিহত হলে স্বর্গলাভ, অত-এব কোন দিকেই অর্জুনের ক্ষতি নেই, তাই দৃঢ়সংকল্প হয়ে যুদ্ধ করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অনুসারে ধর্মযুদ্ধই অর্জুনের অভিপ্রেত। কাজেই সুখ, দুঃখ, লাভ ও ক্ষতি এবং জয় ও পরাজয় তুল্য জ্ঞান করে ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াই অর্জুনের উচিত। এই-ভাবে ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলে গুরুজন বধজনিত কোন পাপ অর্জুনকে স্পর্শ করবে না। অর্জুনের গুরুজনদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তা বজায় থাকলে সেই দুর্বলতাহেতু পূর্ণবিক্রমে যুদ্ধ করা অর্জুনের পক্ষে সম্ভব হবে না ভেবেই কৃষ্ণ এই কথা বললেন।

অর্জুনকে যুদ্ধের জন্যই শুধু যুদ্ধ, জয়লাভ করে রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ না করার উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ বললেন যে যুদ্ধকর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের মত অর্জুনের যুদ্ধ করা উচিত। রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছেন সুতরাং একজন ক্ষত্রিয় হিসাবে অর্জুনের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করে নিজের ক্ষাত্র ধর্ম পালন করা উচিত। যুদ্ধে তিনি কি লাভ করবেন অথবা কি হারাবেন তা চিন্তা করার দরকার নেই। কর্ম করাই তাঁর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ফল লাভ নয়। ফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মই অর্জুনের মত মহাবীরের অভিপ্রেত। কাজেই কামনাশূন্য হয়ে সমত্ব বুদ্ধি আশ্রয় করা অর্জুনের একান্ত উচিত। যারা ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কর্ম করে তারা অত্যন্ত হীন কারণ তাদের মনে ফললাভের আশা সবসময় জাগরুক থাকায় তারা স্বার্থপর হয়। অর্জুন ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে কর্মে সমত্ব বুদ্ধি অবলম্বন করে কর্ম করলে কোন নীচতা অর্জুনকে স্পর্শ করতে পারবে না। অর্জুন যুদ্ধ না করলেও লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কালের প্রভাবে এঁরা কেউ জীবিত থাকবেন না। অতএব যুদ্ধার্থ উত্থিত হয়ে শত্রুদের পরাজিত করে যশো-লাভ করে অর্জুন নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। কালের প্রভাবে এঁরা পূর্বেই নিহত হয়েছেন, অর্জুন নিমিত্ত মাত্র হোন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,

জয়দ্রথ ও অন্যান্য বীরেরা কালের প্রভাবে পূর্বেই নিহত হয়েছেন, সেই মৃতদেরই অর্জুন বধ করুন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, অর্জুন যুদ্ধে শত্রুদের নিশ্চয়ই জয় করবেন। কৃষ্ণ জানতেন অর্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরদের নিয়ে বিশেষ শংকিত তাই অর্জুনের মন থেকে এঁদের সম্বন্ধে শংকা দূর করার জন্য কৃষ্ণ বললেন এঁরা কালের প্রভাবে যুদ্ধের আগেই নিহত হয়ে রয়েছেন।

এইভাবে কৃষ্ণের উপদেশ ও উৎসাহপ্রদানকারী বাক্য অর্জুনের মনের গভীরে গিয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু করল এবং ধীরে ধীরে অর্জুনের মন থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার পর্দা সরে গিয়ে দুর্বলতা অন্তর্হিত হল। যে সাময়িক দুর্বলতায় অর্জুন আক্রান্ত হয়েছিলেন তা কাটিয়ে উঠে অর্জুন আবার আগের মত ক্ষত্রিয়ের তেজ ফিরে পেলেন এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালনের প্রস্তুতি নিলেন। কৃষ্ণ ছাড়া আর কে পারতেন ভগ্ন অর্জুনকে এই ভাবে কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে, অর্জুনের মনের আর্দ্রতা দূর করে তাঁকে অগ্নির মত উত্তপ্ত করতে?

যুদ্ধের শুরুতে যুধিষ্ঠির যখন পিতামহ ভীষ্মের কাছে আনুষ্ঠানিক আশীর্বাদ চাইতে গেলেন তখন কৃষ্ণ গেলেন কর্ণের কাছে। কৃষ্ণ শুনেছিলেন ভীষ্ম ও কর্ণে মতভেদ আছে। ভীষ্ম জীবিত থাকতে কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে অবতীর্ণ হবেন না। আগে একবার কর্ণকে স্বপক্ষে আনার চেষ্টায় কৃষ্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও কৃষ্ণ শেষচেষ্টা করার জন্য আবার গেলেন কর্ণের কাছে। কর্ণকে গিয়ে অনুরোধ করলেন যতদিন না যুদ্ধে ভীষ্মের মৃত্যু হয় ততদিন কর্ণ পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধ করুন। কর্ণ সম্মত হলেন না, কৃষ্ণ আবার প্রত্যাখ্যাত হলেন। কৃষ্ণ জানতেন কর্ণের কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে গেলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষ্ণ শেষসময় অবধি ভীষ্ম-কর্ণ বিবাদের সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছেন, একজন রাজনীতিকের পক্ষে যা তাঁর পেশাগত নিষ্ঠার পরিচায়ক।

যুদ্ধের বিভিন্ন নিয়ম ছিল। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক যোদ্ধা,

সহযোদ্ধা, সারথী ও অন্যান্যরা তা মানতে বাধ্য ছিলেন। এটাই ছিল তৎকালীন যুদ্ধের রীতি। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃষ্ণের কাছে নিয়মের বন্ধনের চেয়ে উদ্দেশ্য সাধন অনেক বড় ছিল। তাই যখনি কৃষ্ণ প্রয়োজন অনুভব করেছেন তখনি নিয়ম ভেঙ্গে নিয়মবিরুদ্ধভাবে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণের কাছে যুদ্ধ ছিল চরম বাস্তব, জীবন-মরণ সমস্যা। যেখানে প্রাণের প্রশ্ন জড়িত সেখানে আবার নিয়ম কি? প্রাণ বাঁচানোর আবার কোনো নিয়ম থাকতে পারে নাকি? অথচ এই কৃষ্ণই আবার অন্যের কাছে যুদ্ধের ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তৎকালীন ধর্মভিত্তিক সমাজের ধর্মীয় অনুশাসনে লালিত যোদ্ধারা কেউই ধর্মযুদ্ধের বাইরে গিয়ে অধর্ম যুদ্ধ করতে মানসিক বল পাননি। কিন্তু কৃষ্ণ একের পর এক বাস্তবোচিত উপায়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেছেন আর প্রয়োজনানুযায়ী সেইসব কার্যের ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে অল্পবুদ্ধি রাজন্যবর্গকে হতবাক করে নিজের মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর কাছে যা বাস্তব তাই ধর্ম যে পথে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তাই ধর্ম, পথরোধকারী বাকী সবই অধর্ম।

কৃষ্ণ জানতেন সারথির যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র গ্রহণ নিষেধ। বিশেষতঃ তিনি নিজে রণে অস্ত্র গ্রহণ করবেন না বলে দুর্যোধনকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে কৃষ্ণ দেখলেন ভীষ্ম প্রবল প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে শুরু করেছেন এবং পাণ্ডব ভরসা স্বয়ং অর্জুনও ভীষ্মের শরজালে বিপর্যস্ত তৎক্ষণাৎ তিনি পাণ্ডবদের বিপদ অনুমান করে অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য নিজে অস্ত্রধারণ করে ভীষ্মের দিকে ধাবমান হলেন। ভীষ্ম কৃষ্ণের এরকম নিয়মবিরুদ্ধ কার্য দেখে অবাক হয়ে তাঁকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। কিন্তু পিছন থেকে অর্জুন এসে কৃষ্ণকে ধরে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। অর্জুন এসে কৃষ্ণকে বাধা না দিলে কৃষ্ণ ভীষ্মের সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন।

আসলে কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন মহাবীর ভীষ্ম জীবিত থাকলে

পাণ্ডবদের জয়লাভের আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু ভীষ্মকে বধ করার মত কোন বীর পাণ্ডবদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ভীষ্মের ভীষণ যুদ্ধ দর্শন করে কৃষ্ণের ধারণা হয়েছিল যে মহাবীর অর্জুনও ভীষ্মকে পরাজিত করে বধ করতে পারবেন না। যুধিষ্ঠিরতো একেবারে হতাশ হয়ে কৃষ্ণের কাছে মন্ত্রণা চাইলেন। কৃষ্ণ প্রথমে ভীষ্মের অনেক নিন্দা ও অর্জুনের প্রশংসা করে পাণ্ডবপক্ষের জলে ভেজা মনোবলকে চাঙ্গা করে তুললেন, তারপর পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে ভীষ্মকে কিভাবে বধ করা যায় তার উপায় নির্ধারণে আলোচনায় বসলেন।

ভীষ্মের মৃত্যুর উপায় ভীষ্মের কাছ থেকেই জেনে নিয়ে রণক্ষেত্রে ঠিক কোন সময়ে কৌশলটি প্রয়োগ করতে হবে সঠিকভাবে কৃষ্ণ সেই মূল্যবান উপদেশটি অর্জুনকে যথাসময়ে দিয়েছেন। যখন রণক্ষেত্রে ভীষ্ম প্রবল প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষ করছিলেন সেইসময় রণকৌশলী কৃষ্ণ উভয়পক্ষের সৈন্যসজ্জা দেখে বুঝলেন ভীষ্মকে বধ করার এই প্রকৃত সময়। যে মুহূর্তে কৃষ্ণের এই উপলব্ধি হল তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ অর্জুনকে ডেকে নির্দেশ দিলেন ভীষ্মকে সৈন্যবাহিনীদ্বারা অবরোধ করতে। কৃষ্ণের নিজের কথায়—ধনঞ্জয়! শান্তনুতনয় ভীষ্ম উভয়সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন। উঁহাকে বলপূর্বক নিহত করিলেই তোমার জয়লাভ হইবে। অতএব ঐ যে স্থানে সেনাগণ ছিন্নভিন্ন হইতেছে সেই স্থানেই উঁহাকে সংস্তম্ভিত কর! তোমাভিন্ন কেহই ভীষ্ম-শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন নপুংসক শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সামনে দাঁড়করিয়ে শিখণ্ডীর আড়াল থেকে ভীষ্মকে অস্ত্রাঘাত করতে লাগলেন। শিখণ্ডীও ভীষ্ম তাঁকে আঘাত করবেন না জেনে ভীষ্মকে যথেচ্ছ শরাঘাত করতে লাগলেন। পাণ্ডবপক্ষের মহারথীগণ তখন চতুর্দিক থেকে ভীষ্মকে অবরোধ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

শুধু ভীষ্মই নন কৌরবপক্ষের যে বীর যখনই সংগ্রামে প্রবল হয়ে

উঠেছেন তখনই তাঁকে হত্যার জন্য কৃষ্ণ সম্ভব অসম্ভব সমস্ত প্রকার কৌশল অবলম্বন করেছেন। রণক্ষেত্রে কার গুরুত্ব কতটা সেদিক বরাবরই কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

জয়দ্রথ বধের জন্য অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় কৃষ্ণই সব। কৃষ্ণ না থাকলে অর্জুন প্রতিজ্ঞা পালন করতে না পেরে আত্মঘাতী হতেন সন্দেহ নেই। ছ'জন কৌরবপক্ষীয় মহারথীর দ্বারা রক্ষিত হয়ে জয়দ্রথ হয়ে উঠেছিলেন দুর্ভেদ্য। কৃষ্ণের অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে এই ছ'জন কৌরবপক্ষীয় মহারথীকে পরাজিত করে জয়দ্রথকে স্পর্শ করা অর্জুনের অসাধ্য। কৃষ্ণ তাই সুযোগের অপেক্ষায় তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে রাখলেন। তিনি জানতেন একসময় না একসময় কৌরব মহারথীদের জয়দ্রথ-রক্ষায় শৈথিল্য আসবেই এবং তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়বেই। সে শৈথিল্য যতই ক্ষুদ্র অথবা তুচ্ছ হোক-না কেন, এবং তখনি হবে জয়দ্রথকে বধ করার উপযুক্ত মুহূর্ত। আবার অন্যদিকে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবেন না ভেবে যাতে হতাশায় রণে ক্ষান্ত দিয়ে আত্মঘাতী না হন সেইজন্য কৃষ্ণ ক্রমাগত অর্জুনকে উত্তেজিত করে যেতে লাগলেন জয়দ্রথের বিরুদ্ধে যাতে জয়দ্রথের প্রতি অর্জুনের ক্রোধাগ্নি কখনও নির্বাপিত না হয়। অর্জুন প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হয়ে আত্মঘাতী হলে পাণ্ডবপক্ষের সর্বনাশ, তার চেয়েও বড় সর্বনাশ কৃষ্ণের। কৃষ্ণের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে এবং পাণ্ডবরা পরাজিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হবেন। কৃষ্ণের প্ররোচনায় অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করার জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, কৌরবরা যখন প্রাণপণে জয়দ্রথকে রক্ষার চেষ্টা করছেন সমবেতভাবে এবং অর্জুনের নেতৃত্বে পাণ্ডবরা যখন জয়দ্রথের প্রাণ হরণের জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছেন তখন বহুক্ষণ যুদ্ধ হওয়ার পর অপরাহ্নে সূর্য অস্তমিত হলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তৎকালে সূর্যাস্তের পর আর যুদ্ধ হত না।

সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখে কৌরবপক্ষের মহারথীরা সহ সমস্ত সৈন্যবাহিনী উল্লাসে জয়ধ্বনি করে অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন এবং জয়দ্রথ নিজে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে দেখে তাঁর রক্ষার জন্য রচিত ব্যূহের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। জয়দ্রথের রক্ষার জন্য আর অস্ত্রধারণ নিষ্প্রয়োজন মনে করে মহারথীরা অস্ত্র পরিত্যাগ করে উল্লাস করতে লাগলেন। কারণ অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সেইদিনই সূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথকে বধ করতে না পারলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন। আর অর্জুন নিজে প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে না পারার হতাশায় ও ব্যর্থতায় অস্ত্র পরিত্যাগ করে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রায় প্রস্তুত। তাঁর বীর জীবনের এ এক চরম ব্যর্থতার মূহুর্ত। একদিকে যখন কৌরবদের উল্লাস ও অপরদিকে অর্জুনসহ পাণ্ডবদের হতাশা, তখন কৃষ্ণ বিভ্রান্ত। কৃষ্ণের যেন বিশ্বাসই হতে চায় না যে অর্জুনকে সত্যিই আত্মঘাতী হতে হবে। কৃষ্ণ অবাক ও বিস্ময়াবিষ্ট, অর্জুনের জীবন কি তাহলে রক্ষা করা গেল না? কিন্তু কৃষ্ণের বিভ্রান্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হলনা, কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণের বিভ্রান্তি ও যুদ্ধক্ষেত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন মলিনতা দূর করে আবার সূর্যদেব দেখা দিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র আবার দিবালোকে পূর্ণ হল। প্রকৃতির এই আচমকা খেয়ালী পরিবর্তনে যুদ্ধক্ষেত্রে আবার দিবালোক দেখে কৌরবকুল হতবাক্ এমনকি স্বয়ং অর্জুনও। কি করে এ হতে পারে, কি করে অস্ত যাওয়া সূর্য পুনরায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে? কৃষ্ণের বিভ্রান্তি কিন্তু সূর্যের পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত, এক মূহুর্তও কৃষ্ণের বিলম্ব হয়নি প্রকৃতির এই বিচিত্র খেয়ালের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে। কৃষ্ণ, সূর্যকে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করতে দেখেই বুঝলেন যে অর্জুনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, অর্জুনকে আত্মঘাতী হতে হবে না, সূর্য প্রকৃতই অস্ত যায়নি, প্রকৃতির এক সাধারণ নিয়মেই সূর্যকে রাহুতে গ্রাস করেছে মাত্র, অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ হয়েছে। সেই সময়ে সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকলেও এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি তাঁরা পর্যবেক্ষণ

করেছিলেন এবং জানতেন যে সূর্যকে কখনও কখনও রাহুতে গ্রাস করে, যদিও সেই রাহুর গ্রাসে সূর্যের অবস্থিতি দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়না। অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চন্দ্র এসে পড়ায় পৃথিবীর ঐ স্থান থেকে সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য আর-দেখা যায় না। এই ঘটনাটিকেই তৎকালীন প্রচলিত ধর্মমত অনুযায়ী সূর্যের রাহুর গ্রাসে পতিত হওয়া বলে ধরে নেওয়া হতো, যদিও তাঁরা জানতেন না যে এই ঘটনাটিই সূর্যগ্রহণ।

সূর্য আবার দেখা দিতেই কৃষ্ণ বুঝলেন যে সূর্যকে রাহুতে গ্রাস করেছিল বলেই যুদ্ধক্ষেত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল এবং প্রকৃত পক্ষে কৌরবরা এই প্রাকৃতিক ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে সূর্য অস্ত গেছে বলে ধরে নিয়ে জয়দ্রথের রক্ষণব্যূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সুতরাং এই তো সুযোগ অর্জুনের প্রতিজ্ঞা পালনের। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বিন্দুমাত্র সময়ের অপচয় না করে অর্জুনকে উত্তেজিত করে নির্দেশ দিলেন অরক্ষিত জয়দ্রথকে বধ করার জন্য। কিন্তু কৌরবদের মত অর্জুনও প্রকৃতির এই খামখেয়ালীপণার কারণ অনুসন্ধানে মগ্ন, তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মনের হতচকিত এবং দ্বিধাগ্রস্ত ভাব অনুমান করে কৃষ্ণ তা দূর করে অর্জুনের আত্মতুষ্টির জন্য বললেন যে জয়দ্রথকে বধ করার জন্যে তিনিই যোগমায়া প্রভাবে নকল সূর্যাস্তের সৃষ্টি করে কৌরবপক্ষকে বিভ্রান্ত করেছেন। এখন কৌরবদের এই বিভ্রান্তির সুযোগে অর্জুন জয়দ্রথকে হত্যা করে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করুন। কৃষ্ণের কথায় অনুপ্রেরণা পেয়ে হতচকিত এবং বিভ্রান্ত কৌরবদের মধ্যে সদর্পে প্রবেশ করে অর্জুন অরক্ষিত এবং অস্ত্র পরিত্যাগী জয়দ্রথকে সূর্য পুনরায় দেখা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করলেন। কৌরবপক্ষ বিভ্রান্তি কাটিয়ে পুনরায় যুদ্ধপ্রস্তুতি নেওয়ার কোনো সুযোগই পেলেন না। কৃষ্ণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য অর্জুনের অমূল্য জীবন রক্ষা পেল। কৃষ্ণ যদি সবার আগে অতি দ্রুত সূর্যগ্রহণের ঘটনাটি বুঝতে না পারতেন তাহলে পরে কৌরবরা আবার

যুদ্ধপ্রস্তুতির সময় পেয়ে যেতেন, কারণ সূর্যের রাহুর গ্রাসে পতিত হওয়ার ঘটনা কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌরবরাও বুঝতে পারতেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই জয়দ্রথের জীবন রক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কৌরবদের আর সেই সুযোগ দিলেন না। যে সৌভাগ্যের সুযোগ প্রকৃতি পাণ্ডবদের করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ বিনা-দ্বিধায় ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে তার সদ্ব্যবহার করলেন।

যোগমায়া প্রভাবে নকল সূর্যাস্ত দেখানোর কথা সত্যি মনে করলে ধরে নিতে হয় যে কৃষ্ণ গণসম্মোহিনী বিদ্যা জানতেন এবং তারই প্রভাবে নকল সূর্যাস্তের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মত বিশৃঙ্খল স্থানে গণসম্মোহিনী বিদ্যা প্রয়োগে সমস্ত মহারথী ও কৌরব-পক্ষীয় সৈন্যদলকে সম্মোহিত করে ম্যাজিক দেখিয়ে নকল সূর্যাস্ত সৃষ্টি বাস্তবত অসম্ভব। আসলে সেইদিন সেইক্ষণে কুরুক্ষেত্রে প্রকৃতই একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটেছিল। যেটিকে পরে কৃষ্ণ যাদবদের প্রভাস যাত্রার প্রাক্কালে এইভাবে উল্লেখ করেছিলেন—হে বীরগণ! ভারত যুদ্ধকালে রাহু যেরূপ দিনে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে আমাদিগের ক্ষয়ের নিমিত্ত সেইরূপ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে। স্পষ্টতঃই সূর্যগ্রহণের উল্লেখ, কারণ সেইসময়ে রাহুর দিবাকরকে গ্রাসের দ্বারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সূর্যগ্রহণের ঘটনাটি বোঝানো হতো। যদিও তৎকালে আগেই গণনা করে গ্রহণ কবে কখন ঘটবে তার পূর্বাভাষ হয়ত দেওয়া সম্ভব হতো না। তবু সেই সময়ের জনসাধারণ এই প্রাকৃতিক ঘটনাটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

জয়দ্রথ বধের সময় দিবাকালে সূর্যের অস্ত গিয়ে পুনরায় অভ্যুদয়ের অনুরূপ ঘটনা প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসেও পাওয়া যায়। লিডিয়া জয় করার জন্য পারসীকরা (মিডিয়ান) যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ করছিল তখন যুদ্ধের ষষ্ঠ বছরে ৫৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে হঠাৎ একদিন যুদ্ধের মধ্যে দিবালোক অন্তর্হিত হয়ে রাত্রি নেমে আসার ঘটনাটি যোদ্ধাদের মনে এত গভীরভাবে রেখাপাত করে যে যোদ্ধারা অস্ত্র পরিত্যাগ করে এবং

এক সাময়িক যুদ্ধবিরতি স্থাপিত হয়। অবশ্য গ্রীক ইতিহাসের ঐ সূর্য-গ্রহণটিই মহাভারতের জয়দ্রথ বধের সূর্যগ্রহণ কিনা সেকথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। তবে মৌর্য আমলে খৃষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে মহাভারত সংকলিত হয়েছে বলে প্রচলিত মতটিকে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে ৫৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটা সম্ভব। একদেশে যখন বছরের পর বছরব্যাপী এক বিরাট যুদ্ধ চলছে তখন অন্যদেশে আঠারো দিনের একটি ছোট অথবা মাঝারী আকারের যুদ্ধের ঘটনা সংঘটিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। দু-চারশো বছর ধরে মহাভারতের লোকগাথা মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভের পর সংকলিত হতে পারে। সংকলনের হাজার হাজার বছর আগে অর্থাৎ বহুপূর্বে ঘটনা সংঘটিত হলে লোকগাথা হিসাবে প্রচার লাভ করার পর ধীরে ধীরে আবার তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়ে সংকলনের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া মহাভারত সংকলনের হাজার হাজার বছর আগে যুদ্ধ ঘটে থাকলে সেই ঘটনা ও তার নায়কদের চরিত্র লোকগাথা রূপে প্রচারিত হতে হতে অতিরঞ্জিত হয়ে দৈবরূপ ধারণ করত অথবা খলচরিত্র রূপে বর্ধিত হয়ে অসুররূপ প্রাপ্ত হোতো। কিন্তু মহাভারতের প্রধান চরিত্রসমূহের মধ্যে মোটামুটি মানবিক লক্ষণই বর্তমান, অতিরঞ্জন থাকা সত্বেও। কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রধান নায়কেরা কখনই তাঁদের ক্ষত্রিয় রূপ ছাড়িয়ে অসুর অথবা দেবতা হয়ে ওঠেননি। সংকলনের বহুপূর্বে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটে থাকলে জনপ্রিয়তার জোয়ারে অতিরঞ্জিত হয়ে মহাভারতের প্রধান চরিত্রসমূহ তাদের মানবিক বৈশিষ্ট্য হারাত। কাজেই সংকলনের খুব বেশী আগে নয়, দু-চারশো বছর আগে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটে থাকলে ৫৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবরা রাজ্যলাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকতে পারেন। অবশ্য জ্যোতির্বিদ্যার নির্ভুল গণনা ছাড়া কোন কিছুই সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়।

মহাভারতের চরিত্রসমূহের মধ্যে অবশ্য কৃষ্ণ একটি বড় ব্যতিক্রম।

একমাত্র কৃষ্ণের মধ্যেই কিছু কিছু অতিমানবিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেটা মহাভারতের যুদ্ধে কৃষ্ণের অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকার জন্যে হওয়া সম্ভব। অন্য ক্ষত্রিয় পুরুষদের তুলনায় কৃষ্ণের ভূমিকা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অনেক বেশী বাস্তবানুগ ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং অন্য চরিত্রের তুলনায় কৃষ্ণ অনেক বুদ্ধিদীপ্ত। সম্ভবতঃ সেইজন্যই যুদ্ধের পরে অন্য চরিত্রের তুলনায় তাঁর জনপ্রিয়তা অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদের অনেক পিছনে ফেলে রেখে জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতিযোগিতায় তাঁর চরিত্র বহুদূর এগিয়ে অতিরঞ্জনের ফলে লোক-গাথায় একটি অতিমানবিক স্থান অধিকার করে।

জয়দ্রথের বধের পরে কৌরবশিবিরে যখন চরম হতাশা ও ক্রোধ এবং পাণ্ডবদের মধ্যে চরম উল্লাস, তখন কৃষ্ণ কিন্তু সংযমে ও সতর্ক পর্যবেক্ষণে এক অনন্য চরিত্র। অন্যদের মত কৃষ্ণ তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাননি। বিজয়ের মুহূর্তেই অর্জুনের প্রতি ঘৃণা ও হতাশাজাত ক্রোধে কৌরবপক্ষ চরম আঘাত হানতে পারেন ভেবে তিনি অর্জুনের প্রাণ রক্ষায় সতর্ক প্রহরী। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনই ছিলেন কৃষ্ণের সবচেয়ে নির্ভরশীল মূলধন। সেইজন্য জয়দ্রথ বধের অব্যবহিত পরেই যাতে অর্জুন কোন বিপদে পড়ে প্রাণ না হারান, কৃষ্ণের সেইদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। অর্জুনের প্রাণ রক্ষায় কৃষ্ণ কতটা ব্যগ্র ছিলেন তা বোঝা যায় জয়দ্রথ বধের পর কর্ণের সঙ্গে অর্জুনকে কৃষ্ণ যুদ্ধ করতে না দেওয়ায়। জয়দ্রথের বধের পর ক্রোধে উত্তেজিত কর্ণ অর্জুনের দিকে ধাবমান হলে কৃষ্ণ সাত্যকি ও উত্তমৌজাকে পাঠিয়ে কর্ণকে বাধা প্রদান করলেন। কিন্তু অর্জুনকে যেতে দিলেন না কর্ণের কাছে প্রজ্জ্বলিত মহোল্কাসদৃশ বাসব প্রদত্ত শক্তি রয়েছে বলে। কৃষ্ণ জানতেন কর্ণ অর্জুনের চির বৈরী, সুযোগ পেলেই কর্ণ অর্জুনের জীবন নেবেন। ঐ মহাস্ত্র কর্ণ অর্জুনের মৃত্যুর জন্যই সংরক্ষিত রেখেছিলেন. সেইজন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে নিবারণ করে সাত্যকিকে পাঠালেন। যদি হত্যা করার হয় তাহলে কর্ণ সাত্যকিকেই হত্যা করুন, সাত্যকির মৃত্যুতে

অর্জুনের জীবন তো বাঁচবে। কৃষ্ণ এইভাবে বারবার চেষ্টা করেছেন কর্ণের মহাস্ত্র অস্ত্রের ওপর প্রয়োগ করিয়ে অর্জুনের জীবন বাঁচাতে এবং শেষ পর্যন্ত ঘটোৎকচের ওপর প্রয়োগ করিয়ে অর্জুনের জীবন বাঁচাতে সক্ষমও হয়েছেন।

রণক্ষেত্রে ধীর মস্তিকে যথাসম্ভব উত্তেজনা পরিহার করে কৃষ্ণ কতবার যে পাণ্ডবদের মূল্যবান সামরিক উপদেশ প্রদান করেছেন তার শেষ নেই। যখন রণক্ষেত্রে ক্রোধে উত্তেজিত পাণ্ডবরা প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে ভুল শত্রু অথবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শত্রুর প্রতি অযথা মনোনিবেশ করে শক্তিক্ষয় করছেন, তখন ধীর মস্তিকের অধিকারী কৃষ্ণ-পুরুষটি পাণ্ডবদের সঠিক শত্রুর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে তাঁদের বারবার বিজয়ের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে দিয়েছেন। পাণ্ডবরা ও অর্জুন কেবল যুদ্ধ করতেই পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু বিজয় করায়ত্ত করতে যেসব কৌশলের দরকার তার কোনকিছুই তাঁদের জানা ছিল না।

কৃষ্ণ প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন কৌরবদের সামরিক শক্তি ও কৌশল কোন্ কোন্ ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের সময় ক্ষণে ক্ষণে পাণ্ডবেরা যখন ভাবাবেগে বিহ্বল হচ্ছিলেন তখন কৃষ্ণ কৌরবদের সামরিক শক্তির উৎস চার মহারথী; ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও রাজা দুর্যোধনকে নির্মূল করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কৌরবদের কোন কোন বীর মাঝে মধ্যে যুদ্ধে হঠাৎ প্রবল বীরত্ব প্রদর্শন করে তীব্র বাধার সৃষ্টি করলেও কৃষ্ণ পাণ্ডবদের ভুল দিকে পরিচালিত হতে দেননি। কৃষ্ণের লক্ষ্য ছিল সবসময় উৎসের দিকে ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্যের দিকে নয়। তিনি বিভিন্ন কৌশলের দ্বারা কৌরব মহারথীদের বারবার বিভ্রান্ত করে দিক্‌ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। কৃষ্ণ, কর্ণের মত বীর ও দুর্যোধনের মত রাজনীতিককেও শেষপর্য্যন্ত ঘটোৎকচকে দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়েছেন।

কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধে দ্রোণের সেনাপতিত্বে যখন একদিকে আচার্য্য

দ্রোণ ও অন্যদিকে মহাবীর কর্ণ প্রবল প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করছিলেন এবং কর্ণের বিক্রম সহ্য করতে না পেরে পাণ্ডবসেনারা সিংহ তাড়িত মৃগের ন্যায় পালাচ্ছিল তখন সেই ভীতিজনক পরিবেশে কৃষ্ণ ধীর মস্তিকে অর্জুনের চিরনিরাপত্তার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করলেন।

অর্জুনকে দিয়ে ভীমপুত্র মহাবল ঘটোৎকচকে ডাকিয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্ররোচনামূলক কথা বলে কর্ণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ জানতেন ঘটোৎকচ যথেষ্ট বলশালী, তিনি যুদ্ধে গেলে কর্ণের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করবেন এবং কর্ণকে নাস্তানাবুদ করে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। তখন ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য কর্ণ ও কৌরবরা যদি অর্জুনের জন্য রক্ষিত বাসব প্রদত্ত মহাস্ত্র ঘটোৎকচের ওপর প্রয়োগ করেন তাহলে ঘটোৎকচের মৃত্যু হবে কিন্তু অর্জুনের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। কৃষ্ণ কর্তৃক উত্তেজিত ঘটোৎকচ যুদ্ধক্ষেত্রে দানবীয় রূপ পরিগ্রহ করে এক ভীষণ যুদ্ধ শুরু করলেন। ঘটোৎকচ একাই বহুসংখ্যক কৌরবসৈন্য নিধন করে কর্ণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। একের পর এক কুরুপক্ষীয় বীরদের জীবন গ্রহণ করে ঘটোৎকচ কৌরবদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করলে সমস্ত কৌরবসেনা পলায়ন করতে শুরু করল। শুধু একা মহাবীর কর্ণ অবিচলিত চিত্তে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত কৌরবেরা কর্ণের কাছে এসে অর্জুনের জন্য রক্ষিত বাসব প্রদত্ত মহাস্ত্র দিয়ে, ঘটোৎকচকে বধ করে কৌরবসেনাদের জীবন রক্ষার জন্য বারবার অনুরোধ জানাতে লাগলেন। তাঁরা কর্ণকে বোঝালেন যে ঘটোৎকচের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কৌরবসেনারা জীবিত থাকলে ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে পারবেন কিন্তু ঘটোৎকচের হাতে এত সৈন্য মারা গেলে, ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবেন না। ভীত কৌরবদের বারবার অনুরোধে এবং ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রামে কর্ণের মত মহাবীরও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বিপথে পরিচালিত হলেন। দীর্ঘদিন অর্জুন

বধের জন্য সযত্নে লালিত বাসব প্রদত্ত সেই মহাস্ত্র তিনি ক্ষণিকের উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘটোৎকচের ওপর প্রয়োগ করলেন। ঘটোৎকচ নিহত হলেন এবং কৌরবেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

ঘটোৎকচ বধের পর পাণ্ডব শিবিরের সবাই যখন ভীমপুত্রের মৃত্যুর জন্য শোকাহত তখন একমাত্র কৃষ্ণের মনে কোন দুঃখ নেই। ঘটোৎকচের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র কৃষ্ণ কর্ণকে বিপথে পরিচালিত করে অর্জুনের জীবন নিরাপদ করতে পেরেছেন ভেবে আনন্দে রথের ওপর দুহাত তুলে নৃত্য করতে শুরু করলেন। যাঁর জীবন বাঁচানোর জন্য কৃষ্ণের এই আনন্দ সেই অর্জুন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি অবাক হয়ে কৃষ্ণকে অসময়ে এই নৃত্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে কৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন তাতে কৃষ্ণের সামরিক বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি দুয়েরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বললেন,—হে ধনঞ্জয়! আমি যে জন্য সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজ ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রীতিকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এখন কর্ণকে সমরভূমিতে নিপাতিত বলিয়া বোধ কর। এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে কার্তিকেয় সদৃশ শক্তিধারী সূতপুত্রের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং অদ্য উহার শক্তিও ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপসৃত হইল। সূতপুত্রের কবচ ও কুণ্ডল থাকিলে ঐ বীর একাকীই সুরগণের সহিত ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। কি দেবরাজ, কি কুবের, কি বরুণ কি যম—কেহই কর্ণসমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শন চক্র উদ্যত করিয়াও উহাকে পরাজিত করিতে পারিতাম না;···এক্ষণে ঐ বীর শক্তিশূন্য হইয়াছে। উহা হইতে তোমার আর কিছু মাত্র শঙ্কা নাই।

অর্জুনকে নির্ভয় করলেও সাবধানী কৃষ্ণের পরের কথাগুলোয় প্রমাণ হয় যে অর্জুনের জীবন তিনি অর্জুনের জন্য বাঁচাননি, বাঁচিয়েছিলেন রাজনীতিতে নিজের গুরুত্ব অব্যাহত রাখতে। কর্ণের শক্তিহীনতার কথা জেনে অর্জুন নির্ভয় হয়ে যদি কৃষ্ণের ওপর নির্ভরতা ত্যাগ করেন এবং কৃষ্ণকে অবহেলা করতে শুরু করেন তাহলে তো কৃষ্ণের সর্বনাশ। অর্জুনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের সব চেষ্টাই তাহলে ব্যর্থ হবে। মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ কৃষ্ণ তাই অর্জুনকে নিজের বশে রাখার জন্য নানা প্রকার কূটকৌশলযুক্ত কথা বলতে শুরু করলেন যাতে একই সঙ্গে ধর্মের মাধ্যমে নিজের দৈব ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় আবার অর্জুনও হাতের বাইরে না বেরিয়ে যান।

অর্জুনকে তিনি বোঝাতে লাগলেন যে জরাসন্ধের মত মহাবীর ও শিশুপাল প্রমুখকে তিনি পাণ্ডবদের হিতার্থেই বধ করেছেন। কারণ জরাসন্ধ, শিশুপাল ও কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত অন্যান্য রাজারা এখন জীবিত থাকলে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। তাহলে রণক্ষেত্রে পাণ্ডবদের অবশ্যই পরাজয় ঘটত। সেইজন্য কৃষ্ণ আগেই তাঁদের হত্যা করে পাণ্ডবদের নিরাপদ করে রেখেছেন। অথচ এই কৃষ্ণই জরাসন্ধের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পাণ্ডবদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এবং অর্জুনকে বশ করার জন্য সমস্ত যাদব সম্প্রদায় ও বলরামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ভগ্নী সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলেন।

অর্জুন কৃষ্ণের কাছে ছিলেন অপরিহার্য। অর্জুনের মস্তিষ্ককে কৃষ্ণ পুরোপুরি নিজের অধিকারে রেখেছিলেন নানা প্রকার বিভ্রান্তিকর কথার দ্বারা অর্জুনকে হতবুদ্ধি করে। "এক্ষণে ঐ বীর শক্তিশূণ্য হইয়াছে। উহা হইতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই," বলার পরই কিন্তু কৃষ্ণ বুঝলেন অর্জুনকে এতটা সাহসী করে তোলা ঠিক হয়নি। তাই কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ কথা ঘুরিয়ে বিপরীত কথা বলে অর্জুনকে বিভ্রান্ত করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বলতে শুরু করলেন,—যাহা হউক হে ধনঞ্জয়!

আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে কর্ণ এক্ষণে শক্তিশূন্য হইলেও তুমি ভিন্ন অন্য কেহই উহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। কর্ণ নিয়ত ব্রহ্মানুষ্ঠানে তৎপর, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং অরাতিগণেরও প্রতি দয়াবান বলিয়া বৃষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহাবাহু রণদক্ষ এবং নিরন্তর শরাসন উদ্যত করিয়া কেশরী যেমন বনমধ্যে মত্ত মাতঙ্গ-গণকে মদবিহীন করে, তদ্রূপ মহারথগণকে মদহীন করিয়া মধ্যাহ্ন-কালীন শারদ মার্তণ্ডের ন্যায় যোধগণের দুর্দ্দশনীয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর বর্ষাকালীন বারিধারাবর্তী জলধরের ন্যায় শর নিকর্ষনে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণও শরজাল বিস্তার করিয়া উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। উহার শর প্রভাবে তাঁহাদিগেরই শরীর হইতে মাংস, শোনিত বিগলিত হইতে থাকে…।
এইভাবে কৌশলে অর্জুনকে হতবুদ্ধি করে অর্জুনের বিভ্রান্ত, মস্তিষ্কে কর্ণভীতি ঢুকিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে একান্তভাবে তাঁর নিজের ওপর নির্ভরশীল করে তুলে উপযুক্ত সুযোগ বুঝে ধর্মাস্ত্র প্রয়োগে নিজের দৈব ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলেন। কৃষ্ণ বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি অর্জুনকে বললেন,—হে অর্জুন! আমি ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যাহারা ধর্মনাশক, তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ও ধৈর্য্য অবস্থান করে আমি সেই স্থানেই সর্বদা বর্তমান থাকি। হে পার্থ! তুমি কর্ণ সংহারের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। আমি তোমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব যে তুমি তদনুসারে কার্য করিলে অবশ্য তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে।

কৃষ্ণ-বুদ্ধি প্রভাবে সম্মোহিত অর্জুনের তখন নিজের চিন্তাশক্তি লুপ্ত। কৃষ্ণের আমিত্বে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অর্জুন তখন নিজের বাহুবলে অর্জিত বিজয়কেও কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বলে ভাবছেন, কাজেই অন্যদের তো কথাই নেই। পাণ্ডবপক্ষে অর্জুনই সব, অর্জুনের কথাই শেষ কথা, যুধিষ্ঠিরও তা মানতে বাধ্য, কারণ অর্জুন না হলে পাণ্ডবের যুদ্ধজয়

অসম্ভব। সেই অর্জুন যখন বিনা বাক্যব্যয়ে কৃষ্ণের আমিত্ব গলাধঃকরণ করছেন তখন তাই ঠিক। কৃষ্ণের কথাই ঠিক, কৃষ্ণই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রমুখ বড় বড় অধার্মিককে পৃথিবী থেকে অপসৃত করেছেন। অর্জুন কেবল তাঁদের হত্যা করেছেন, তিনি নিমিত্ত মাত্র, আসলে সবই তো কৃষ্ণের মায়া, কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই এসব ঘটছে।

এহেন পরম মূল্যবান দাবার ঘুঁটিকে কোনো বিচক্ষণ রাজনীতিকই হারাতে চান না, বিশেষ করে কৃষ্ণের মত প্রতিভাশালী রাজনীতিক। অর্জুনের জীবন কৃষ্ণের কাছে তাঁর নিজের জীবনের চেয়েও বেশী মূল্যবান ছিল। কৃষ্ণের নিজের কথাতেই তার প্রমাণ আছে। ঘটোৎকচের মৃত্যুর পর সাত্যকির প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বললেন,—হে শৈনেয়! আমি যে পর্যন্ত না অর্জুনের মৃত্যুর প্রতিকার করিয়াছিলাম, ততদিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ এককালে তিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কৃতান্তের করাল আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেমন কর্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা করা তদ্রূপ নহে।

যাঁর জীবনের মূল্য পিতা, মাতা, ভ্রাতার জীবনের চেয়েও বেশী, যাঁর জীবন না থাকলে নিজের জীবনকেও মূল্যহীন মনে হয়, সেই অর্জুনের অমূল্য জীবন বাঁচানোর জন্য কৃষ্ণের এই ব্যগ্রতা শুধু সখ্যতার খাতিরে নয়, আবার অর্জুন কৃষ্ণের ভগ্নীপতি বলেও নয়। পিতামাতা যেখানে তুচ্ছ সেখানে ভগ্নীপতির কথা উঠতেই পারে না। আসলে অর্জুন ছিলেন কৃষ্ণের রাজনৈতিক শোষণের এক অনিঃশেষ প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণজাত স্রোতস্বিনীতে নৌকো ভাসিয়েই কৃষ্ণ নিজের জন্য অমৃত আহরণ করেছেন চিরকালের জন্য, আর অর্জুন পেয়েছেন শুধুই বীরের মর্যাদা তার বেশী কিছু নয়। একজনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি আরেকজনের শুধুই যুদ্ধ।

দুর্যোধনের কাছে তিরস্কৃত হয়ে আচার্য্য দ্রোণ যখন ক্রোধে জ্বলে

উঠে একের পর এক পাণ্ডব মহারথীদের জীবনদীপ নির্বাপিত করছিলেন তখন পাণ্ডবপক্ষীয় কোন বীরই দ্রোণাচার্য্যকে প্রতিহত করতে পারেন নি। রাজা দ্রুপদ ও বিরাট এক আবেগপ্রবণ হঠকারীতায় আচার্য্যকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে একসঙ্গে জীবন হারান। দ্রুপদ ও বিরাটের মৃত্যুর পর সমস্ত পাণ্ডববাহিনীর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। রাজা দ্রুপদ ও বিরাট ছিলেন পাণ্ডবদের প্রকৃত হিতৈষি। অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে তাঁরা নিঃস্ব পাণ্ডব ভ্রাতাদের কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধের উপযোগী করে তুলেছিলেন। তাঁদের মৃত্যুতে পাণ্ডব ভ্রাতারা অভি-ভাবকহীন হলেন। দুর্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রেরাও ভগ্নহৃদয় হয়ে কিংকর্ত্যব্যবিমূঢ় হলেন। দ্রোণাচার্য্যকে হত্যার কোন উপায় তাঁরা স্থির করতে পারলেন না। দ্রোণের ভীষণ যুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে কৃষ্ণ বুঝলেন রণক্ষেত্রে দ্রোণকে পরাজিত করা অসম্ভব। কিন্তু আচার্যকে পরাজিত করা চাই-ই চাই। যে কৌরব মহারথীদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ যুদ্ধের শুরু থেকেই চিন্তিত দ্রোণাচার্য্য তাঁদের অন্যতম। রাজা দুর্যোধনের অন্যতম প্রধান শক্তি আচার্য্য দ্রোণকে সমর ভূমিতে যেন তেন প্রকারেন নিপাতিত না করতে পারলে পাণ্ডব-দের যুদ্ধজয়ের আশা দুরাশা। বাস্তববাদী, কর্মযোগী কৃষ্ণ তখন এক পরিকল্পনা রচনা করলেন দ্রোণের জীবন-দীপশিখা নির্বাপিত করার জন্য। ধর্মের উত্তরীয়ে আবৃত সেই সরল যুগে ঐ রকম পরিকল্পনা রচনা করার জন্য যথেষ্ট মনোবলের প্রয়োজন। প্রচলিত সমকালীন ধর্মীয় অনুশাসন ভেদ করে কৃষ্ণ চিরকালের মহান্ রাজনীতিকের মত নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এগিয়ে গিয়েছেন, ক্ষণিকের জন্যও তাঁর মনে কোন দুর্বলতা স্থান পায়নি। আচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত ম্রিয়মান অর্জুনকে কৃষ্ণ সোজাসুজি পরিষ্কার ভাষায় তাঁর পরিকল্পনা জ্ঞাত করলেন কোন রকম ভণিতা ছাড়াই। কৃষ্ণের এই বক্তব্য কৃষ্ণের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও কৌশলী চরিত্র দুইয়েরই প্রমাণ দেয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন,—হে অর্জুন! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে শরাসন ধারণ

করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও উহাকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক কৌশল করিয়া করিয়া উহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর; নচেৎ আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না; অতএব কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমনপূর্বক বলুন যে—অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।

যেখানে জয়লাভই প্রকৃত উদ্দেশ্য সেখানে ধর্ম বা অধর্ম দুইই সমান গুরুত্বহীন, উদ্দেশ্য সাধনই বড় ধর্ম। কৃষ্ণ সর্বকালের মহান রাজনীতিক-দের অগ্রগণ্য এইজন্যই যে তিনি সব সময়েই সাধারণ যুদ্ধের পাশা-পাশি আরেকটি সমান্তরাল মনস্তাত্ত্বিক রণক্ষেত্র তৈরী করে সাধারণ যুদ্ধের তীব্রতায় প্রয়োজনমত বাধার সৃষ্টি করেছেন ও যুদ্ধকে বিপথগামী করে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। শত্রুর ও সাধারণ মানুষের মনের দুর্বলতম স্থানগুলি সম্বন্ধে কৃষ্ণের গভীর পর্যবেক্ষণ তাঁকে মামুলি একজন সারথির ভূমিকা থেকে রণনিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় উন্নীত করেছিল। ব্যস্ত রণক্ষেত্রে শত্রুর মনের দুর্বলতম কোনে উপযুক্ত সুযোগ বুঝে আঘাত দিয়ে তাকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তুলে, তার মনের আবেগপ্রধান মুহূর্তের সদ্ব্যবহারে জীবন নেওয়া, কৃষ্ণের মত সুযোগসন্ধানী তীক্ষ্ণদৃষ্টি, গভীর কৌশলী, আত্মসচেতন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিকের পক্ষেই সম্ভব।

কৃষ্ণ জানতেন দ্রোণাচার্য পরম অস্ত্রবিদ এবং কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরু হলেও ব্রাহ্মণ। তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণের মানসিক দিকগুলি সম্বন্ধে কৃষ্ণ সচেতন ছিলেন। ধর্মের ধারক হিসাবে ব্রাহ্মণের সবচেয়ে বড় অভিমান ছিল ধর্ম, জীবিকা ব্রাহ্মণের যাই হোক না কেন এবং দ্রোণাচার্য্যও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। দ্রোণাচার্য্য সমর রহস্যবিদ্ পণ্ডিত হলেও সর্বোপরি একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ। নিজে ধার্মিক তাই তিনি অন্য ধার্মিক ব্যক্তিকেও মূল্য দিতেন। সেই সময়ে ধর্ম ও সত্য-

বাদিতার কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। ধর্ম সবসময়েই সত্যাশ্রিত ছিল। একজন ধার্মিক ব্যক্তি আরেকজন ধার্মিক ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করতে নৈতিকভাবে বাধ্য ছিলেন, অবিশ্বাস বা অবহেলা করার কোন প্রশ্নই উঠত না। দ্রোণাচার্য্যও তেমনি সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করতে নীতিগতভাবে বাধ্য ছিলেন, এটাই দ্রোণাচার্য্যের প্রথম মানসিক দুর্বলতা।

আচার্য্যের দ্বিতীয় দুর্বলতা নিতান্তই সাধারণ ও মামুলি। পৃথিবীর সমস্ত সাধারণ মানুষের মন যেসব আবেগীয় উপাদানে তৈরী, দ্রোণের মনও সেইসব উপাদানের দ্বারাই গঠিত হয়েছিল। অতিরিক্ত হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন সমকালীন ব্রাহ্মণের তেজস্বী দৃঢ়তা ও প্রথাবিচ্যুত অস্ত্রমেধা। কিন্তু আচার্য্যের ব্রহ্মতেজ ও অস্ত্রমেধা তাঁকে ভরত বংশে গুরুর আসনে বসালেও তাঁর মনের গভীরে সুপ্ত সাধারণ আবেগীয় উপাদানসমূহকে জয় করতে পারেনি। রণক্ষেত্রে প্রবল সংগ্রামে বহু শত্রু নিধন করে উল্কার মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেও দ্রোণাচার্য্য ছিলেন মনের বাস্তব-গভীরে একজন স্নেহশীল পিতা, শুধুই একজন পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ পিতা।

কৃষ্ণের দূরবীণ-চোখ রণক্ষেত্রে বহু শত্রু নিধনকারী দ্রোণাচার্য্যের বর্ম ভেদ করে বুকের ভিতর বাৎসল্যের এক বিশাল সরোবরে নিমজ্জিত বৃদ্ধ পিতাকে আবিষ্কার করেছিল। একজন মহান্ বীরকে কৌশলে মুহূর্তের মধ্যে একজন মামুলি পিতায় রূপান্তরিত করা সূক্ষ্ম মানসিক চাপ প্রয়োগের এক না-দৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কেবল কৃষ্ণই পারতেন এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে, তাই শুধু তিনিই পেরেছিলেন অন্যরা কেউ পারেন নি। অন্য সবাই কৃষ্ণের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হয়েছেন আর ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন।

কৃষ্ণ যখন প্রথম দ্রোণ বধের পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন তখন সেই পরিকল্পনা শুনে সবাই হতবাক। এমনকি অর্জুন পর্যন্ত স্তম্ভিত, কৃষ্ণের অনুরোধে দ্রোণের কাছে গিয়ে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ তিনি

দিতে পারলেন না। গুরুর কাছে গিয়ে গুরুপুত্রের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিতে তাঁর যোদ্ধা-বিবেক বল পায়নি। দুর্বল মন নিয়ে অর্জুন তাই সবিনয়ে কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভীমের মস্তিষ্কের চেয়ে দেহ বেশী পুষ্টি লাভ করেছিল তাই কৃষ্ণের কথায় ভীম সহজেই সম্মত হলেন। যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছিলেন যে বাস্তব বড় কঠিন, সহানুভূতি আদায়ের জন্য রাজনীতিতে সত্যবাদী হিসেবে নিজেকে জাহির করার একটা মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু নির্মম রণক্ষেত্রে জীবন ছাড়া আর কোন কিছুরই কোন মূল্য নেই। তাই ভীম রাজী হওয়া মাত্র যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন, শুধু ভান করলেন যেন তিনি কৃষ্ণ ও ভীমের চাপে পড়েই এই মিথ্যা উপায়ের আশ্রয় নিচ্ছেন। আসলে তিনি নিজেও বুঝতে পারছিলেন যে এছাড়া আর কোন উপায় নেই দ্রোণবধের। কিন্তু তবু যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদী থাকা চাই। কৃষ্ণ তারও উপায় বের করলেন, ভীমকে দিয়ে অবন্তীরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে এক মহাগজকে হত্যা করিয়ে। এরপর আর 'অশ্বত্থামা হত' বলতে কোন বাধা নেই।

কিন্তু ভীম দ্রোণের সামনে গিয়ে দ্রোণকে বিস্তর কটুবাক্য বলে অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দিলেও আচার্য্য দ্রোণ তা বিশ্বাস করলেন না। প্রথমে যুদ্ধের ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ এরকম গুরুতর একটা শোক সংবাদ শুনে তিনি একটু মুষড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তার পরেই নিজের পুত্রের বলবিক্রমের কথা চিন্তা করে তিনি আগের মতই প্রবল প্রতাপে শত্রু নিধন করতে লাগলেন। একটুও মানসিক দৌর্বল্য দ্রোণের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল না।

কৃষ্ণ যা আশা করেছিলেন ভীমের দ্বারা তা সফল হল না দেখে তিনি চিন্তিত হলেন। কৃষ্ণ জানতেন আচার্য্য দ্রোণকে আচমকা মানসিক আঘাতে বিপর্য্যস্ত করতে পারেন একজন ব্যক্তিই, তিনি যুধিষ্ঠির। যাঁর সত্যবাদীতার ওপর দ্রোণাচার্য্য সমেত অন্যান্য মহারথীরাও আস্থা রাখেন। কৃষ্ণ তাই যুধিষ্ঠিরকে অনুনয় করলেন দ্রোণের কাছে

গিয়ে অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দেবার জন্য,—হে রাজন ! যদি দ্রোণাচার্য্য রোষ পরবশ হইয়া আর অর্ধদিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যা কথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপস্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। কামিনীদিগের নিকট, বিবাহস্থলে এবং গো ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের যুক্তিতে মনে বল সঞ্চয় করে দ্রোণাচার্য্যের কাছে গেলেন। যুধিষ্ঠিরকে দেখামাত্র আচার্য্যের পিতৃহৃদয় সন্দেহ নিরসনের প্রচেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে ভীম প্রদত্ত সংবাদ সত্যি কিনা জানতে চাইল। দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন ভীম প্রদত্ত অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ সত্যি কিনা। উত্তরে যুধিষ্ঠির জানালেন যে ভীম সত্যি কথাই বলেছেন, আচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা সত্যিই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর আর অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকতে পারে না, প্রিয় শিষ্য সত্যবাদী যুধিষ্ঠির স্বয়ং যখন গুরুকে এই সংবাদ দিচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মণের ক্ষাত্রচাতুর্য অন্তর্হিত হল। রণক্ষেত্রে সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করে এক অশিতীপর বৃদ্ধ পিতা, পুত্র অশ্বত্থামার জন্য ডুকরে কেঁদে উঠলেন। একমাত্র প্রিয় পুত্রের মৃত্যু সংবাদে আচার্য্যের পৃথিবীর সব আলো নিভে গিয়ে জগৎ অর্থহীন অন্ধকারে পূর্ণ হল এবং আচার্য্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ অবসন্ন হয়ে পড়ল। রণক্ষেত্রে কোন অস্ত্র যাঁকে আঘাত করতে পারেনি, যিনি সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ করেছেন, ভরত বংশের সেই আচার্য্য মহান্ অস্ত্রবিদ দ্রোণ কৃষ্ণের এই অভিনব অস্ত্রাঘাতে বিচেতন হলেন এবং সেই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের রথের ওপরে উঠে তাঁর মস্তক তরবারি দিয়ে ছিন্ন করলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নকে সকলেই নিষেধ করেছিলেন আচার্য্যকে হত্যা না করার জন্য, এমনকি অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাধা প্রদান করার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের

পিছনে পিছনে দৌড়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। গুরুর প্রতি দুর্বলতাই অর্জুনকে একাজে প্ররোচিত করেছিল। গুরুর সঙ্গে যুদ্ধ করলেও কৃতজ্ঞ শিষ্য অর্জুন কখনই চাননি যে অশিতিপর বৃদ্ধ গুরুকে হত্যা করা হোক্। সেইজন্যই তিনি আন্তরিকভাবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাধা দেবার জন্য দৌড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন না চাইলেও কৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে আচার্য্য দ্রোণকে হত্যা করা হোক। এইখানেই কৃষ্ণের মানসিক দৃঢ়তার পরিচয়, এখানেই কৃষ্ণের সঙ্গে অন্য সবার পার্থক্য। অর্জুন দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁকে হত্যা করার বাসনা নিয়েই কিন্তু তবু তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণ হত্যায় বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন নেহাত মানসিক দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে। কৃষ্ণ কখনও এরকম স্ববিরোধী কার্যে লিপ্ত হন নি। তাই তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণহত্যায় বাধা প্রদান করেননি। কৃষ্ণ জানতেন ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দ্রোণাচার্য্যকে হত্যা করবেন। এতে তিনি মনে মনে পুলকিত হয়েছিলেন তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে দেখে। যাকে বধ করার জন্য এত তোড়জোড়, এত আপ্রাণ চেষ্টা, সেই তার মৃত্যুক্ষণেই নেহাৎ আবেগের বশবর্তী হয়ে ছেলে-মানুষের মত বাধা প্রদান অর্জুনের পক্ষেই সম্ভব, কৃষ্ণের দ্বারা নয়। কৃষ্ণ কখনই এরকম স্ববিরোধী কার্য করেন নি, ধীর মস্তিকে সুচিন্তিত ভাবে তিনি প্রত্যেকটি পরিকল্পনা রূপায়িত করেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাধা না দেওয়া কৃষ্ণের মানসিকতার সঙ্গে একান্তই সঙ্গতিপূর্ণ।

[আট]

কৌরবপক্ষের যে তিন মহারথীকে নিয়ে কৃষ্ণের প্রথম থেকেই দুশ্চিন্তা ছিল তাঁদের মধ্যে আর মাত্র অবশিষ্ট রইলেন মহাবীর কর্ণ। পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণকে কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে হার মেনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধে প্রবল হয়ে উঠে বহু পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে শুরু করলেও পাণ্ডবপক্ষের সতর্ক প্রহরী কৃষ্ণ কিন্তু কোন সময়েই কর্ণের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বিপথগামী হননি। কৃষ্ণ জানতেন আচার্য্য দ্রোণের মৃত্যুর পর সমগ্র কৌরববাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে আসবেন মহাবীর কর্ণ। রণক্ষেত্রে তাই কর্ণের গুরুত্ব অসীম। অশ্বত্থামা পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্রোধে জ্বলে উঠে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে পারেন কিন্তু সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধের ফলাফলকে প্রভাবিত করা অশ্বত্থামার দ্বারা সম্ভব নয়। একমাত্র সেনাপতিই তা করতে পারেন। কাজেই একজন সেনাপতির গুরুত্ব আর তাঁরই অধীনে পরিচালিত একজন বীর যোদ্ধার গুরুত্ব কখনই সমান হতে পারে না। বিশেষ করে কৃষ্ণের মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রণকৌশলীর কাছে।

সেইজন্য দ্রোণাচার্য্য যতক্ষণ জীবিত থেকে কৌরবপক্ষের সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ততক্ষণ কৃষ্ণের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আচার্য্য দ্রোণ। যে মুহূর্তে দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু ঘটল এবং কর্ণ কৌরবপক্ষের সেনাপতির পদ গ্রহণ করলেন তখনি কিন্তু কৃষ্ণের কাছে কর্ণের জীবনের মূল্য সর্বাধিক হয়ে উঠল। কর্ণের জীবনের মূল্য কৃষ্ণের কাছে আগেও ছিল, কিন্তু ভীষ্ম বা দ্রোণ জীবিত থাকা-কালীন যা ছিল এখন তাঁদের মৃত্যুর পর কর্ণের জীবনের মূল্য কৃষ্ণের কাছে সহস্রগুণ বেশী হয়ে দেখা দিল। কৃষ্ণ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝেছিলেন

যে সেনাপতির মৃত্যু হলেই সৈন্যদল মনোবল হারায়। সেনাপতিকে হত্যা করতে পারলে সমগ্র সৈন্যদল পরিচালকহীন হয়ে সুযোগ্য পরিচালনার অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল রূপ ধারণ করে এবং পরিকল্পিত-ভাবে যুদ্ধ করতে পারে না। সেইজন্য কৌরবসৈন্যদের মনোবল হরণ ও তাদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্য সেনাপতি কর্ণের জীবন নেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

কর্ণ সেনাপতির পদ গ্রহণ করার পর থেকেই তাই কৃষ্ণের কর্ণের প্রতিটি গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অশ্বত্থামার সঙ্গে অর্জুনসহ পাণ্ডবেরা যখন যুদ্ধ করতে ব্যস্ত তখন যুধিষ্ঠিরের কথা কারুর মনেই নেই। যুধিষ্ঠির বাহাদুরী দেখানোর জন্য কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু কর্ণের পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করলেন। যুধিষ্ঠিরের কোন খোঁজ নেই দেখে কৃষ্ণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, যদি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে যুধিষ্ঠির প্রাণ হারান তাহলে তো একদম সর্বনাশ। পাণ্ডবেরা যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র মনোবল হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবেন। এ দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে কৃষ্ণ তাই অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে সেই বিশৃঙ্খল যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে খুঁজতে বেরোলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর কৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে কর্ণ কর্তৃক পরাজিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় একস্থানে দেখতে পেলেন। কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করার পর প্রাণে হত্যা না করে জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করে চলে যান। অপমানে মৃতপ্রায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখামাত্র বালকসুলভ আচরণ করে নির্বোধের মত কর্ণকে অর্জুন পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন তাঁকে অশ্বত্থামার ভীষণ যুদ্ধের কথা জানিয়ে বললেন যে অশ্বত্থামাকে প্রতিরোধ করতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন, কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত কোন সুযোগ তাঁর আসেনি।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে এরপর রণক্ষেত্রের যথাযথ বর্ণনা দিলেন। কিন্তু অপমানে মৃত রাজা যুধিষ্ঠিরের তখন চিন্তাশক্তি ও কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত। তিনি অর্জুনকে যা নয় তাই বলে ধিক্কার দিতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে কাপুরুষ ও অন্যান্য অনুপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে বললেন যে অর্জুন কর্ণের ভয়ে রণক্ষেত্রে ভীমকে একা পরিত্যাগ করে তাঁর কাছে পালিয়ে এসেছেন। অর্জুনের ভরসাতেই যুধিষ্ঠির রাজ্যলোভে যুদ্ধে নেমেছেন। অর্জুন দ্বৈত বনে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে তিনি কর্ণকে হত্যা করবেন, কিন্তু এখন সবাইকে বিপদে ফেলে অর্জুন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে নিজে সরে দাঁড়াচ্ছেন। কৃষ্ণের মত সারথি পেয়েও তিনি কর্ণকে হত্যা করতে পারলেন না; তাঁর উচিত যোগ্যতর কাউকে গাণ্ডীব প্রদান করে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করা। ক্রোধে ও অপমানে দিশাহারা যুধিষ্ঠির এইভাবে পাণ্ডবপক্ষের সবচেয়ে নির্ভরশীল বীরকে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠিরের ধিক্কার শুনে অর্জুন ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পাণ্ডবপক্ষের হয়ে অর্জুন একাই শতকরা পঁচাত্তর ভাগ যুদ্ধ করেছেন। অর্জুন না থাকলে পাণ্ডবের যুদ্ধ বিজয়ও সম্ভব হত না। অর্জুন জানতেন কর্ণের মত মহাবীরকে ইচ্ছা করলেই বধ করা যায় না কিন্তু তবু যুধিষ্ঠিরের মুখে অকারণে ধিক্কার শুনে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নির্বোধ যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দেবার জন্য ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত অর্জুন কোষ থেকে অসি বের করে যুধিষ্ঠিরের মস্তকচ্ছেদন করতে উদ্যত হলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠিরের অপরিণত আচরণে পাণ্ডব ভ্রাতাদের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল ধরে বিভেদের রেখা দেখা দিল। কিন্তু এখানেও পাণ্ডব কুলকে রক্ষা করলেন কৃষ্ণ। অর্জুনের হাতের উদ্যত অসি কৃষ্ণ কৌশলে নিবারণ করলেন। বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে স্বান্তনা দিয়ে ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ অর্জুনকে শান্ত করে পাণ্ডব ভ্রাতাদের বিভেদ-জনিত আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

পাণ্ডব ভ্রাতাদের ও সমগ্র পাণ্ডবপক্ষকে একত্রে ঐক্যবদ্ধ রাখা

কৃষ্ণের নেতৃত্বের আর একটি উৎকর্ষতা। যদি পাণ্ডবপক্ষে ঐক্য না থাকত এবং তাঁরাও যদি কৌরব মহারথীদের মত রেষারেষিতে মত্ত হতেন তাহলে যুদ্ধের ফল পাণ্ডবদের অনুকূলে যেত কিনা বলা সন্দেহ, কারণ এমনিতেই তুলনামূলকভাবে সামরিক শক্তির বিচারে কৌরবেরা শক্তিশালী ছিলেন। কৃষ্ণ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। রণক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে ঐক্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পাণ্ডবপক্ষ বহুবার বিভেদের প্রান্তে এসেও রক্ষা পেয়েছে। রণক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে কর্ণ কর্তৃক পরাজিত ও জীবিত দেখেই কৃষ্ণ বুঝলেন কর্ণের অর্জুনের প্রতি আক্রোশ কত গভীর। যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে হত্যার সুযোগ পেয়েও কর্ণ তাঁকে হত্যা করেননি, কারণ তিনি হত্যা করবেন মাত্র একজনকেই তাঁর নাম অর্জুন। সামনে কর্ণের মত ভয়ংকর শত্রু আর ঠিক তখন দুই শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব বিভেদে উন্মত্ত। কৃষ্ণ না থাকলে অর্জুন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কি করতেন বলা শক্ত এবং তার ফলে পাণ্ডব পক্ষের যে ক্ষতি হত তা অপূরণীয়। সমগ্র যুদ্ধের ফলাফল কৌরবদের অনুকূলে চলে যেত। কিন্তু তা হয়নি শুধু কৃষ্ণের জন্য। অর্জুনের ওপর কৃষ্ণের বিশেষ অধিকার ছিল। সেই অধিকারের জোরেই কৃষ্ণ অর্জুনের মত মহাবীরের ক্রোধ প্রশমিত করেছেন তিরস্কার করে, কখনও বা ধার্মিকের কর্তব্য কি তা বুঝিয়ে। কৃষ্ণ ছাড়া আর কারো ক্ষমতা হত না অর্জুনের মত মহাযোদ্ধার ক্রোধ প্রশমনের। অর্জুন যে সত্যিই যুধিষ্ঠিরের ওপর রেগে গিয়েছিলেন তার প্রমান যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের অসম্মানজনক মধ্যম পুরুষে সম্বোধন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে দ্রৌপদীর কোমল শয্যায় শয়ন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থান করে যুধিষ্ঠিরের পক্ষেই এই ধরনের কথা অর্জুনকে বলা সম্ভব, কারণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানেন না। যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ সম্বন্ধে কথা বলার কোন অধিকারই নেই, কারণ তাঁর জন্যেই এই যুদ্ধ। যদি কারুর কোন কথা বলার অধিকার থেকে থাকে তবে তিনি

ভীম।— রণক্ষেত্রে ভীম প্রবল সংগ্রামে বহু শত্রু নিধন করছেন, তিনি রণক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, কাজেই তিরস্কার করার মত কিছু থাকলে একমাত্র ভীমই পারেন অর্জুনকে তিরস্কার করতে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কোন অধিকার নেই।

অর্জুনের বাক্য শুনে অপমানিত যুধিষ্ঠিরের অপমানের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বনবাসে গমন করার জন্য উদ্যোগী হলেন। ভ্রাতৃবিবাদ এক সংকটজনক আকার ধারণ করল। কিন্তু কৃষ্ণের সময়োচিত হস্তক্ষেপে পাণ্ডবপক্ষ এই সংকটের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। অর্জুন—অপমানিত যুধিষ্ঠিরকে নানাভাবে স্বান্ত্বনা প্রদান করে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ প্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে কর্ণ কর্তৃক অপমানিত হওয়াই যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সবচেয়ে বেশী মনোব্যথার কারণ। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রশস্তি করে তাঁর কাছে সেইদিনই কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা করলেন এবং অর্জুনকে নানা ভাবে তিরস্কার করে সূক্ষ্ম ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা চাওয়ালেন। অর্জুন ক্ষমা প্রার্থনা করায় যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ দূর হল এবং পাণ্ডব ভ্রাতাদের মধ্যে যে আত্মকলহের সূচনা হয়েছিল তার অবসান হল। কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে দুই বিবদমান ভ্রাতার অভিভাবক রূপে কাজ করেছেন। কৃষ্ণ ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিলনা ধর্মীয়তত্ত্বে সুপণ্ডিত যুধিষ্ঠিরকে সূক্ষ্ম ধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বোঝানোর। ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের অপমান দূর করে রণগর্ব্বী অর্জুনের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃত্বের পুনস্থাপন কৃষ্ণের দীপ্ত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করার এক আশ্চর্য্যপ্রকাশ।

ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ মেটানোর পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের মৃত্যু সম্বন্ধে যে কথা দিয়েছিলেন তাই নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। কিভাবে কর্ণের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা যায়? যুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি ও মহাযোদ্ধাদের বীরত্বের মূল্যায়ন করে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে একমাত্র অর্জুনই পারেন কর্ণকে বধ করতে। কিন্তু অশ্বত্থামার প্রচণ্ড বীরত্বপূর্ণ

মহারণ ও প্রতিরোধ এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিবাদের পর অর্জুনের মানসিক দৃঢ়তা ছিন্নভিন্ন হয়ে অন্তর্হিত। মানসিক আঘাতে জর্জরিত ভগ্নহৃদয় অর্জুনকে দিয়ে যে কর্ণের মত মহারথীকে বধ করানো যাবেনা কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে কথা বলেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনের মনকে যতটা জানতেন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, ততটা সম্ভবতঃ অর্জুন নিজেও জানতেন না এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। বীর অর্জুন তাঁর নিজস্ব আবেগে পরিচালিত হলেও নিয়ন্ত্রিত হতেন কৃষ্ণের বুদ্ধির দ্বারা। কৃষ্ণ প্রথমেই বুঝলেন যে অর্জুনের ভগ্নহৃদয়ে মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য অর্জুনের আত্মবিশ্বাসকে বাঁচিয়ে তোলা দরকার। অর্জুন যাতে আত্মবিশ্বাস ফিরে পান সেইজন্য কৌশলী মনস্তাত্বিক দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ অর্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করতে শুরু করলেন। অর্জুনের মহান্ বীরত্বকর্মসমূহের বিস্তৃত তালিকা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন যে এই পৃথিবীতে এমন কোন বীর নেই, যে অর্জুনের সামনে যুদ্ধ করার বাসনা নিয়ে দাঁড়াতে পারে। অর্জুনই এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর, একমাত্র তিনিই পারেন কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিহত করতে। এইভাবে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে কৃষ্ণ অর্জুনের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলে অনেক সময় শত্রুকে অবহেলা করে বিপদে পড়তে হয়। সু-মন-বিশ্লেষক কৃষ্ণ মানুষের মনের এই দিকটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেইজন্য অর্জুন যাতে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে কর্ণের মত মহাবীরকে অবহেলা না করেন কৃষ্ণ তাই শত্রু হিসাবে কর্ণের গুরুত্ব অর্জুনকে বোঝাতে লাগলেন কর্ণের নানা প্রশংসা করে।

"......অতএব তোমার অনুরূপ বীর আর কেহই নাই।" বলার পরই কৃষ্ণ বলতে শুরু করলেন,...যাহা হউক তোমার যাহা হিতকর তাহা নির্দেশ করা আমার অবশ্য কর্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত, নিতান্ত

গর্বিত, সুশিক্ষিত, কার্যকুশল, বিচিত্রযোদ্ধা ও দেশকাল কোবিদ। আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

এইভাবে কৃষ্ণ কর্ণের নানা গুণাবলির এক বিরাট তালিকা তুলে-ধরে অর্জুনকে বোঝালেন যে কর্ণ মোটেই অবহেলা করার মত শত্রু নন। কর্ণ বিরাট বীর, তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে অর্জুনকে যথেষ্ট সর্তক হয়ে যুদ্ধ করতে হবে। কৃষ্ণের বিভিন্নমুখী কথায় অর্জুনের মন ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। অর্জুন আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। কিন্তু অর্জুন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেও কর্ণের মত যোদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত সম্পূর্ণ উপযোগী তাঁর মন তখনও হয়নি। একজন প্রকৃত যোদ্ধার মন তৈরী করতে গেলে যে মানসিক উপকরণটি সর্বাগ্রে দরকার তাহল ঘৃণা ও বিদ্বেষ। প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণায় ও বিদ্বেষে মন যদি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে নাই থাকল তবে হত্যা করা হবে কাকে? আর সে হত্যায় প্রেরণাই বা আসবে কোত্থেকে। রণক্ষেত্রের তীব্রতাবর্দ্ধক, যোদ্ধার মানসিক শক্তি-উজ্জীবণী সুধা ঘৃণা তাই একজন সম্পূর্ণ যোদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। মানসিক উগ্রতার অন্যতম উপকরণ ঘৃণা।

ধীমান কৃষ্ণ এই সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক বিষয়টি ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন নিজের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার থেকে। অর্জুনকে তাই মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্ণের উপযুক্ত একজন সম্পূর্ণ যোদ্ধা হিসাবে তৈরী করার জন্য কৃষ্ণ অর্জুনের মনে কর্ণের বিরুদ্ধে ঘৃণার পাত্র উপুর করে ঢেলে দিতে লাগলেন নানা রকমের বিদ্বেষ-প্রসূত উত্তেজক কথা বলে। কৃষ্ণ বলতে লাগলেন,—হে ধনঞ্জয়! সূত-পুত্র অতিশয় দুরাত্মা, পাপস্বভাব, ক্রুর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি সম্পন্ন; সে এক্ষণে অকারণ তোমাদিগের সহিত এইরূপ বিরোধ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য হও।......যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মান-রক্ষার্থ অশ্বত্থামার প্রতি ও আচার্য গৌরবপ্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রতি দয়াকর:

এবং যদি মাতৃবান্ধব বলিয়া কৃতবর্মাকে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অনুমাত্র দোষ নাই। দুর্য্যোধন রজনীযোগে যে তোমাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত এবং সভামধ্যে দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপ পরায়ণ সূতপুত্রই তৎসমুদয়ের মূল।

হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, 'হে বিপুল নিতম্বে মৃদুভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে: অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্বপতিগণ বর্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজ সদনে প্রবেশ করা তোমার কর্তব্য।' হে পার্থ পাপ পরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কুবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজ তুমি জীবিত নাশক শিলাশিত সুবর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া তাহার দুর্বাক্যের এবং সে তোমার প্রতি যে সকল পাপাচরণ করিয়াছে তৎ সমুদয়ের শাস্তি বিধান কর। আজ কর্ণ গাণ্ডীব নির্মুক্ত ঘোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন স্মরণ করুক। আজ তোমার ভুজ নিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎসপ্রভ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদয় সূতপুত্রের বর্ম বিদারণ পূর্বক শোণিত পান করিয়া উহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করুক···।

এইভাবে প্রথমে কৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁর মার ওপর যে অত্যাচার হয়েছিল কর্ণ ই তার মূলে। তারপর পুত্র অভিমন্যুর কথা। যে ছয় মহারথী মিলে বালকবীর অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন কর্ণ ই ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং এই নিয়মবিরুদ্ধ কাজের জন্য পাপাত্মা কর্ণ একটুও দুঃখিত হননি। কর্ণ ই প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের পুত্রহন্তা। সবশেষে স্ত্রী; অর্জুনের ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের স্ত্রী দ্রৌপদীকে

প্রকাশ্য সভায় যে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে তা সূতপুত্র কর্ণের জন্যই। কর্ণ নিজেও দ্রৌপদীর প্রতি অবমাননাকর অনেক কুবাক্য প্রয়োগ করেছিলেন। এছাড়া অর্জুনকে হত্যা করার জন্য সূতপুত্র কর্ণ বহুদিন আগে থেকেই ব্রহ্মাস্ত্র সংরক্ষিত করে রেখেছেন! কাজেই কর্ণই অর্জুনের একমাত্র শত্রু যাকে এখনি হত্যা করা প্রয়োজন। কারণ কর্ণ অর্জুনের মাতৃবধোদ্যমকারী, অর্জুনের পুত্রহন্তা ও অর্জুনের স্ত্রীর অবমাননাকারী এবং সবশেষে স্বয়ং অর্জুনের জীবনলিপ্সু।

কৃষ্ণ দ্রোণাচার্য্যের হত্যার সময় যেমন করেছিলেন এখানেও তেমনি অর্জুনের মনে কর্ণের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করতে একই পন্থার আশ্রয় নিলেন। অর্জুনের মত মহাবীরের বিশালবক্ষের অন্তরালে যে শ্রদ্ধাপূর্ণ, স্নেহশীল ও প্রেমিক এক সাধারণ মানুষ লুকিয়ে ছিল তাকে তিনি টেনে বের করলেন এবং মানুষের চিরন্তন দুর্বল স্থান: মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, সন্তানের প্রতি মমতা ও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায় আঘাত হেনে অর্জুনের অবচেতন মনের এক নিঃসঙ্গ কোনে জমাট বেঁধে থাকা ঘৃণাকে উত্তপ্ত করে গলিত লাভার প্রবাহে বের করে আনলেন। কৃষ্ণের কথায় অর্জুনের বিশ্বাস জন্মালো যে কর্ণ তাঁর সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ট ও প্রিয় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের লাঞ্ছনা ও হত্যা করে পরিশেষে তাঁকে স্বয়ং হত্যা করতে চান, কর্ণ অর্জুনের সর্বনাশাকাঙ্ক্ষী।

এইভাবে অর্জুনকে কৃষ্ণ, কর্ণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে একসঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন। প্রথম, পাণ্ডবদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শত্রু কর্ণের বিরুদ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে সক্ষম হলেন। দ্বিতীয়, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের বিদ্বেষ বিপথগামী করে কর্ণের ওপর আক্রোশে পরিণত করে ভ্রাতৃবিরোধ দূর করলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করলেন। কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন ভ্রাতৃবিরোধের মূল কারণ কর্ণ। এই বালকসুলভ ভ্রাতৃবিরোধ থেকে পাণ্ডব ভ্রাতাদ্বয়ের দৃষ্টি তিনি মূল কারণের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ফলে ভ্রাতৃবিরোধ থেমে গিয়ে পাণ্ডবপক্ষ এক অভাবনীয় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল।

ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত অর্জুনকে নিয়ে এরপর কৃষ্ণ এলেন রণক্ষেত্রে মহাবীর কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। কর্ণের সারথি মহারথ মদ্রাধিপতি শল্য কর্ণকে দেখালেন যে ক্রোধাক্ত নয়ন অর্জুন সারথি কৃষ্ণকে নিয়ে কর্ণের দিকেই আসছেন। রণক্ষেত্রে তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলছে। কোথাও পাণ্ডবরা জয়ী হচ্ছেন কোথাও বা কৌরবরা। কর্ণপুত্র বৃষসেন তখন রণক্ষেত্রে প্রবল প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করছিলেন। চতুর্থ পাণ্ডব নকুল পর্যন্ত বৃষসেনের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছেন। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেই কৃষ্ণের দৃষ্টি পড়ল বৃষসেনের ওপর। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের আগেই সূতপুত্রকে এক প্রচণ্ড মানসিক আঘাত দেবার অপূর্ব সুযোগ কৃষ্ণ বৃষসেনের মধ্যে লক্ষ্য করলেন। কৃষ্ণ জানতেন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মহাবীর কর্ণ সর্বাংশে তৈরী, এমতাবস্থায় কর্ণকে যদি যুদ্ধের আগেই কোনভাবে মানসিক আঘাত দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া যায়, তাহলে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কর্ণের মানসিক বিক্ষিপ্ততার সুযোগ অর্জুন নিতে পারবেন। অনেকটা দ্রোণাচার্য্যের বেলায় নেওয়া কৃষ্ণের কৌশলের মত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে যুদ্ধক্ষেত্রে বৃষসেনকে হঠাৎ দেখেই কৃষ্ণের মনে এই পরিকল্পনা এল, কিন্তু আসলে তা নয়। কৃষ্ণের উপস্থিত বুদ্ধির যদিও কোন তুলনা হয় না তাহলেও শুধু উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা রণক্ষেত্রে কৃষ্ণের মত কোন ব্যক্তিত্ব গভীর কোন সামরিক পরিকল্পনা রচনা করবেন না। বৃষসেনের মাধ্যমে কর্ণকে মানসিক আঘাত দেবার পরিকল্পনা কৃষ্ণের ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ব পরিকল্পনার ফল। যদি বৃষসেন রণক্ষেত্রে সেই মুহূর্তে অবস্থান না করতেন, তাহলে কৃষ্ণ হয়ত অন্য কোনভাবে কর্ণকে মানসিক আঘাত দেবার চেষ্টা করতেন। মোটকথা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ যেভাবেই হোক কর্ণের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

বৃষসেনকে দেখা মাত্র কৃষ্ণ তাই অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন তৎক্ষণাৎ কর্ণতনয়কে আক্রমণ করে হত্যা করতে। কৃষ্ণের নির্দেশ পাওয়া মাত্র

অর্জুন বৃষসেনকে আক্রমণ করলেন। বৃষসেন নকুলকে পরাজিত করতে পারলেও অর্জুনের মত মহাবীরের আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে মুহূর্তের মধ্যেই পরাজয় বরণ করে প্রাণত্যাগ করলেন। একই রণক্ষেত্রের অন্যদিকে মহাবীর কর্ণ প্রবল প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করছিলেন, হঠাৎ আচমকা অর্জুনের হাতে পুত্র বৃষসেনের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত হলেন। তাঁর পিতৃ-হৃদয় পুত্রস্নেহে ব্যথিত হয়ে উঠল এবং চোখ দিয়ে শোক বাষ্প নির্গত হল। কৃষ্ণ ঠিক এইরকম একটি সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে শোকসংবাদ শুনে কর্ণের মানসিক ভারসাম্য বিচলিত, সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনকে নিয়ে তিনি কর্ণের দিকে তীব্র-বেগে রথ পরিচালনা করে একেবারে কর্ণের সামনে কর্ণের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

ক্রোধে রক্তাক্ত চক্ষু অর্জুন সেই মুহূর্তে শোকার্ত কর্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করতে লাগলেন। পুত্রশোকে আচ্ছন্ন কর্ণ হঠাৎ সামনে পুত্রহন্তা অর্জুন ও তাঁর সারথি বাসুদেবকে দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং শুরু হল দুই মহাবীরের মহারণ। সদ্য পুত্রহারা প্রতিশোধা-কাঙ্ক্ষী পিতা কর্ণ ও অন্যদিকে ঘৃণায় প্রজ্জ্বলিত অর্জুন একে অন্যের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। কিন্তু কর্ণ একে মহাবীর, দানশীল, ত্যাগী, সংযমী ও তেজস্বী চরিত্র তারপর সদ্যপুত্র-হারা। কর্ণের ভয়ংকর যুদ্ধের বেগ অর্জুন সহ্য করেন তার সাধ্য কি! অর্জুন বার বার কর্ণপ্রযুক্ত শর বিমুখ করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, সারথি যার কৃষ্ণ তার চিন্তা কিসের! কৃষ্ণ বার-বার অর্জুনকে উৎসাহিত করতে লাগলেন কর্ণের বিরুদ্ধে। আগাগোড়া কৃষ্ণের লক্ষ্য একটিই, ছিল তা হচ্ছে অর্জুনের মনোবল যাতে ভেঙ্গে না পড়ে। যুদ্ধের প্রচণ্ড চাপে ও ক্লান্তিতে মনোবল হারানোর সম্ভাবনা অর্জুনের যথেষ্ট ছিল কিন্তু কৃষ্ণের ক্রমাগত উৎসাহ প্রদানের ফলেই অর্জুন কর্ণের বিরুদ্ধে তীব্রতম যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষ্ণ

অর্জুনকে উৎসাহ প্রদান করে বললেন,—হে সখে! আজ সূতপুত্র যে অস্ত্র দ্বারা তোমার অস্ত্রজাল নিরাকৃত করিল ইহার কারণ কি? হে বীর। তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কেনই বা বিমোহিত হইতেছ?

এইভাবে প্রতিপদক্ষেপে অর্জুন পেয়েছেন কৃষ্ণের উৎসাহ ও উপদেশ আর মহাবীর কর্ণ তাঁর সারথি শল্যের কাছ থেকে পেয়েছেন নিরুৎসাহ বাণী ও অর্জুনের প্রশংসা। অথচ বীর শল্যকেই কর্ণ তাঁর সারথি নিযুক্ত করেছিলেন যোগ্যতার বিচারে। কিন্তু শল্য অর্জুনের প্রতি স্নেহ বশতঃ নিজের দায়িত্ব উপযুক্ততার সঙ্গে পালন না করে কর্ণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, যার ফলে অর্জুনের কর্ণ-পরাজয় অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য যা করেছিলেন সারথি হিসাবে, শল্য কর্ণের জন্য তার ভগ্নাংশও করতে পারেননি। তবে তার মানে এই নয় যে শুধু শল্যের ভ্রান্ত সারথ্যের জন্যই কর্ণ অর্জুনের হাতে পরাজিত হয়েছেন। পরাজিত হয়ে অর্জুনের হাতে কর্ণের মৃত্যুবরণের জন্য দায়ী একমাত্র কৃষ্ণ, আর কেউ নন।

যখন অর্জুন ও কর্ণে তুমুল যুদ্ধ চলছে এবং দুই মহাবীর একে অন্যের প্রতি শরাঘাতে ব্যস্ত। সেই সময় হঠাৎ অর্জুনের এক তীব্র শরাঘাতে কর্ণ জ্ঞান হারিয়ে মূর্চ্ছিত হলেন। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ধার্মিক যোদ্ধারা রথের ওপর মূর্চ্ছিত শত্রুকে হত্যা করা ধর্মসঙ্গত মনে করতেন না। বিবেকবান অর্জুন তাই অপেক্ষা করছিলেন কর্ণের জ্ঞান ফিরে আসার। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে বিবেকের চেয়ে বাস্তব অনেক বেশী মূল্যবান। তিনি জানতেন জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর রণক্ষেত্রে কর্ণ ভীষণ মূর্তি ধারণ করবেন এবং ইতিমধ্যেই অর্জুন কর্ণ-শরে বহুবার বিপর্যস্ত হয়েছেন। বাস্তব প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধীমান পুরুষটি তাই আর দেরী না করে তৎক্ষণাৎ কর্ণকে মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই হত্যা করার জন্য অর্জুনকে প্ররোচিত করতে লাগলেন। কৃষ্ণ জানতেন সুযোগ বার বার আসেনা, আর এই সুযোগ ব্যর্থ হলে পরে কোন সুযোগ

পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। সুযোগ সন্ধানী কৃষ্ণ তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য অর্জুনকে বললেন,—হে অর্জুন তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ? পণ্ডিতেরা দুর্বল আরতিদিগকেও নিধন করিতে কাল প্রতীক্ষা করেন না। তাহারা বাসনা নিমগ্ন শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম ও কীর্তি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীর-প্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও। তুমি নমুচিনিসূদন পুরন্দরের ন্যায় সত্বর উহাকে শরবিদ্ধ কর নচেৎ ঐ বীর অবিলম্বে পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক তোমার অভিমুখীন হইবে।

কৃষ্ণবাক্যে উত্তেজিত অর্জুন তৎক্ষণাৎ কর্ণের ওপর শর বর্ষণ করতে শুরু করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কর্ণের সাময়িক মূর্চ্ছা কেটে-গিয়ে জ্ঞান ফিরে এসেছিল। তিনিও তাই যথাযথ ভাবেই অর্জুনের শরাঘাতের যোগ্য উত্তর দিতে লাগলেন বিভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করে। কিন্তু হঠাৎ এই দ্রুত যুদ্ধের মধ্যে শল্যের ভ্রান্ত রথ পরিচালনায় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গেল! হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রের বিরাট ভূখণ্ডের কোন অংশে মাটি জলে ভিজে নরম হয়েছিল এবং শল্য তা না জেনে সেই স্থানের ওপর দিয়ে রথ চালানোর চেষ্টা করায় রথের বিরাট চাকা গভীরভাবে মাটিতে বসে যায়। বর্ণনানুযায়ী মনে-হয় যেস্থানে কর্ণের রথের চাকা বসে গিয়েছিল সেই স্থানের মাটি ফাঁপা ছিল। সেইজন্যই কর্ণের মত বলশালী পুরুষও অনেক চেষ্টা করেও সেই রথের বিশাল এবং ভারী চাকা মাটির করাল গ্রাস থেকে টেনে বের করতে পারে নি। ব্রহ্মশাপে বসুন্ধরার কর্ণের রথচক্র গ্রাস করার প্রচলিত গল্প তৎকালীন ধর্মভীরু সমাজের বহু অলৌকিক ঘটনার মতই কর্ণের মত মহাবীরের প্রতি একটি অলৌকিক সমবেদনা জ্ঞাপন, পরাজিত হতমান নায়কের প্রতি শেষ সমবেদনার আত্মপ্রবঞ্চনা।

কর্ণের রথের ডানদিকের চাকা মাটিতে বসে গেলেও কিন্তু কৃষ্ণের উত্তেজিত বাক্যে প্ররোচিত অর্জুন যুদ্ধ বন্ধ করেননি। ক্রমাগত শর বর্ষণ করে গেছেন ভূতলগত কর্ণের প্রতি। কর্ণ অস্ত্র পরিত্যাগ করে

রথের চাকা মাটি থেকে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নিয়মানুযায়ী সেইসময় যুদ্ধ বন্ধ থাকার কথা; কর্ণ অর্জুনের কাছে কয়েক মুহূর্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করেও ছিলেন কিন্তু কৃষ্ণের জন্য কর্ণের সেই আবেদন অর্জুন প্রত্যাখ্যান করেছেন। সাধারণ অবস্থায় হয়ত অর্জুন এরকম আবেদনে সাড়া দিতেন কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের যাতে এরকম মানসিক দৌর্বল্য না ঘটে সেইজন্য অর্জুনকে কৃষ্ণ আগেই কর্ণের বিরুদ্ধে ঘৃণায় উত্তপ্ত করে রেখেছিলেন। কর্ণের সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ রাখার আবেদনের উত্তরে কৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা কর্ণের বিরুদ্ধে অর্জুনকে পুনর্বার উত্তেজিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন—হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুষ্কর্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করেনা। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে যখন সভায় আনয়ন করিয়াছিল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহ মধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে, 'হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিকে বরণ কর', এইকথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য ব্যক্তিরা তাহাকে নিরপরাধ ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি কন্যালোভে শকুনিকে আশ্রয়পূর্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম

কোথায় ছিল ? যখন তুমি মহারথগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টনপূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? হে কর্ণ! তুমি যখন তৎকালে অধর্মানুষ্ঠান করিয়াছ তখন আর এ সময় ধর্ম ধর্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে ?

কর্ণ ছিলেন মহাবীর, সূক্ষ্ম বাক্যের মার প্যাঁচে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না, থাকলে অর্জুনকে উত্তেজিত করার জন্য কৃষ্ণের অর্থহীন অভিযোগসমূহের যোগ্য প্রত্যুত্তর সূক্ষ্ম ধর্মীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে দিতে পারতেন। তিনি নিজে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু অন্য কারো মনের ধর্মীয় শোষণে অভ্যস্ত ছিলেন না। কৃষ্ণের কথায় কর্ণ বুঝলেন যে তাঁর আবেদনে কেউ সাড়া দেবেন না, তিনি তাই বৃথা বাক্য ব্যয় না করে অচল রথের ওপরে আরোহণ করেই যুদ্ধ করতে লাগলেন। আর কৃষ্ণ সমানে অর্জুনকে উৎসাহিত করতে লাগলেন কর্ণের বিরুদ্ধে— 'হে পার্থ! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্বক সূতপুত্রকে বিনাশ কর' প্রভৃতি কথা বলে। একজনের রথের চাকা নিশ্চল, অন্যজনের রথ গতিতে পূর্ণ। এই অসম যুদ্ধে কর্ণ দীপ্তভাবে লড়াই করে তীব্র এক শরের দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করলেন। শরাঘাত সহ্য করতে না পেরে অর্জুন মূর্চ্ছিত হলেন। অর্জুনকে রথের ওপর মূর্চ্ছা যেতে দেখে কর্ণ আবার নিশ্চল রথ থেকে নেমে রথের বসে যাওয়া চাকা টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে অর্জুন জ্ঞানলাভ করেই কর্ণের প্রতি এক মহাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। ঐ মহাস্ত্র রথচক্র উদ্ধারে ব্যস্ত কর্ণকে আচমকা আঘাত করে তাঁর জীবনদীপ নিভিয়ে দিল।

যে স্বপ্নের সূচনা কৃষ্ণ করেছিলেন কৌরবসভায় দৌত্যপ্রয়াসের দ্বারা, কর্ণের মৃত্যুতে সেই বহুলালিত আকাঙ্ক্ষার দ্বারপ্রান্তে এসে তিনি উপস্থিত হলেন। শেষ প্রবলশত্রু কর্ণকে নিহত করা কৃষ্ণের সচেতন রাজনীতি ও রণনীতির আর একটি উদাহরণ। কর্ণ বাক্য-বিন্যাসে পটু ছিলেন না, থাকলে তিনি কৃষ্ণকে দ্রোণাচার্য্যের হত্যায় কৃষ্ণের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন, তাহলে অর্জুনের মনেও

হয়ত কোনরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারত। যার দ্বারা যুদ্ধের ফলাফল প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কর্ণ তা পারেন নি, কর্ণের সেই ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েছেন কৃষ্ণ। কর্ণবধে কৃষ্ণের বৃহৎ জয় হলেও কর্ণের শেষ সময়ের রণবিরতির আবেদনে সাড়া না দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্ণের পক্ষে এক শিষ্টাচার বিরোধী দৃষ্টিকটু হীনমন্যতা। একজন বীরের প্রতি আর একজন বীরের অনুরোধ রক্ষা করাই বীরত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কৃষ্ণ বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী রণবিশারদ একজন রাজনীতিক। তাই তিনি অনায়াসে নিজের দূরদৃষ্টির দ্বারা শিষ্টাচার ও বীরত্বের ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় যুক্তির স্রোত দেখিয়ে অর্জুনকেও কর্ণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পেরেছেন।

কৌরবপক্ষে দুর্যোধনের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন কর্ণ। অন্য মহারথীদের পাণ্ডবদের প্রতি যে দুর্বলতা ছিল কর্ণের তা ছিল না। সেইজন্য মানসিক দিক থেকে রাজা দুর্যোধন কর্ণের প্রতি যতটা নির্ভরশীল ছিলেন ততটা আর কারো প্রতি ছিলেন না। কর্ণের বীরত্বের প্রতি দুর্যোধনের অগাধ আস্থা ছিল। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের খুঁটি ছিলেন কর্ণ। কর্ণের বলে বলীয়ান হয়েই দুর্যোধন পাণ্ডুর পুত্রদের এত তাচ্ছিল্য জ্ঞান করতেন। কৃষ্ণ যখন অর্জুনকে কর্ণের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করছিলেন, ঐ দুরাত্মা সূতপুত্রই তৎসমুদয়ের মূল বলে তখন কৃষ্ণ একেবারে অমূলক কথা বলেননি। হয়ত ক্রোধে কৃষ্ণের বক্তব্যে কিছু অতিরঞ্জন ছিল, কিন্তু তাই বলে কর্ণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণের অভিযোগের পুরোটাই অসত্য নয়। হয়ত কর্ণ সবসময় পাণ্ডবদের বা অর্জুনের বিরুদ্ধে দুর্যোধনকে সরাসরি প্ররোচিত করেননি, কিন্তু তাহলেও কর্ণ কখনও দুর্যোধনের আবেগ বা উত্তেজনাপ্রসূত কোন কাজে বাধা প্রদান করেননি। দুর্যোধনের পাণ্ডববিরোধী শক্তিসমূহের মূল উৎস ছিলেন কর্ণ। কৃষ্ণের দূরদৃষ্টি এই সারসত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছিল। কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন দুর্যোধন ও কৌরবপক্ষের হৃৎপিণ্ড

কর্ণ। শরীর থেকে হৃৎপিণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে জয় অবশ্যম্ভাবী। আগাগোড়া কৃষ্ণের তাই লক্ষ্য ছিল জয়লাভের দিকে। শত্রুর হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে কৃষ্ণ সেই কঠিন কাজটি করেছেন পারদর্শী শল্যচিকিৎসকের মতই। অর্জুন বড় যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ যদি, "হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তক ছেদন কর", বলে ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশটি দিতে না পারতেন তবে অর্জুনের বীরত্ব কতখানি কার্যকরী হত বলা কঠিন।

কর্ণ বধ কৃষ্ণের জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কর্ণের মৃত্যু থেকেই কৌরবপক্ষের প্রকৃত পরাজয়ের শুরু। দ্রোণ বা ভীষ্মের মৃত্যুতে কৌরবপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতি হলেও কৌরবপক্ষের মনোবল অটুট ছিল। দুর্যোধনের পরিচালনায় ও কর্ণের ভরসায় কৌরবরা পরম উৎসাহে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন, একটুও মনোবল না হারিয়ে। ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যুকে তাঁরা যুদ্ধকালীন ক্ষতি বলেই স্বীকার করেছেন। জয়লাভের আশা কৌরবদের অন্তরে কর্ণের মৃত্যু পর্যন্ত বেশ ভালভাবেই জাগরুক ছিল। কিন্তু কর্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই জয়াশা বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলিয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডহীন, মনোবল-হীন কৌরবেরা ভীত হয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে শুরু করেন।

কর্ণকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কৃষ্ণ কূটনীতির দ্বারা জয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু না পেরে পাণ্ডবদের সঙ্গে কর্ণের সম্পর্কের গোপন কথা প্রকাশ করে তাঁর মনের ওপর চাপ দিয়ে তাঁকে আবেগ প্রবণ করে তুলে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কৃষ্ণ কৃতকার্য হননি। কর্ণের তেজস্বী চরিত্র ও কর্ণের ওপর কৌরব-নির্ভরতা অনুধাবন করে কৃষ্ণ প্রথম থেকেই কর্ণকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। যদি কর্ণ যুদ্ধে অর্জুনকে পরাজিত করে নিহত করতে পারতেন তবে কৃষ্ণের চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ হতেন না। কৃষ্ণ অর্জুনের বন্ধু ও ভগ্নীপতি ছিলেন বলে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন তা নয়। তাঁর ক্ষতি হতো

রাজনৈতিক, যে উচ্চ নীতিজ্ঞ ও ধর্মীয় ভাবমূর্তি কৃষ্ণের ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, যে ভাবমূর্তি পরবর্তীকালে কৃষ্ণকে অমরত্ব প্রদান করেছে সেই ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি ব্যাহত হতো এবং পরাজিত বলে বিলুপ্ত হতো। অর্জুনের মাধ্যমে কৌরবদের পরাজিত করে নিজের ধর্মীয় ভাবমূর্তি বিস্তারের ক্ষেত্র হিসাবে যে বিশাল কৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন তিনি ধর্ম সংস্থাপনের নামে দেখছিলেন তা এক নিমেষে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো। অর্জুনের মৃত্যুর পর হতবল পাণ্ডবদের কিছুতেই যুদ্ধজয় সম্ভব হতো না এবং দুর্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির কি করতেন বলা কঠিন। কৃষ্ণ তাঁকে কোনো মতেই নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন না। অপরপক্ষে অর্জুনের মৃত্যুতে উৎসাহিত কৌরবদের হাত থেকে কৃষ্ণের নিজেকে বাঁচানো মুশকিল হতো এবং এইভাবে তাঁর নিজের অস্তিত্বও বিপন্ন হতো। অর্জুনকে পরাজিত করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী কৌরব-দের ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতার গর্ব আরো বেশী করে প্রকটিত হতো এবং কৃষ্ণ কৌরবঅনুগত যেসব রাজার ওপর নিজের প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরাও কৃষ্ণের সেই প্রভাব বিস্মৃত হতেন। ফলে কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে যে সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করছিলেন তা লুপ্ত হয়ে যেতো এবং কংস বিনাশকারী ও জরাসন্ধ হত্যাকারী কৃষ্ণের ধর্মীয় ও নীতিজ্ঞ ভাবমূর্তি সর্বভারতে প্রচার লাভ করতে পারত না। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের মতন রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতার বিস্তার চাননি। প্রাথমিকভাবে দ্বারকায় নিজেকে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করার পর তিনি চেয়েছিলেন জনমানসে নিজের এমন এক ভাবমূর্তি যা একজন সাধারণ রাজার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধার ও দীর্ঘস্থায়ী। সেইজন্যই পাণ্ডবদের বিজয় তাঁর পক্ষে এতো অপরিহার্য ছিল, কারণ পাণ্ডবদের তিনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। যদি কৌরবরা সত্যিই বিজয়ী হতেন এবং যদি কৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্যের দ্বারা কৌরবদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেনও তবু কৃষ্ণকে সেই ক্ষুদ্র দ্বারকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো, যুদ্ধ বিজয়ের কোনো গৌরব তিনি লাভ করতেন না। জন-

সাধারণ যুদ্ধবিজয়ী কৌরবদেরই সমস্ত গৌরব অর্পণ করত, বাকী সবাই বিস্মৃতির অন্ধকারে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। কিন্তু তা হয়নি, কৃষ্ণের মেধা তাঁর সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কৃষ্ণের বুদ্ধিতে অর্জুন কর্ণকে নিহত করতে সক্ষম হয়েছেন। কর্ণের মৃত্যুতে কৃষ্ণের জীবন তাই সাফল্যের এক অভাবনীয় সুযোগের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল। কৌরবপক্ষের শেষ তীব্র প্রতিরোধ অপসারিত হলেন এবং পাণ্ডবদের বিজয় একপ্রকার সুনিশ্চিত হয়ে উঠল। আর কুরুক্ষেত্র বিজয়ী পাণ্ডব ভ্রাতাদের নিয়ন্ত্রণ করে সেই ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষরূপে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন।

পাণ্ডব ভ্রাতাদের ওপর কৃষ্ণের প্রভাব আগেও ছিল, কিন্তু কর্ণের মৃত্যুর পর দুর্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির কৃতজ্ঞতাবশতঃ নিজেকে মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের অধীন করে তোলেন। যুধিষ্ঠির নিজে কর্ণের কাছে পরাজিত হয়ে অপমানিত হয়েছিলেন বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে কর্ণ অপরাজেয়। কিন্তু যখন তিনি কৃষ্ণের মুখে কর্ণের নিধন বার্তা শ্রবণ করলেন তখন বিস্ময়ে আনন্দে যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হল। কৃষ্ণের প্রশস্তি গান করে তিনি নিজেকে কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে ডুবিয়ে দিলেন। এই প্রশস্তি কোন ধূর্ত রাজনীতিকের মৌখিক মন যোগানো কথা নয়। এ এক দুর্বলচিত্ত অক্ষম রাজ্যলোভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। কৃষ্ণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে কর্ণবধের পর যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে যথোপযুক্ত সম্মান সহকারে জানালেন,........আজ ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিপাতিত, আপনি বিজয়প্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজ পৃথিবী সেই সূতপুত্রের শোণিতপান করিতেছে। আপনার সেই শত্রু শরজালে বিভিন্ন কলেবর হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি সমরাঙ্গনে গমনপূর্বক তাহার দুর্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি

আমাদিগের সহিত যত্ন সহকারে এই অরাতিশূন্য পৃথিবী শাসন ও বিপুল সুখভোগ করুন।

কৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠিরের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল, তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি রাজা। আনন্দে কৃষ্ণকে অভিনন্দিত করে যুধিষ্ঠির বলতে লাগলেন—হে দেবকীনন্দন! আজ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি সারথি হওয়াতে ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে। তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সূতপুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।.........হে কৃষ্ণ। কেবল তোমার অনুগ্রহেই ধনঞ্জয় শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। যখন তুমি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন নিশ্চয় আমাদিগের জয়লাভ হইবে, কখনই পরাজয় হইবে না। হে গোবিন্দ! তোমার বুদ্ধিকৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের এই ভাবোচ্ছাস আন্তরিক, কারণ কর্ণকে তিনি প্রকৃতই ভয় পেতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কর্ণ বধের দ্বারা কৃষ্ণ তাঁর ও তাঁর ভাইদের কি অসীম উপকার করেছেন।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনে কর্ণভীতি এতই দৃঢ় ও প্রবল ছিল যে রণক্ষেত্রে স্বচক্ষে কর্ণের মৃতদেহ দর্শন না করা পর্যন্ত তাঁর অশান্ত হৃদয় শান্ত হচ্ছিল না। যুধিষ্ঠির তাই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নিয়ে রণক্ষেত্রে যেখানে কর্ণের প্রাণহীন শরীর পড়েছিল সেখানে গেলেন। গিয়ে কর্ণের স্পন্দনহীন দেহ খুব ভালভাবে বারবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন যে কর্ণ তাঁর জীবন ফিরে পেয়ে পুনর্বার পাণ্ডবদের সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ করতে পারবেন না। সেই মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের চেয়ে পৃথিবীতে বোধহয় আর কেউ সুখী ছিলেন না। অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করেছেন সেই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আবার যুধিষ্ঠির প্রশস্তিবাণী বর্ষণ করতে লাগলেন বর্ষার জল-ধারার মত—হে গোবিন্দ! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজ আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজ দুরাত্মা দুর্য্যোধন

সূতপুত্রের নিধন নিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে নিরাশ হইবে। আজ কেবল তোমার অনুগ্রহেই আমরা কৃতকার্য হইলাম। আজ ভাগ্যক্রমে শত্রু নিপাতিত হইল এবং ধনঞ্জয় ও তুমি তোমরা উভয়েই বিজয়ী হইলে। আমাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর অতিকষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে ; একদিন-ও নিদ্রা হয় নাই। আজ তোমার অনুগ্রহে নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

কৃষ্ণের অনুগ্রহে যুধিষ্ঠির নিদ্রাসুখ অনুভব করেছেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছেন রাজ্য আর নিজের জন্য নিয়েছেন অমরত্বের ছাড়পত্র। সাধারণ এক রাজ্যলোভী রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন অকস্মাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে আকাঙ্ক্ষিত রাজ্য হস্তগত করা মাত্র। কিন্তু ঠিক তখনি শুরু হয়েছে কৃষ্ণের অন্য চিন্তা। যুধিষ্ঠিরের যেখানে শেষ কৃষ্ণের সেখানে শুরু। যুধিষ্ঠির পার্থিব ভোগের সাধারণ সামগ্রী সমূহেই খুশি। সাধারণ মানুষের মতই শত্রুর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁর আনন্দ, যুদ্ধবিজয়ে মনের তৃপ্তি, নিদ্রায় শান্তি। এর বেশী কিছু যুধিষ্ঠিরের জানা নেই। মহাভারতের যুদ্ধবিজয়ী রাজা যুধিষ্ঠির তাই কখনই প্রথম শ্রেণীর মানুষ হয়ে ওঠেননি, তিনি সবসময়েই তৃতীয় শ্রেণীর।

অন্যদিকে কৃষ্ণ পার্থিব সুখসমূহ ত্যাগ করেছেন অপার্থিব অমরত্বের জন্য। শত্রুকে নিপাতিত করে নিজের কর্ম করাই কৃষ্ণের ধর্ম। তাই তিনি কর্মে অবতীর্ণ হয়েছেন পার্থিব ফলের প্রতি কোন আসক্তি না রেখেই। অপার্থিব কর্মে তিনি উজ্জ্বল, একক, সূর্য্যের মতই ভাস্বর।

কৃষ্ণের জীবনে কংস ও জরাসন্ধ বধের ঘটনা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, কর্ণ বধের ঘটনা ঠিক ততটাই বা তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কংস বধে কৃষ্ণের ভূমিকা ছিল পরিত্রাতার। অসহায় দুর্বল প্রজাকুলের অন্তরের বিক্ষোভকে রূপদান করে অত্যাচারী রাজার হাত থেকে তাদের রক্ষা করে তিনি নিজেকে যে রাজনৈতিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কৌশলে জরাসন্ধকে বধ করে কৃষ্ণ তাঁর সেই ভূমিকাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কর্ণের মৃত্যুতে কৃষ্ণের এই অধর্ম প্রতিরোধী রাজনৈতিক ভূমিকা বিস্তারের এক ব্যাপক সম্ভাবনার সন্ধিক্ষণে উপনীত

হল। পাণ্ডব ভাইদের সঙ্গে শেষমুহূর্তে নিজের ভাগ্য জড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন বলেই কর্ণের মৃত্যু কৃষ্ণের জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কৌরবসভায় কৃষ্ণের দৌত্যপ্রয়াস সফল হত তাহলে তিনি কুরু • পাণ্ডব উভয়পক্ষেরই বন্দিত নায়ক রূপে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তা হয়নি বলেই কৌরব বাধা অতিক্রম করার জন্য কৃষ্ণের এই আপ্রাণ প্রচেষ্টা। কৃষ্ণের পরিচালনায় ও কৃষ্ণের বুদ্ধি-কৌশলে কর্ণের প্রাণ নিয়ে অর্জুন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকে সেই আসনে স্থাপন করেছেন যেখানে উচ্চতা পরিমাপ করা যায় না এবং মানুষ মানুষকে সেই স্থানে দেখতে অভ্যস্ত নয়। মনুষ্যত্বের গণ্ডি পেরিয়ে সংরক্ষিত সেই অঞ্চলে কেবল অতিমানবদেরই প্রবেশাধিকার এবং অস্থি, মজ্জা ও শোণিতবাহী কোন শরীর কেউ কখনও কল্পনা করে না।

নয়

কর্ণের মৃত্যুর পর বিজয় করায়ত্ত করতে পাণ্ডবদের আর অতি সামান্যই বাকী ছিল। কর্ণের মৃত্যুতেই পাণ্ডবেরা প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু বিজয় হস্তগত দেখেও কৃষ্ণ তাঁর ভূমিকা পালনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নি। যে পর্যন্ত না কৌরব-নায়ক দুর্যোধনের পতন ঘটেছে এবং পূর্ণ বিজয় করায়ত্ত হয়েছে ততক্ষণ কৃষ্ণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি কৌরবপক্ষের অবশিষ্ট প্রতিটি মহাবীরের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরেনি। কৃষ্ণ জানতেন কৌরবরা পরাজিত হয়ে শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন, এই অবস্থায় তাঁদের অবহেলা করলে তাঁরা যে কোন সময়ে মরণকামড় দিতে পারেন। পতনের আগে একবার চরম আঘাত দেওয়ার শেষ চেষ্টা তাঁরা করবেনই। তাই সদাসতর্ক থেকে তাঁদের সেই সুযোগ পেতে না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কর্ণের মৃত্যুজনিত প্রথম আঘাত সামলিয়ে উঠে কুরুরাজ দুর্যোধন বন্ধু ও অমাত্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরবর্তী যুদ্ধকৌশল রচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি পদে নির্বাচন করলেন। মদ্ররাজের তেজোদীপ্ত বাক্যে হতমান কৌরবসেনারা উজ্জীবিত হয়ে উঠে নব উদ্যমে পাণ্ডবপক্ষকে শেষ আঘাত দেবার জন্য প্রস্তুত হল।

মদ্ররাজ শল্য ছিলেন মহাবীর, তাঁর তুল্য রণনিপুণ মহারথ সেই সময়ে সমগ্র ভারতে খুব কমই ছিলেন। তার ওপর তিনি ছিলেন পাণ্ডব ভ্রাতাদের মাতুল। কৃষ্ণ তাই চিন্তায় পড়লেন। একে তো শল্য রণ কৌশলে অদ্বিতীয় তার ওপর মামা বলে যদি যুধিষ্ঠির বা অন্য পাণ্ডব ভাইয়েরা দুর্বলতা প্রকাশ করে ঠিকমত যুদ্ধ করতে না পারেন তাহলে কি ঘটবে বলা যায় না। শেষ মুহূর্তে কোন অঘটন ঘটতে দিতে কৃষ্ণ নারাজ। কৃষ্ণের সবচেয়ে বেশী চিন্তা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে কারণ পাণ্ডব

ভাইয়েদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরই সবচেয়ে বেশী দুর্বল মানসিক ভাবে। মনস্তত্ত্ববিদ কৃষ্ণ তাই মদ্ররাজ শল্যের সেনাপতির পদ গ্রহণের খবর শোনামাত্র কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। তিনি ঠিক করলেন যুধিষ্ঠিরকেই পাঠাবেন মদ্ররাজ শল্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার দরুন ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে জেষ্ঠ্য পাণ্ডবের কোন চিত্তবৈকল্য ঘটার অবকাশ থাকবে না এবং শল্য কোনরকম সুযোগ নিতে পারবেন না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মত দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি শল্যের মত মহারথীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মোটেই প্রস্তুত নন, অস্ত্রশিক্ষা তাঁর যতই থাকুক না কেন। কৃষ্ণ তাই যুধিষ্ঠিরের মন প্রস্তুত করতে লাগলেন মদ্ররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ঠিক যেভাবে তীক্ষ্ণধী পুরুষটি অর্জুনের মন তৈরী করেছিলেন কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে। শল্যের বিভিন্ন গুণাবলীর বর্ণনা করে কৃষ্ণ সেনাপতি হিসাবে শল্যের গুরুত্ব বুঝিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—হে মহারাজ! আমি মহাত্মা মদ্ররাজকে বিশেষরূপ অবগত আছি। ঐ বীর বিপুল বলশালী, মহাতেজস্বী, বিচিত্র যোদ্ধাও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার বোধ হয় উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাহাদের অপেক্ষা সমধিক রণ বিশারদ। উহার তুল্য যোদ্ধা আর কাহাকেও লক্ষিত হয় না। উনি শিখণ্ডি, অর্জুন, ভীম, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং হস্তী ও সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত। উনি যুদ্ধকালে নির্ভীক চিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! আজ এই ত্রিলোক মধ্যে আপনি ভিন্ন উহার সহিত যুদ্ধ বা উহাকে বিনাশ করিতে পারে এমন আর কাহাকেও দেখিতেছিনা। হে মহারাজ। মদ্রাধিপতি দিন দিন আপনার বল সমুদয় বিক্ষোভিত করিতেছেন; অতএব পুরন্দর যেমন শম্বরাসুর ও নমুচিকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উহাকে বিনাশ করুন। দুর্যোধন উহাকে অজেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর নিহত হইলে নিশ্চয়ই সমুদয় কৌরবসৈন্য বিনষ্ট ও আপনার জয়লাভ

হইবে। হে মহাত্মন! মাতুল বলিয়া মদ্ররাজকে দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ক্ষাত্রধর্মানুসারে উঁহার অভিমুখে গমন করিয়া উঁহাকে বিনাশ করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে শল্যরূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্রবীর্য আছে এক্ষণে সমরাঙ্গনে তৎসমুদয় প্রকাশ করুন।

কৃষ্ণের বাক্যে যুধিষ্ঠিরের মনে বীরভাব জেগে উঠল এবং তিনি দুর্বলতা পরিহার করে মদ্ররাজের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ যেভাবে যুধিষ্ঠিরকে শল্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করে তোলেন তা অতুলনীয়। শুধু মনের শক্তির জোরেই অতি দুর্বল ব্যক্তিও যে কত কঠিন কাজে সাফল্য লাভ করে যুধিষ্ঠির তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত সময়ে ঠিকভাবে ব্যবহার করা কৃষ্ণের সময়জ্ঞান ও মন-বিশ্লেষণ শক্তির বহু উদাহরণের একটি। আর কৃষ্ণের বাক্যবিন্যাসও অতুলনীয়। প্রথমে তিনি মদ্ররাজ শল্যের বীরত্বের প্রশংসা করে যুধিষ্ঠিরকে ভয় পাইয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির বুঝলেন শল্যকে যতটা গুরুত্বহীন মনে হচ্ছিল তিনি ততটা গুরুত্বহীন নন। তারপর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের বীরত্বের প্রশংসা করে যুধিষ্ঠিরকে এক মহান্ বীরে পরিণত করলেন যাতে যুধিষ্ঠির প্রশংসা বাক্যে সাহস পেয়ে নিজেকে শল্যের সমকক্ষ যোদ্ধা বলে মনে করেন। কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহিত করে শল্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো। তাঁর সে উদ্দেশ্য শতকরা একশোভাগ পূর্ণ হয়েছে।

কৃষ্ণ-বাক্যে গর্বিত যুধিষ্ঠির নিজেকে শল্যের সমকক্ষ জ্ঞান করে মদ্র-রাজকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। মদ্ররাজ শল্য ছিলেন মহাবীর, সেই সময়ের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর নাম একসাথে উচ্চারিত হত। তিনিও শেষ চেষ্টা করার অভিপ্রায়ে মরিয়া হয়ে যথাসাধ্য যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের অস্ত্রশিক্ষা ভালই ছিলো। দ্রোণাচার্য বহু যত্নে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইদের যুদ্ধবিদ্যার অনেক গুপ্ত কৌশল শিখিয়ে ছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মন দুর্বল থাকায় তাঁর নিজের ওপর আস্থা ছিল না। নিজের ওপর আস্থাহীনতার জন্য

যুধিষ্ঠির তাই আগে কোন যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কৃষ্ণও অর্জুনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে যুধিষ্ঠিরকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করতে পারেননি। কিন্তু এখন কৃষ্ণের জ্ঞাতৃবাক্যে উদ্দীপ্ত যুধিষ্ঠির শল্যকে বিপুল বিক্রমে আক্রমন করে চমৎকৃত করে দিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই বিক্রম ও উদ্দীপনা শল্যের ধারণার বাইরে ছিল। যুদ্ধের প্রথম চমক কেটে গেলে শল্য নিজ বিক্রম প্রকাশ করতে শুরু করলেন। শল্যের বিক্রম দেখে যুধিষ্ঠিরের চিত্ত ক্ষণকালের জন্য আবার আস্থাহীন হল এবং সেই সুযোগে এক তুমুল যুদ্ধে মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করলেন।

কিন্তু কৃষ্ণের উৎসাহবাক্য সত্যিই যুধিষ্ঠিরের মনের গভীরে কাজ করেছিল। শল্যের কাছে পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের মনোবল আরো দৃঢ় হয়ে উঠল এবং তিনি শল্য-পরাজয়ে কৃতসংকল্প হয়ে গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে শেখা অস্ত্রবিদ্যা পুঁজি করে নবদ্যমে আবার শল্যের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শল্য আবার চমৎকৃত হলেন এক পরিবর্তিত নতুন যুধিষ্ঠিরকে রণক্ষেত্রে দেখে। দুই বীর একে অন্যের প্রতি শরাঘাত করে পরস্পরকে ব্যথিত ও রুধিরাক্ত কলেবর করে তুললেন। মহাবীর শল্য অনবরত শরবর্ষণ করে যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করতে লাগলেন এব যুধিষ্ঠিরও পাল্টা শরাঘাত করে তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন। কিন্তু মহাবীর মদ্ররাজ ক্রোধে শর নিক্ষেপ কালে নিজের প্রতি এতই আস্থাশীল ছিলেন যে নিজের উপযুক্ত রক্ষার দিকেও তিনি নজর দেননি। নিজেকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখেই তিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। এ রকম এক সুযোগের অপেক্ষাতেই যুধিষ্ঠির ছিলেন। যে মুহূর্তে তিনি দেখলেন শল্য তাঁর কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত তৎক্ষণাৎ এক মহাস্ত্র গ্রহণ করে যুধিষ্ঠির শল্যের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। খোলা দরজা দিয়ে হঠাৎ ঢোকা ঝোড়ো হাওয়ার মত সেই মহাস্ত্র আচমকা মদ্ররাজ শল্যের জীবন বায়ু নির্গত করে দিল এবং তিনি রথ থেকে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে রইলেন।

কৃষ্ণ যা চেয়েছিলেন তাই হল। কৌরব পক্ষের শেষ প্রতিরোধের দুর্গ চূর্ণ হল। মামা বলে মদ্ররাজ শল্যকে যুধিষ্ঠির দয়া না করে হত্যা করলেন। কৃষ্ণের বুদ্ধির প্রভাবেই পাণ্ডব কুল এই বিজয়ের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। সাধারণ মানুষের মনের দুর্বলতম স্থানগুলি সম্বন্ধে কৃষ্ণের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গভীর ছিল বলেই কৃষ্ণ অনুমান করতে পেরেছিলেন যে যুধিষ্ঠির কোন্ সময়ে কোন্ জায়গায় দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন। সেইজন্যই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মনের সেই দুর্বল স্থানটির প্রতি সর্তক দৃষ্টি রেখেছেন এবং মামার প্রতি ভাগ্নের শ্রদ্ধাজনিত দুবলতার বিরুদ্ধে বার বার সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছেন। যুধিষ্ঠির তাঁর নিজের মনকে যতটা না জানতেন কৃষ্ণ তার চেয়ে অনেক বেশী যুধিষ্ঠিরের মনকে অনুধাবন করেছিলেন। কাদার মত নরম সেই মনকে কৃষ্ণ তাঁর আপন ছাঁচে ফেলে উত্তেজক বাক্য দিয়ে পুড়িয়ে এক নতুন কঠিন যুধিষ্ঠির তৈরী করেছিলেন। সেই নতুন যুধিষ্ঠিরের সাফল্যে তাই সবাই অবাক হলেও কৃষ্ণের কাছে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু ছিলনা। কৃষ্ণ জানতেন সাফল্য আসবেই, ঠিক পথে এগোলে সবাই সাফল্য লাভ করে থাকে. যুধিষ্ঠিরও তার ব্যতিক্রম নন।

শল্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্তির শেষ ধাপে এসে পৌঁছলেন. আর কেবল মাত্র বাকী রাজা দুর্য্যোধন। কিন্তু তার জন্য যুধিষ্ঠিরের চিন্তা করার প্রয়োজন কি, চিন্তা তো তিনিই করছেন যাঁর নাম কৃষ্ণ। আর সর্বস্ব হারিয়ে বন্ধু আত্মীয় অমাত্যহীন রাজা দুর্য্যোধন একা কিই বা করতে পারেন, পাণ্ডবেরা তাই নিশ্চিত রাজ্য প্রাপ্তির আশায় আনন্দে মশগুল হলেন। কিন্তু কৃষ্ণ জানতেন শত্রুর শেষ রাখতে নেই, তাই তাঁদের মত কৃষ্ণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে পারলেন না। শেষ প্রবল শত্রুকে নিয়ে কৃষ্ণ তাই চিন্তিতই রইলেন।

দশ

যে রণক্ষেত্রে শল্য নিহত হন, সেই রণক্ষেত্রে মহারাজ দুর্যোধনও যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধের অবস্থা দেখে পরিশ্রান্ত রাজা দুর্যোধন বুঝলেন যে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে জয়লাভ আর সম্ভব নয়। শকুনির মৃত্যুর পর দুর্যোধনের এই ধারণা দৃঢ় হল। হতাশ ও ক্লান্ত রাজা দুর্যোধন তাই আর যুদ্ধ করা অর্থহীন বিবেচনা করে ভগ্নচিত্তে রণস্থল পরিত্যাগ করে রণস্থলের নিকটেই এক হ্রদে শ্রমোপনদনের জন্য প্রবেশ করলেন। যুদ্ধে দুর্যোধন খুবই ক্লান্ত হয়েছিলেন তাই হ্রদের নির্মল জলে অবগাহন করে তিনি ক্লান্তি দূর করতে লাগলেন।

কিন্তু শকুনির মৃত্যুর পর রণস্থলে দুর্যোধনকে না দেখে পাণ্ডবদের ধারণা হল, দুর্যোধন ভয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করেছেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে দুর্যোধন তা করেননি। পাণ্ডবদের এই ধারণায় ইন্ধন জোগালেন কৃষ্ণ, তিনি বোঝালেন দুর্যোধনকে এখনই খুঁজে বের করে হত্যা করা উচিত, তাঁকে কোনমতেই পালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। আসলে কৃষ্ণ চেয়েছিলেন বিজয়ের উদ্দীপনা ও ক্রোধ থাকায় থাকতে থাকতেই কুরুপাণ্ডব বিরোধের মূল শত্রুকে নিধন করতে। কৃষ্ণের আশঙ্কা ছিল বিজয় লাভের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে যদি পাণ্ডব ভ্রাতারা দুর্যোধনের প্রতি কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ করে তাঁকে জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, অথবা দুর্যোধন যদি সত্যিই পালিয়ে যান? এই সর্বনাশা ভুল যাতে না হয় তার জন্যই কৃষ্ণের দুর্যোধন বধে এত উৎসাহ। কৌরব সভায় কৃষ্ণের সমস্ত কূটনৈতিক ব্যর্থতার মূল দুর্যোধন, একথা কৃষ্ণ কখনও ভোলেননি। গুরুত্বের বিচারে দুর্যোধন ছিলেন কৃষ্ণের এক নম্বর শত্রু এবং কর্ণ দু নম্বর। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের শত্রুতার কোন রাজনৈতিক

কারণ ছিল না। কর্ণ বড় যোদ্ধা ছিলেন বলে পাণ্ডব পক্ষের বিপদ হতে পারেন, তাই কৃষ্ণের সঙ্গে কর্ণের সামরিক শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল। কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের শত্রুতার সবটাই পাণ্ডব ভ্রাতাদের খাতিরে সৃষ্টি হয়েছিল। কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের নিজস্ব কোন শত্রুতা ছিল না. কিন্তু দুর্যোধনের সঙ্গে কৃষ্ণের শত্রুতার অনেকটাই কৃষ্ণের নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে। রাজা দুর্যোধনই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কৃষ্ণের সমস্ত কূটনৈতিক প্রয়াসের ভিতরে সুপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করে বাধার প্রাচীর তুলে সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করেছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের বিরোধ দুই উচ্চাকাঙ্ক্ষীর ব্যক্তিত্বের সংঘাত। এই বিরোধ রাজনৈতিক, কারণ শুধু রণক্ষেত্রেই এই বিরোধ সীমাবদ্ধ ছিলনা এবং রণক্ষেত্রে এর সৃষ্টিও নয়। কৃষ্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের শত্রুতার শুরু কৌরব সভায় কৃষ্ণের সন্ধির প্রস্তাব বাধা হওয়ার পর থেকে। সভায় উপস্থিত সবাই প্রায় কৃষ্ণের কথা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলেন একমাত্র রাজা দুর্যোধন। দুর্যোধনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৃষ্ণের মনে যে অপমানের আগুন জ্বলেছিল, সযত্নে রক্ষিত সেই অগ্নিকে নির্বাপনের প্রথম সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে চাইলেন। অবশ্য নিছক অপমানের তাগিদেই কৃষ্ণ সুযোগ পাওয়া মাত্র দুর্যোধনের জীবন হরণের জন্য ব্যস্ত হননি। তুচ্ছ মান-অপমানের চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বড় ছিল রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

কৃষ্ণের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক মেধা যেমন তীক্ষ্ণ ও গভীর ছিল ঠিক তেমনই দুর্যোধনের ব্যক্তিত্বও ছিল লৌহের মত দৃঢ় ও কঠিন। রাজনীতি ও কূটনীতির সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচে পারদর্শী রাজা দুর্যোধন ছিলেন সর্ব-অর্থে প্রকৃতই এক লৌহ-কৌরব। কূটনীতির খেলায় তিনি কখনই অন্যদের মত আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্যক্তিত্বহীনতার শিকারে পরিণত হননি। কৃষ্ণ কখনও কখনও তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা কূটনীতিতে এগিয়ে গেলে দুর্যোধন পিছিয়ে এসে চুপ করে থেকেছেন এবং সুযোগ

পাওয়া মাত্র আবার কৃষ্ণকে প্রতিহত করে এগিয়ে গিয়েছেন। কূটনীতিতে দুর্যোধনের পরাজয় কখনই হয়নি, কারণ তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব স্ব-বিন্দু থেকে এক চুলও বিচ্যুত হয়নি। অন্যদিকে রাজা দুর্যোধনই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর হতাশা ও মানসিক দুর্বলতা সবচেয়ে কম। কখনও কখনও সব মানুষের মতই তিনিও দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন কিন্তু তা একান্ত-ভাবেই সাময়িক এবং অবস্থার পরিপেক্ষিতে। দুর্যোধনের চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাঁর দৃঢ়তা। রাজকীয় চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি সমস্ত রাজনৈতিক বিপত্তি কাটিয়ে উঠেছেন। জয় কারো চির করায়ত্ত নয়, তাই দুর্যোধনও পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর পরাজয় এসেছে রণক্ষেত্রে। দুর্যোধনের পরাজয় সামরিক, রাজনৈতিক নয়। রাজনীতিতে তিনি হিমালয় এবং কৃষ্ণের মত সুদক্ষ কৌশলী কূটনীতিকও সেই হিমালয় অতিক্রম করতে সক্ষম হননি।

দুর্যোধন হ্রদে বিশ্রাম করছেন খবর পেয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে সদলবলে হ্রদের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণের কথায় উত্তেজিত হয়ে যুধিষ্ঠির হ্রদ মধ্যস্থ দুর্যোধনকে বিভিন্ন অসম্মান জনক উক্তি করে হ্রদ থেকে উঠে এসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে জানালেন যে তিনি পাণ্ডব ভ্রাতাদের ভয়ে হ্রদে প্রবেশ করেননি। রণক্ষেত্রে তাঁর রথ ও তূণীর এবং সমস্ত সৈন্যসামন্ত বিনষ্ট হওয়ায় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্যই তিনি হ্রদে প্রবেশ করেছেন। এখন যুধিষ্ঠিরও কিছুক্ষণ অনুচরদের নিয়ে বিশ্রাম করুন, তারপর বিশ্রাম শেষ হলে তিনি হ্রদ থেকে উঠে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তখন অন্য যুধিষ্ঠির, তিনি অনবরত দুর্যোধনকে গালিগালাজ করে হ্রদ থেকে উঠে এসে অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। দুর্যোধনের মত বীরকে উত্তেজক বাক্যে গালিগালাজ করার একটা বিপজ্জনক দিক আছে, জয়ের আনন্দে যুধিষ্ঠির সেটা ভুলে গিয়েছিলেন। দুর্যোধনের রণনৈপুণ্য কম ছিলনা এবং তিনি পাণ্ডবদের ভয়েও হ্রদের

জলে প্রবেশ করেন নি। যুধিষ্ঠিরের অপমানজনক বাক্য শ্রবণ করে দুর্যোধন জল থেকে বেরিয়ে এলেন। দুর্যোধন হ্রদের জল থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র পাণ্ডব ভ্রাতারা দলবল সমেত দুর্যোধনকে চতুর্দিকে ঘিরে ধরলেন। কিন্তু দুর্যোধনের উপস্থিত বুদ্ধি কিছু কম ছিল না এবং যুধিষ্ঠিরের মন তিনি খুব ভাল করেই জানতেন। দুর্যোধন তাই যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র, রথ ও সৈন্যসামন্ত কিছুই নেই, তিনি নিরস্ত্র, একা। তাঁর মত নিরস্ত্র একক ব্যক্তিকে সবাই মিলে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলে কি করে যুদ্ধ সম্ভব হতে পারে। পরিশ্রান্ত ও বর্মহীন বিপন্ন একা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে একসঙ্গে বহুবীরের যুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত নয়। কাজেই যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইয়েরা প্রত্যেকে একা একজন একজন করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলে তিনি লড়াইয়ে রাজী আছেন।

সুচতুর দুর্যোধন নিজের বলবীর্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং পাণ্ডব ভ্রাতাদের বল সম্বন্ধেও খুব ভাল করে জানতেন। তিনি জানতেন যে দ্বৈরথ যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করার মত বলশালী কোনো পাণ্ডব ভ্রাতাই নন, এমন কি মধ্যম পাণ্ডব ভীম পর্যন্ত তাঁকে পরাজিত করার কথা চিন্তা করেন না। কাজেই একজন একজন করে যুদ্ধ করলে দুর্যোধন অনায়াসে সেই পাণ্ডব ভাইদের পরাজিত করতে পারবেন।

দুর্যোধনের কথা শোনা মাত্র যুধিষ্ঠির অতি সহজেই তৎক্ষণাৎ সেই ফাঁদে পা দিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বা সামরিক কোন দক্ষতাই ছিলনা। একমাত্র একটা ধার্মিক ভাবমূর্তি গড়ে তুলে তিনি কিছুটা রাজনৈতিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। জনসমক্ষে তিনি সব সময়েই নিজেকে একজন বিরাট বড় ধার্মিক রূপে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। এই মিথ্যা অহমিকা বোধেই যুধিষ্ঠির জয়ের চরম মুহূর্তে এক বিরাট বড় ভুল করে বসলেন দুর্যোধনের দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রস্তাবে রাজি হয়ে। কোন রাজনীতিক যাঁর এতটুকু বিবেচনা শক্তি আছে কখনই এরকম ভুল করতেন না। এমনকি সেই মুহূর্তে দুর্যোধন যদি যুধিষ্ঠির হতেন

এবং যুধিষ্ঠির দুর্যোধন তাহলে দুর্যোধন কখনই হতমান শেষ শত্রুকে বেঁচে ওঠার এরকম এক অপূর্ব সুযোগ দিয়ে বাধিত করতেন না।

মূর্খ যুধিষ্ঠির মিথ্যা ধর্মগর্বে আক্রান্ত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন,—হে দুর্যোধন! তুমি ভাগ্যবলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অবগত হইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই তোমার যুদ্ধে বাসনা হইয়াছে; তুমি ভাগ্যবলেই বীর পদবী প্রাপ্ত এবং সমর ব্যাপার সম্যক্ অবগত হইয়া একাকীই আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিতেছ। অতএব অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ পূর্বক আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থান পূর্বক যুদ্ধ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলে সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের অভাবনীয় উদারতায় মনে মনে পুলকিত হলেও জানতেন যে যদি তিনি সত্যি সত্যিই যে কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহ্বান করে পরাজিত ও নিহত করেন এবং যুধিষ্ঠির তা মেনেও নেন তবু কৃষ্ণ কিছুতেই তা মেনে নেবেন না। নকুল অথবা সহদেবের মত পাণ্ডবদের যুদ্ধে নিহত করলে কৃষ্ণের প্ররোচনায় পাণ্ডবরা সমবেতভাবে তাঁকে আক্রমণ করে নিহত করবেন। বিজয় হস্তগত করেও তা হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার মত মূর্খ যুধিষ্ঠির হতে পারেন কিন্তু কৃষ্ণ নন। কৃষ্ণ কখনই এত সহজে আবার দুর্যোধনকে রাজ্যলাভ করতে দেবে না। কূটনীতিতে পটু দুর্যোধন তাই যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব মত শুধু যুদ্ধের জন্য একটি উপযুক্ত গদা নিয়ে বাকীটুকু যুধিষ্ঠিরের ওপরেই ছেড়ে দিলেন।

দুর্যোধন জানতেন যে পাণ্ডবেরা নিজেরাই যদি কাউকে মনোনীত করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য পাঠান তাহলে তাঁকে পরাজিত করলে অবশিষ্ট পাণ্ডব ভাইদের বলার কিছু থাকবে না। কেউ তাঁকে বলতে পারবে না যে তিনি যুধিষ্ঠিরের উদারতার সুযোগ নিয়ে সবচেয়ে দুর্বল পাণ্ডবকে রণে আহ্বান করে অসম যুদ্ধে নিহত করে অন্যায় করেছেন এবং এই অন্যায়ের ছুতোয় পাণ্ডবরা তাঁকে মিলিতভাবে আক্রমণ করতে পারবেন

না। যদিও দুর্যোধনের ধারণা ছিল যে পাণ্ডবরা যে কোন সময়েই কৃষ্ণ কর্তৃক উত্তেজিত হয়ে তাঁকে একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারেন। সুচতুর দুর্যোধন তাই যুধিষ্ঠিরকে বললেন—হে ধর্মরাজ! যদি আমাকে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব; আর তুমি আমাকে যে কোন আয়ুধ মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিতে কহিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত করিলাম। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যিনি আমার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পদচারে আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।......

দুর্যোধনের কথায় যুধিষ্ঠির সম্মত হলেও চমকে উঠলেন কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠিরের এই হঠকারীতা কৃষ্ণের কল্পনার বাইরে ছিল। কৃষ্ণ কখনও ভাবেননি যে যুধিষ্ঠির এত বড় নির্বোধ এবং রাজনীতিজ্ঞানশূন্য। দুর্যোধনকে এই অভাবনীয় সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা অহমিকাবোধে কৃষ্ণ নিজের ভবিষ্যত বিপন্ন দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যে দুস্তর বাধা কৃষ্ণ একের পর এক অতিক্রম করেছেন সুচিন্তিত উপায়ের দ্বারা এবং নিজেকে যেভাবে ধীরে ধীরে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সেই সমস্তই হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের এক মিথ্যা উদারতাপ্রসূত সিদ্ধান্তের জন্য ব্যর্থ হয় দেখে আক্ষেপে তিনি যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের তিরস্কার বাক্য অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে দুর্যোধনকে শত্রু হিসাবে কৃষ্ণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন এবং যুধিষ্ঠিরের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের সঙ্গে কৃষ্ণের নিজের ভাগ্য কতটা জড়িত ছিল। প্রায় প্রত্যেক বীরই তিনি পাণ্ডব অথবা কৌরব হন নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে কখনও না কখনও প্রকাশ্যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন কৃষ্ণ। তাঁর মুখে কখনও নিজের ভবিষ্যত বা স্বার্থ সম্বন্ধীয় কথা প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয়নি। প্রকাশ্যে তিনি সব সময়েই

অন্যের হিত চিন্তায় রত। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত শুনে কৃষ্ণের মত সংযমী মহান্ রাজনীতিকও ক্ষোভে "আমাদিগকেও বিপদসাগরে নিপাতিত করিলেন" বলে আক্ষেপ করে যুধিষ্ঠিরকে দোষারোপ করেছেন। ক্ষুব্ধ কৃষ্ণ উত্তেজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, 'তুমি আমাদিগের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর?' ঐ দুরাত্মা যদি আপনাকে অথবা অর্জুন, নকুল বা সহদেবকে যুদ্ধার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি দুর্দশা হইবে? বোধ হয় আপনারা কেহই উহার সহিত গদাযুদ্ধে সমর্থ নহেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের নিধন বাসনায় ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। অতএব এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের কার্য সম্পন্ন হইবে? আপনি কৃপা পরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত দুর্যোধনের সমকক্ষ আর কেহই নহে। তিনিও দুর্য্যোধনের ন্যায় গদাযুদ্ধ অধিক অভ্যাস করেন নাই। অতএব বোধ হয় পূর্বে শকুনির সহিত আপনার যেরূপ দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীমসেন বলবান ও পরাক্রমশালী, কিন্তু দুর্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী। বলবান ও কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের মঙ্গলপথে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম সংকটে নিপতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও বিপদ সাগরে নিপাতিত করিলেন। কোন ব্যক্তি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া একমাত্র অরাতিকে বহুকষ্টে আক্রমণ পূর্বক তাহার হস্তে প্রাপ্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে? দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অমরগণের মধ্যেও কেহ উহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। ঐ বীর গদাযুদ্ধে অতিশয় দক্ষ; অতএব ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে কি আপনি, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি অর্জুন কেহই উহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। যখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দুর্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদের জয়লাভে সংশয় উপস্থিত হয়,

তখন আপনি কিরূপে উহাকে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বিনাশ সাধন পূর্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন? এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাণ্ডুতনয়গণের কখনই রাজ্যভোগ হইবে না। বিধাতা উহাদিগকে চিরকাল বনে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নির্মাণ করিয়াছেন।

পাণ্ডুতনয়দের হয়ত সত্যিই চিরকাল ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করতে হত, যদি না কৃষ্ণ তাঁর অসীম দূরদৃষ্টি দিয়ে সব সময় তাঁদের ভবিষ্যতের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। একের পর এক অন্যের ভুল সংশোধন করে এবং নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে কৃষ্ণ পাণ্ডব ভাইদের বার বার চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। এবারও যুধিষ্ঠিরের ভুলে পাণ্ডব ভাইয়েরা যে বিপদে পড়েছিলেন কৃষ্ণই তাঁদের সেই শেষ বিপদ থেকে উদ্ধার করে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বুদ্ধিমান কৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে ন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে পরাজিত করা যাবে না। দুর্যোধনের রণনৈপুণ্যের খবর কৃষ্ণ পাণ্ডব ভাইদের চেয়ে অনেক বেশী রাখতেন। কৃষ্ণের প্রখর ও নির্ভুল অনুমানশক্তি দুর্যোধনের মধ্যে লুকানো বিপদ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। শত্রুর জীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণ যত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করেছেন, ততটা কৌরব অথবা পাণ্ডব পক্ষের কেউই পারেন নি। প্রত্যেক কৌরব মহারথীর অতীত জীবন কৃষ্ণের নখদর্পনে ছিল। মহাবীরদের সেই অতীত বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণ বর্তমানের সমস্যা সমাধান করেছেন। এক কথায় কৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডব পক্ষের তথ্য ভাণ্ডার। মহারথীদের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যাদি যে রাজনীতি ও রণনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে—একথা একমাত্র কৃষ্ণই বুঝেছিলেন। উভয় পক্ষের রাজনীতিকরা যখন গুপ্তচরের মাধ্যমে কেবলমাত্র বিপক্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত তখন কৃষ্ণ নিঃশব্দে উভয়পক্ষের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জীবনপঞ্জী প্রস্তুত করে নিজের মস্তিষ্কের কোষে কোষে সযত্নে সাজিয়ে রেখে

পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত। তথ্য আহরণ ও সুচিন্তিত ভাবে সেই তথ্যকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভার এক অনুদ্‌ঘাটিত গুরুত্বপূর্ণ প্রান্ত। এই দিকটিকে কৃষ্ণ অবহেলা করেননি বলেই তিনি বার বার অন্যের ভুল সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করে রণক্ষেত্রে অনেক অবধারিত পরাজয়ের হাত থেকে পাণ্ডব পক্ষকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির পাণ্ডবপক্ষের প্রধান হলেও তিনি এই গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের দিকটি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন এবং সেই জন্যই রণক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের অধিকাংশ সিদ্ধান্তের মধ্যেই গভীরতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। শত্রুর সম্বন্ধে কৃষ্ণের সম্যক্ জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তির জন্যই তিনি অন্যের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ঠিক এই দুটি অভাবের জন্যই যুধিষ্ঠির নিজেকে নিজের অজান্তেই কৃষ্ণের অধীন করে তুলেছিলেন।

দুর্য্যোধনের যুদ্ধাভ্যাস সম্বন্ধে কৃষ্ণ আগেই অনেক তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন বলে ন্যায়যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে পরাজিত করার আশা ত্যাগ করে কৃষ্ণ শেষ শত্রুকে পরাজিত করার জন্য বাস্তোবচিত উপায় গ্রহণ করলেন, যদিও অন্যদের চোখে তা ন্যায়সম্মত নয়। শেষ বাধা অপসারিত করতে হবে এটাই বড় কথা, কোন্ পথে তা হবে কৃষ্ণের কাছে সেটা কখনই বড় ছিল না। তিনি যুধিষ্ঠিরের মত মিথ্যা অহমিকা বোধে আক্রান্ত ছিলেন না। তিনি জানতেন কঠিন বাস্তবের কাছে এইসব মিথ্যা মানসিক আত্মতুষ্টির কোন মূল্য নেই। কোন অস্তিত্বহীন অস্বচ্ছ মানসিক ধারণা কখনই কৃষ্ণের সাধারণ বিবেচনা শক্তিকে বিপথে পরিচালিত করতে পারেনি, যেটা অন্যদের বেলায় বহুবার ঘটেছে।

যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে কৃষ্ণ ভীমকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন কিভাবে দুর্য্যোধনের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করতে হবে, কারণ ভীমসেন ছাড়া পঞ্চপাণ্ডবের আর কেউই দুর্য্যোধনের সঙ্গে গদাযুদ্ধের উপযুক্ত ছিলেন না। কৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে ভীমকে শত্রুর গুরুত্ব সম্বন্ধে

অবহিত করে সাবধান করে দিলেন যাতে ভীমসেন সতর্ক হয়ে দুর্য্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শক্তির অহমিকা ভীমের বিপদ ঘটাতে পারে, কৃষ্ণ এ ব্যাপারে ভীমের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন ছিলেন। কৃষ্ণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে উত্তেজিত ভীম এলেন গদা হাতে দুর্য্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

শুরু হল দুই মহাবীরের শেষ দ্বৈরথ সমর। একে অন্যকে নিপাতিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন দুই বীর। দেহের সমস্ত শক্তি ও গদাযুদ্ধের সব কৌশল প্রয়োগ করে দুই বীর মহাভারতের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যুদ্ধ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ সহ অন্যান্য পাণ্ডবেরা দুই মহাবীরের চারদিকে দাঁড়িয়ে গদাযুদ্ধ দেখতে লাগলেন। ভীমের শরীরে দুর্য্যোধনের চেয়ে শক্তি বেশী ছিল, কিন্তু দুর্য্যোধন ছিলেন সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ কৌশলী গদাযোদ্ধা। কৃষ্ণ ভীমকে সাবধান করার সময় দুর্য্যোধনের যে প্রশংসা কৌশলী বলে করেছিলেন তা অমূলক নয়। দুর্য্যোধনের গদা প্রহারে ভীমসেন বারবার আহত হতে লাগলেন। আহত হয়ে ভীম যত ক্রুদ্ধ হতে লাগলেন তত বেশী তিনি দুর্য্যোধনের দ্বারা প্রহৃত হতে লাগলেন। দুর্য্যোধন বিভিন্ন প্রকারের বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন করে ভীমকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করতে লাগলেন। চারিপাশে দর্শকরূপে উপস্থিত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখে ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁদের মন থেকে ধীরে ধীরে জয়ের আশা মিলিয়ে যেতে লাগল। এই সময় দুই বীরের গদাযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎ দুর্য্যোধনের গদাঘাত ভীমের বক্ষস্থলে লেগে ভীম জ্ঞান হারিয়ে মূর্চ্ছিত হলেন। দুর্য্যোধন অন্যায় যুদ্ধ করলে এই সুযোগে ভীমকে নিহত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তার কারণ দুর্য্যোধন যে খুব সৎ ছিলেন তা নয়, আসলে দুর্য্যোধন বুঝতে পেরেছিলেন যে যদি তিনি অন্যায় যুদ্ধে ভীমের প্রাণ হরণ করেন তাহলে অবশিষ্ট পাণ্ডব ভ্রাতারা, কৃষ্ণ ও পাঞ্চালদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্যায়-যুদ্ধ করার

অস্ত্রহাতে তাঁকে হত্যা করবেন। জীবনের শেষ আশায় তিনি তাই হাতে পাওয়া সোনার সুযোগও ধৈর্য্য ধরে প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ ন্যায়যুদ্ধে তাঁর জেতার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেই যে তিনি জিততে পারবেন তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখলেই ভীম যেকোন মুহূর্তে গদাযুদ্ধের নিয়ম বিরুদ্ধ অন্যায় কৌশল গ্রহণ করতে পারেন। এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ, দুর্যোধনকে লড়তেই হবে এবং লড়াইয়ের ফলাফল আগেই স্থির করা হয়ে গেছে—দুর্যোধনের মৃত্যু।

দুর্যোধনকে লড়তে হবে নিয়ম মেনে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে। নিয়ম ভঙ্গ করলেই অন্যায়কারীর শাস্তি পাবেন তিনি মৃত্যু, চারিপাশে দর্শকরূপে দণ্ডায়মান প্রতি মুহূর্তে তাঁর মরণাকাঙ্ক্ষী বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের কাছ থেকে। কিন্তু যদি ভীমসেন অন্যায় পন্থা অবলম্বন করেন তবে সেটা যুদ্ধের নিয়মবিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হবে না এবং অন্যায় যোদ্ধা বলে তিনি নিন্দিত হবেন না। তখন সেই অন্যায়ের সমর্থনে বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হবে কারণ তিনি বলবান, তাঁর সমর্থন ও লোকজন বেশী, আর রাজা দুর্যোধন হতমান, নিঃস্ব ও একক এবং সেই মুহূর্তে তুলনামূলক সামগ্রিক শক্তির বিচারে তিনি ভীমের চেয়ে দুর্বল। বলবানের আইনই আইন এবং দুর্বলকে সেই আইন সব সময় মানতে হয়। তাই দুর্যোধনও এই বিচিত্র আইনের প্রহসন মেনেই যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। অথচ যদি দুর্যোধন যুদ্ধ না করতেন তাহলে আবার যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা ধর্মের অহমিকা বোধের সন্তুষ্টি হয় না। এই মিথ্যা আত্মতুষ্টির জন্যই গদাযুদ্ধের সৃষ্টি। এই যুদ্ধের প্রহসন সৃষ্টি করতে না পারলে যুধিষ্ঠিরের ধার্মিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা, ফলে ভবিষ্যতে রাজা হিসাবে প্রজাপালনেও অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। তাই ন্যায় যুদ্ধের প্রহসন সৃষ্টি করা একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল যুধিষ্ঠিরের কাছে, যদিও যুধিষ্ঠিরের অন্য ভাইয়েরা এবং কৃষ্ণ এই ধারণার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। দুর্যোধনের জীবনে এ এক উভয় সংকটের মুহূর্ত—যুদ্ধে জয়লাভ করলেও মৃত্যু এবং পরাজিত হলেও মৃত্যু। আবার যুদ্ধ না

করলে তাঁকে কাপুরুষ পলায়নকারী আখ্যা দিয়ে মহারথীদের সঙ্গে মিলিত ভাবে অভিমন্যু বধের অভিযোগে সম্মিলিতভাবে হত্যা করা হবে। অভিমন্যু বধ পাণ্ডবদের কাছে এক অভাবনীয় নৈতিক সুযোগের সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত রকমের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে অভিমন্যু বধের কীর্তন একবার করলেই সব দোষ গুণে পরিণত হত। অভিমন্যু বধের একটি অন্যায়ের প্রতিশোধে একাধিকবার যুদ্ধের নিয়ম বিরুদ্ধ অন্যায় সুযোগ পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ করেছেন। অভিমন্যুর একটি জীবনের পরিবর্তে নৈতিকতার সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে শিক্ষাগুরু আচার্য্য দ্রোণের জীবন প্রতারিত হয়েছে, ভূগর্ভ থেকে রথের চাকা তোলায় ব্যস্ত থাকার সময় কাপুরুষোচিতভাবে কর্ণকে হত্যা করা হয়েছে এবং সবশেষে রাজা দুর্য্যোধনও একই অজুহাতে জীবন হারাতে চলেছেন। এ যেন সেই ঝরণার ধারে মেষশাবক ও বাঘের জল ঘোলা করার গল্প। অজুহাত একটা চাই-ই চাই, নিজের বিবেকের মিথ্যা নীতি-কক্ষের স্থিতির জন্য, যদিও বাস্তব বিচারে তা একান্তই অপ্রয়োজনীয়।

দুর্য্যোধনের গদাঘাত সহ্য করে কিছুক্ষণ পরে ভীম জ্ঞান ফিরে পাবার পর আবার তুমুল গদাযুদ্ধ শুরু হল দুই বীরের মধ্যে। দুর্য্যোধন আগের মতই স্বভাবসিদ্ধভাবে বিভিন্ন কৌশল দেখিয়ে আঘাতে আঘাতে ভীমসেনকে জর্জ্জরিত করতে লাগলেন। কখনও বুকে, কখনও মস্তকে. কখনও পিঠে দুর্য্যোধনের গদার আঘাতে ভীমের প্রতিরোধ ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগল। দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখে চিন্তিত হলেন কৃষ্ণ। অন্য পাণ্ডব ভ্রাতারা নির্বোধের মত দুই বীরের গদাযুদ্ধ উপভোগ করছিলেন বাস্তব বিস্মৃত হয়ে। যে জন্য এই গদাযুদ্ধের আয়োজন তা তাঁরা ভুলেই গিয়েছিলেন। অর্জুন এতই উপভোগ করছিলেন এই যুদ্ধ যে তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণকে ভীম ও দুর্য্যোধনের মধ্যে কে গদাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ জানতে চাইলেন। অর্জুন ছিলেন বীর, কাজেই তাঁর কাছে যুদ্ধের বিভিন্ন প্রকারের অদ্ভুত কলাকৌশল উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে নয়। কারণ কৃষ্ণ ছিলেন রাজনীতিক, তাঁর কাছে

যুদ্ধের উপভোগ্যতার চেয়ে দুর্যোধনের মৃত্যুই বেশী কাম্য এবং সেই চিন্তাতেই ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি উদ্বিগ্নতার সঙ্গে কাটাচ্ছিলেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ তাঁর উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করে দুর্যোধনকে হত্যার জন্য যে কৌশল তিনি মনে মনে রচনা করেছিলেন তা বললেন। কৃষ্ণ বললেন —ভ্রাতঃ! ঐ বীরদ্বয় উভয়েই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীমসেন দুর্যোধন অপেক্ষা বলবান বটেন, কিন্তু বৃকোদর অপেক্ষা কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধ নৈপুণ্য অধিক। অতএব ভীমসেন ন্যায়যুদ্ধে কদাচ দুর্যোধনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দুরাত্মা দুর্যোধন বিনষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়াছি, দেবগণ মায়াবলে অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবরাজ মায়াপ্রভাবেই বিরোচনকে পরাজয় ও বৃত্রাসুরের তেজ হ্রাস করিয়াছেন। এক্ষণে বৃকোদরও মায়াময় পরাক্রম প্রকাশপূর্বক দুর্যোধনকে বিনাশ করুন। উনি দ্যূতক্রীড়া সময়ে দুর্যোধনের উরু ভগ্ন করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা সফল হউক। মায়াবী দুর্যোধনকে মায়াবলেই নিপাতিত করা কর্তব্য। যদি ভীমসেন উহার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সংকটে নিপতিত হইবেন। হে অর্জুন! আরও দেখ, এক্ষণে ধর্মরাজের অপরাধেই পুনরায় আমাদের মহদ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণ নিহত হওয়াতেই আমাদের জয়লাভ, কীর্তিলাভ ও বৈর-নির্যাতন হইয়াছিল, কিন্তু ধর্মরাজের নিমিত্ত এক্ষণে আমাদের জয়লাভে মহান্ সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে।

কৃষ্ণের বাক্যে অর্জুনের চেতনা ফিরল, তিনি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন। সেই সময়ে গদাযুদ্ধে নাভির নিচে আঘাত করা ছিল নিয়মবিরুদ্ধ এবং অন্যায়। প্রতিযোগী যোদ্ধাগণ তাই সুযোগ পেলেও প্রতিপক্ষকে নাভির নিচে আঘাত করতেন না। কৃষ্ণ, 'উনি দ্যূতক্রীড়া সময়ে দুর্যোধনের উরু ভগ্ন করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা সফল হউক', বলে অর্জুনকে বোঝালেন যে ভীমের এখন

দুর্যোধনের উরুতে গদাঘাত করে জয়লাভ করা উচিত। কিন্তু কৃষ্ণের বলার ভঙ্গি এমনই ছিল, যেন ভীমের নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যই দুর্যোধনের উরুতে গদাঘাত করা প্রয়োজন এবং কৃষ্ণ সেই কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছেন মাত্র। আসলে অনেকক্ষণ ধরে গদাযুদ্ধ লক্ষ্য করে কৃষ্ণ মনে মনে এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন ধীর মস্তিষ্কে দুর্যোধনকে পরাজিত করার জন্য। কৃষ্ণের কথা অনুসরণ করে গদাযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই অর্জুন নিজের উরুতে হাত দিয়ে ভীমকে ইশারা করে বোঝালেন দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করার জন্য। দুর্যোধনের গদা প্রহারে শোনিতাক্ত কলেবর অতিষ্ঠ ভীম সংকেত পাওয়া মাত্র দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। একসময় ভীমের গদাঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাজা দুর্যোধন শূন্যে লাফিয়ে উঠতেই ভীম দুর্যোধনের দুই হাঁটু লক্ষ্য করে গদা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলেন। সেই ভীষণ গদার আঘাত রাজা দুর্যোধনের দুই হাঁটুতে লেগে তাকে ভূপাতিত করল। কৌরব বংশের লৌহমানব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র রাজা দুর্যোধন আর মাটি ছেড়ে উঠতে পারলেন না। নিজদেহ থেকে নিগর্ত শোণিত প্রবাহের মধ্যে ভূমিশয্যা গ্রহণ করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দুর্যোধনের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক দীর্ঘ অধ্যায়ের শেষ হল। বহু ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে লৌহপ্রাচীর অপসারিত হলেন। কৃষ্ণের জীবনের সবচেয়ে কঠিন রাজনৈতিক বাধা চিরতরে অপসৃত হলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের যে রাজনৈতিক বিরোধ হস্তিনায় কৃষ্ণের দৌত্য প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার পর থেকে শুরু হয়েছিল এতদিনে সমরাঙ্গনে সেই বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে কৃষ্ণ জয়লাভ করলেন। কৌরবরাজ্য পাণ্ডবদের হস্তগত হল আর পাণ্ডবরা তো কৃষ্ণের হস্তগত হয়ে রয়েছেনই। এখন সারা ভারতে কৃষ্ণের আর কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী রইলেন না। যে অল্প কয়েকজন রাজা জীবিত রইলেন তাঁরা বাধ্য হলেন কৃষ্ণের প্রভাবের পরিধির ভিতরে আসতে, কারণ প্রবল প্রতাপান্বিত

কৌরবরাজ যাঁর বুদ্ধি কৌশলে পরাজিত হয়েছেন এবং মহাবীর পাণ্ডব ভ্রাতাদের যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, যাঁকে ছাড়া পাণ্ডবেরা এক মুহূর্তও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারেন না, তাঁকে অস্বীকার করে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করতে কে চায়? তার চেয়ে এই সফল রাজনৈতিক মেধাকে স্বীকার করে নিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রভাব এবার ধর্মীয় ভাবমূর্তিতে সারা ভারতে বিস্তৃত হতে শুরু করল। যে সীমিত শক্তি নিয়ে কৃষ্ণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মথুরায় জন্মলাভ করেছিল এতদিনে বহুপথ পরিক্রমার পর, বহু বাধা কৌশলে অতিক্রম করার পর দুর্যোধনের মৃত্যুতে সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হল।

কৃষ্ণ এতদিন যে রাজনৈতিক সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন, ঠিক সফলতার ক্ষণটিতেও তিনি তেমনিই সংযমী ও ধীর ছিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ দেখে এবং অন্যায়ভাবে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে ভীমকে দুর্যোধনকে আঘাত করে পরাজিত করতে দেখে কৃষ্ণ ভ্রাতা বলরাম যখন ক্রোধে উন্মত্ত তখন কৃষ্ণ শান্ত ভাবে বলরামের ক্রোধ প্রশমনের জন্য বলরামকে যা বলেছিলেন তার মধ্যেই কৃষ্ণের রাজনৈতিক মেধা ও গভীর কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বলরামের ক্রোধের উত্তরে কৃষ্ণ শান্তভাবে যুক্তি দিয়ে ভীমের অন্যায় যুদ্ধ সমর্থন করে বললেন—হে মহাত্মন! শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি নির্দিষ্ট আছে। আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের উন্নতি এবং শত্রুর অবনতি, শত্রুর মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের অবনতি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার ও স্বীয় মিত্রগণের অবনতি অবলোকন করিলে আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। সমর বিশারদ পাণ্ডবেরা আমাদিগের পিতৃস্বসার পুত্র; সুতরাং ইহারা আমাদের সহজমিত্র। এক্ষণে বিপক্ষেরা ইহাদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল। আর দেখুন, প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম। মহাবীর বৃকোদর

'আমি রণস্থলে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব' বলিয়া সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পূর্বে মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে 'ভীমের গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন হইবে' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে ভীমসেনের এইরূপ অনুষ্ঠানে অনুমাত্রও দোষ লক্ষিত হইতেছে না। হে রেবতী রমণ! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের যোনি সম্বন্ধ ও সাতিশয় সৌহার্দ্দ্য আছে: সুতরাং ইহাদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগের উন্নতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

একেবারে পরিষ্কার রাজনৈতিক কথা, একটুও বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। কিন্তু বলরাম ছিলেন তখনকার অন্য সবার মতই ধর্মকেন্দ্রিক। কৃষ্ণের মত যে কোন উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছনোর মানসিক দৃঢ়তা তাঁর ছিলনা এবং তিনি কৃষ্ণের মত অতটা স্বার্থ-সচেতন ছিলেন না। তাই কৃষ্ণের এই সযৌক্তিক বাস্তব ব্যাখ্যাতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না এব ভীমকে যথেষ্ট কটু কথা বলে স্থান ত্যাগ করলেন।

কৃষ্ণ বলরামের কাছে ভীমের অন্যায় যুদ্ধের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছিলেন কারণ তার প্রয়োজন ছিল। দুর্যোধনকে যেভাবেই হোক পরাজিত করতে না পারলে পাণ্ডবদের রাজ্যলাভ হত না এবং যেভাবে ভীম দুর্যোধনকে পরাজিত করেছিলেন তার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন কৃষ্ণ নিজে। কিন্তু যে কাজ না করলেও চলে অথবা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় সেই কাজ কৃষ্ণ কখনও করেননি এবং তার সমর্থনে কখনও যুক্তি প্রদর্শন করেননি। অপ্রয়োজনীয় কাজ করে অনেক যোদ্ধা ও রাজনীতিক অনেক সময় নষ্ট করলেও কৃষ্ণ কখনও প্রয়োজনের বাইরে যাননি। কৃষ্ণের একটি বড় গুণ অপ্রয়োজনীয় কার্যের বর্জন। সময়ের মূল্য ও বাহুল্য কার্যের ভবিষ্যৎ কুফল সম্বন্ধে কৃষ্ণ যতটা সচেতন ছিলেন ততটা উভয় পক্ষের রাজনীতিক ও যোদ্ধাদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না। একজন রাজনীতিকের একটি অপ্রয়োজনীয় কার্যের ফল সামগ্রিক রাজনীতিকে ভাল ও খারাপ দুভাবেই প্রভাবিত করতে পারে, তবে

খারাপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। কৃষ্ণ এই বিষয়টি জানতেন বলেই গদাযুদ্ধে ভীমের হাতে দুর্যোধনের পরাজয়ের পর প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষী ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত তিনি সমর্থন করেননি এবং তীব্র কণ্ঠে ভীম-পশুর এই নীচ ব্যবহারকে ধিক্কার জানিয়েছেন।

যদি কৃষ্ণ পরাজিত মৃতপ্রায় দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাতকে ধিক্কার না জানাতেন তবে তিনি ভীমের সমগোত্রীয় রাজনীতিক হিসাবে নিজেকে পরিচিত করতেন। ভীমের এই অপ্রয়োজনীয় কার্যের নিন্দা করা কৃষ্ণের উন্নত রাজনৈতিক মানসিকতার পরিচয়। পরাজিত মুমূর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে মস্তকে পদাঘাত করার কোন প্রয়োজন ভীমের ছিল না। তথাপি ভীম পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করে পাশবপ্রবৃত্তি চালিত হয়ে দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করেছিলেন। নিজের পাশব প্রবৃত্তিকে ভীম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, অপর দিকে কৃষ্ণের মধ্যে পাশব প্রবৃত্তির কোন প্রকাশই নেই। যদিও দুর্যোধন ছিলেন কৃষ্ণের কঠিনতম রাজনৈতিক বাধা আর ভীমের শুধু সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী। এমনকি ভীমের এই নীচ কাজকে লোকদেখানো তিরস্কার করেও যখন যুধিষ্ঠিরের নিজের মনের কাপুরুষোচিত নীচতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখনও কৃষ্ণ ভীমের এই নীচ কার্যকে সমর্থন করেননি। কৃষ্ণ যখন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, যুধিষ্ঠির কি করে ভীমের এই অন্যায় কার্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করছেন? তখন যুধিষ্ঠির ভীমের প্রতি নানা কথায় সমর্থন জানিয়ে বললেন,……আমার ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারেই হউক, আর অধর্ম্মানুসারেই হউক, লোভ পরতন্ত্র দুর্যোধনকে বিনাশ করিয়া অভীষ্ট সাধন করুক, এই মনে করিয়া জ্ঞাতি বিনাশ ও দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি।

যদি অভীষ্ট সাধনই বড় কথা হয় তাহলে আর ধর্মের মুখোশ পরে আত্ম প্রবঞ্চনা কেন? কৃষ্ণ তো বরাবরই অভীষ্ট সাধনের জন্য যে কোন উপায় গ্রহণের কথা বারবার বলে এসেছেন। আর অভীষ্ট সাধনের পরেই বা প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায় লাথি মারার মত নীচ কাজ করা কেন? আসলে

দুর্বল ও কাপুরুষ যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের জীবিতকালে তাঁকে ভয় পেতেন, তাই তাঁর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের প্রতিশোধের আকাঙ্খা এই কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। কিন্তু কৃষ্ণ কত ব্যতিক্রম, দুর্যোধনের মত তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীও পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে গুরুত্বহীন। অথচ অন্যেরা পরাজয়ের পরেও দুর্যোধনের প্রতি প্রয়োজনহীন গুরুত্ব আরোপ করে চলেছেন। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই কৃষ্ণের সাফল্য অন্যের তুলনায় অনেক বেশী। অবশ্য কৃষ্ণের চূড়ান্ত রাজনৈতিক সাফল্য এসেছে সামরিক সাফল্য লাভের পরেই। রাজনীতিতে কৃষ্ণের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন তাঁর নিজের সামরিক ও কূটনৈতিক মেধা দায়ী, তেমনি এই মেধার প্রয়োগের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়ার দায়িত্ব স্বয়ং রাজা দুর্যোধনের। যদি রাজা দুর্যোধন দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তি হতেন এবং কৃষ্ণের দৌত্য প্রয়াসকে গ্রহণ করতেন তাহলে মহাভারতের যুদ্ধ হত না এবং কৃষ্ণের সাফল্য এত ব্যাপক আকারে আসত না। তখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণ দুর্যোধনকে প্রভাবিত করে কুরু ও পাণ্ডব দুই পক্ষের পরামর্শদাতা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভারতের অন্যান্য শক্তিশালী রাজার ওপর নিজের প্রভাব এত ব্যাপক আকারে বলিষ্ঠ রূপে বিস্তার করতে সক্ষম হতেন না। কারণ তাঁরা কৃষ্ণকে তখন শুধু একজন কৌশলী মধ্যস্থ রূপেই দেখতেন। একজন সফল রাজনৈতিক দূতের ওপরে কিছুতেই তিনি স্থান পেতেন না এবং কুরু-পাণ্ডবের ওপর সীমিত প্রভাব নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হত।

কিন্তু কৃষ্ণ ভাগ্যবান, রাজা দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের মত দুর্বলচিত্ত ছিলেন না, তাই তিনি কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করে মহাভারতের যুদ্ধের সৃষ্টি করেছেন এবং কৃষ্ণও নিজের সামরিক দক্ষতা ও প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেয়েছেন। দুর্যোধনের ওপর অনেক চাপ এসেছিল সন্ধি করার জন্য কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হননি, এমন কি দুঃশাসনের মত ব্যক্তিও চাপের কাছে প্রায় নতি স্বীকার করে ফেলেছিলেন যুদ্ধ এড়ানোর জন্য। কিন্তু রাজা দুর্যোধন কিছুতেই তা করেননি।

দুর্যোধনের চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্যই মহাভারতের যুদ্ধ অনিবার্য পরিণতি হিসাবে নেমে এসেছে কৌরব ও পাণ্ডবদের কাছে। গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন জন্মগ্রহণ না করলে মহাভারতের যুদ্ধ হত না একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় এবং এই মহাযুদ্ধের সুযোগে কৃষ্ণ যেভাবে নিজেকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই সুযোগ থেকে তিনি আজীবন বঞ্চিতই থেকে যেতেন। কৃষ্ণের ভবিষ্যতের জন্য, কৃষ্ণের উচ্চাকাঙ্খা পূরণের জন্য কৃষ্ণের কাছে তাই রাজা দুর্যোধনই সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদার্হ। দুর্যোধনের মৃত্যুতে কৃষ্ণ নূতনরূপে মহাভারতের শক্তিশালী পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করে নবজীবন লাভ করলেন। যে জাতকের বদ্ধ কারাগারে জন্ম হয়েছিল এবং যাঁর বাল্যকাল ও কৈশোর গোপনে বহু উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছিল সেই কৃষ্ণ-জাতক এবার দিগন্ত প্রসারিত রাজনৈতিক সম্ভাবনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একক ব্যক্তিত্বে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

এগার

দুর্যোধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কৌরবপক্ষের চূড়ান্ত সামরিক পরাজয় ঘটল। পাণ্ডবপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করে সমগ্র কৌরব রাজ্যের অধিকারী হলেন। কিন্তু তখন চারিদিকে কেবল শোকার্তের ক্রন্দন যুদ্ধে নিহতদের জন্য। যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডব ভ্রাতারা চারিদিকে এই শোকার্ত পরিবেশ দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এরই মধ্যে যুধিষ্ঠির আবার নিজেই যুদ্ধে নিহতদের জন্য হঠাৎ প্রবল শোকোচ্ছ্বাস শুরু করে সমস্ত পরিস্থিতি বিভ্রান্তিকর করে তুললেন। যুধিষ্ঠিরের শোক আর কিছুতেই প্রশমিত হয় না। যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি যে একটি বৃহৎ রাজ্যের অধিপতি হয়েছেন এবং সেই রাজ্য পরিচালনার জন্য যুদ্ধ-পরবর্তী একটা প্রশাসন দরকার, কারুরই সে খেয়াল নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম কৃষ্ণ, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তিনি হাজার ঝামেলার মধ্যেও ভুলে যাননি। যুদ্ধ পরবর্তী প্রশাসন চালু করার আগে যেসব সাধারণ কূটনৈতিক রীতিনীতি সম্পাদন করা প্রয়োজন পাণ্ডব ভাইদের ও যুধিষ্ঠিরের হয়ে কৃষ্ণ নিজেই সে সব কাজ খুব সফল ভাবে সম্পন্ন করেছেন।

যুদ্ধবিজয়ী হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পাণ্ডবরা হস্তিনা নগরে প্রবেশ করার আগে কৃষ্ণ নিজেই হস্তিনা পরিদর্শনে গেলেন। কৃষ্ণের হস্তিনা নগরে যাবার উদ্দেশ্য ছিল দুটি—এক, যুদ্ধে নিহতদের পরিবার-বর্গকে স্বান্ত্বনা প্রদান, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে স্বান্ত্বনা দেওয়া এবং দুই, যুদ্ধ পরবর্তী হস্তিনা নগর পাণ্ডবদের প্রবেশের পক্ষে কতটা অনুকূল তা যাচাই করে দেখা। অন্য কেউ এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে চিন্তা না করলেও কৃষ্ণের কাছে এই বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় ছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী নিহত কৌরব প্রধান দুর্যোধনের

পিতা ও মাতা। তাঁদের ও অন্যান্য নিহতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা মানবিকতার পরিচায়ক, উপরন্তু এর দ্বারা প্রজাদের কাছেও নতুন শাসকরূপে নিজেদের ভাবমূর্তিকে মানবিকরূপে গড়ে তোলা যাবে। কৃষ্ণ জানতেন, যে প্রজারা দীর্ঘদিন ধরে দুর্যোধনকে রাজা রূপে স্বীকার করে তাঁর শাসনে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে তাদের কাছে হঠাৎ নিজের প্রভুত্ব জাহির করতে গেলে সমর্থন হারাবার সম্ভাবনা। প্রজা সমর্থন হারালে রাজ্য শাসন কষ্টকর হয়ে ওঠে। এছাড়া কৃষ্ণের যেটা নিয়ে প্রধান চিন্তা তা হল মৃতরাজা দুর্যোধনের অমাত্য ও বন্ধুরা। কারণ এইসব অমাত্য ও বন্ধুরা দুর্যোধনের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং সেইজন্য রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এঁরাই রাজ্যের প্রশাসনিক শক্তি। এঁরা কোনরকম বিরোধিতা করেন কিনা অথবা দুর্যোধনের মৃত্যুর পরে এঁদের ক্ষমতা কতটা অবশিষ্ট আছে তা জানা একান্ত প্রয়োজন। আবার যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাদের সম্বন্ধে দুর্যোধনের এই অমাত্য ও বন্ধুদের মনোভাবই বা কি কৃষ্ণের তা জানাও বিশেষ দরকার। হয়ত এঁরা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কোনরকম বৈর মনোভাব গ্রহণ না করে সাদরেই তাঁকে রাজা বলে মেনে নেবেন। কোনরকম বিভ্রান্তির মধ্যে না থেকে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার জেনে নেওয়ার জন্যই কৃষ্ণ হস্তিনায় যাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। সামরিক বিজয়ের পর কোনরকম রাজনৈতিক ঝুঁকি কৃষ্ণ নিতে চাননি। যুধিষ্ঠির সহ পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে পরামর্শ করে কৃষ্ণ হস্তিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

হস্তিনায় পৌঁছে কৃষ্ণ প্রথমেই কূটনৈতিক রীতি অনুসারে নিহত রাজা দুর্যোধনের পিতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে রথ থেকে নেমে অভিবাদন করে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে কোন কথা না বলে করুণ স্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। সুচতুর কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে পড়ার আগেই নিজে ক্রন্দন করে তাঁকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। যাতে ধৃতরাষ্ট্র ও

গান্ধারীর মনে ধারণা হয় যে কৃষ্ণ কৌরবদের মৃত্যুতে সত্যিই দুঃখিত।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে পারলে, তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি অনেক নরম মনোভাব গ্রহণ করবেন এবং সেই সুযোগে উপযুক্ত স্বান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণ তাঁদের শোক প্রশমিত করে পাণ্ডব পক্ষের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর ক্রোধ অনেকটা কমাতে পারবেন। অতীতে কৃষ্ণ অনেক মহারথীকে বুদ্ধির লড়াইয়ে পরাজিত করেছেন আর বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী যে তাঁর এই সূক্ষ্ম বুদ্ধিকৌশলের কাছে নতি স্বীকার করবেন এতো জানা কথা।

অনেকক্ষণ ক্রন্দন করে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র কিছু বলার আগেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ যাতে না হয় তার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারেন নি। পাণ্ডবেরা বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে তাঁদের হয়ে কৃষ্ণ মাত্র পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু সেই সামান্য প্রার্থনাও পূর্ণ হয়নি বলেই এই কুলক্ষয় ঘটেছে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞানী হয়েও কাল প্রভাবে মোহে অভিভূত হয়েছিলেন। এইভাবে একবার ধৃতরাষ্ট্রের প্রশংসা করে ও একবার পাণ্ডবদের দুঃখের কথা শুনিয়ে কৃষ্ণ চেষ্টা করতে লাগলেন ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রের মন পাণ্ডব পক্ষের অনুকূলে আনার। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন যে এখন এই মহাযুদ্ধের পর কুলরক্ষা, পিণ্ডদান, ও পুত্র কর্তব্য সবই পাণ্ডবদের ওপর নির্ভর করছে। তাছাড়া যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রকে আগের মতই স্নেহ ও ভক্তি করেন এবং তাঁর অধীনেই প্রতিপালিত হতে চান। যুধিষ্ঠির সমস্ত শত্রুকে যুদ্ধে পরাজিত করেও মনে শান্তি পাচ্ছেন না শুধু ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কথা ভেবে। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জন্য অনবরত শোক করাতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখে রয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পুত্রশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হওয়ায় যুধিষ্ঠির লজ্জাবশতঃ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারছেন না।

শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর তখন নিজের বিবেচনা শক্তি লোপ পেয়েছে। কৃষ্ণের বলার মোহময় ভঙ্গিতে তাঁরা দুজনেই প্রায় সম্মোহিত। কৃষ্ণ তাঁদের বললেন—আপনার ও গান্ধারীর নিমিত্ত অনবরত শোক করাতে তাঁহার সুখের লেশমাত্রও নাই। আপনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জাবশতঃ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না।

কৃষ্ণের বলার সম্মোহিণী শক্তির জন্য ও পরাজিত হয়ে হীন-মন্যতায় আক্রান্ত হওয়ার জন্য ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দুজনেই কৃষ্ণের কথা মেনে নিলেন, কোন প্রতিবাদ না করেই। কৃষ্ণ গান্ধারীকেও ঠিক ধৃতরাষ্ট্রের মত একই কায়দায় একবার প্রশংসা ও একবার পাণ্ডবদের দুঃখের কথা শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বশীভূত করে ফেললেন।

কৃষ্ণের কথা শুনে গান্ধারীর ভঙ্গুর নারীমন কৃষ্ণের বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরেই প্রভাবিত হল। গান্ধারী অঙ্গবস্ত্রে মুখ ঢেকে কান্না চেপে কৃষ্ণকে বললেন—হে কেশব! তুমি যাহা কহিতেছ সত্য বটে, দারুণশোকাবেগ প্রভাবে আমার মন বিচলিত হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমার বাক্য শ্রবণে আমি শান্তভাব অবলম্বন করিলাম। যাহা হউক বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ তাহাতে আবার পুত্রবিহীন হইয়াছেন. এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত উহার অবলম্বন হইলে।

কৃষ্ণের হস্তিনায় আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। কৃষ্ণ এটাই চাইছিলেন, এর জন্যই এত সূক্ষ্ম কৌশলে কৃষ্ণের কথা বলা ও কান্নার অভিনয়। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মন তিনি জয় করলেন এবং তার চেয়েও যেটা গুরুত্ব-পূর্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মনে যে শোকের আগুন জ্বলছিল তা প্রশমিত করে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সমর্থন আদায় করে মৃত কৌরব রাজের পিতামাতাকে পাণ্ডবদের প্রতি নির্ভরশীল করে তুললেন।

এর দ্বারা কৃষ্ণ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মন থেকে পাণ্ডবদের প্রতি ক্রোধ দূর হওয়ায় দুর্যোধনের অমাত্যদের মধ্যে কারুর মনে পাণ্ডবদের প্রতি বৈরভাব থাকলেও তিনি

প্রকাশ্যে কোনরূপ বৈর আচরণ করতে সাহস পাবেন না। কারণ মৃত রাজা দুর্যোধনের পিতামাতাই যখন পাণ্ডবদের প্রতি নিজেদের নির্ভরশীল করে তুলেছেন তখন তাঁদের বিরোধিতা করা অর্থহীন, নিজের বিপদ কে ডেকে আনতে চায়? এইভাবে কৃষ্ণ হস্তিনায় এসে সবকিছু নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন নিরাপদ করলেন। যখন কৃষ্ণ বুঝলেন যে যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবদের পক্ষে হস্তিনায় আসায় কোন বাধা ও বিপদ নেই কেবলমাত্র তখনি তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হস্তিনা ত্যাগ করলেন।

হস্তিনা থেকে ফিরে গিয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডবদের সমস্ত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে এখন তাঁদের কি করণীয়, এ ব্যাপারে পরামর্শ দিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে নিহত বীরদের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করালেন। মৃত বীরদের আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে ভাগীরথী তীরে তাঁদের উর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হল। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীসহ প্রধান সব কৌরব পক্ষীয় ব্যক্তি অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে মৃত বীরদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়ে এক সূক্ষ্ম ও পরিণত কূটনৈতিক কৌশলের পরিচয় দিলেন। এই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠানে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যাদের কেউ না কেউ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। এছাড়া রাজ্যের বহু প্রজাও যুদ্ধে নিহত বীরদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন। যখন বীরদের মৃতদেহ সমূহে অগ্নি প্রদান শুরু হল তখন তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পিতামাতার ক্রন্দন রোলে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হয়ে গেল। কি পাণ্ডব, কি কৌরব কেউই শোকাবেগ ও অশ্রু সংবরন করতে পারলেন না। যুদ্ধে নিহতদের আত্মীয়বন্ধুর হাহাকার রব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই হাহাকার ধ্বনির মধ্যে দণ্ডায়মান প্রজাদের অন্তঃকরণও মৃত বীরদের জন্য শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং তারাও অশ্রু বিসর্জ্জন করে শোক প্রকাশ করতে লাগল। এইভাবে মৃত মহাবীরদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া-

অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শত্রুভাব দূর হয়ে চারিদিকে এক মহাশোকের পরিবেশ সৃষ্টি হল। এই মহাশোকের পরিবেশে কে কার শত্রু বা কি জন্য এই শত্রুতার সৃষ্টি এইসব কথা সবাই ভুলে গিয়ে যে যার প্রিয়জনের জন্য শোক করতে লাগল। কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের ব্যক্তিদের মন থেকেই বৈরভাব দূর হয়ে এক তীব্র শোকাবেগে তাদের মন পূর্ণ হয়ে শত্রুতার নিষ্পত্তি হল। যুধিষ্ঠির এই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠানের উদ্যোক্তারূপে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন এবং ভাবী রাজা রূপে নিজের ভাবমূর্তিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেলেন। শোকাহত জনসাধারণ ভুলেই গেল যে কত ছলনার মাধ্যমে যুধিষ্ঠির এই মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। তার বদলে মৃত বীরদের ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করিয়ে সকলের সামনে যুধিষ্ঠির নিজের মহানুভবতা প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন। কৃষ্ণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শত্রুতা করতে রাজী ছিলেন না, তাই সামরিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা লাভ করেই তিনি শত্রুতার অবসান করলেন যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে মৃতবীরদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়ে। একটি উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য তিনি এক পথ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য লাভ হয়ে গেলে পরের উদ্দেশ্য লাভের জন্য তিনি পূর্বের পথ আঁকড়ে থাকেন নি. নতুন পথ খুঁজে নিয়েছেন নতুন সফলতার জন্য। কৃষ্ণ ততক্ষণই শত্রুতা করেছেন যতক্ষণ না শত্রুকে জয় করতে পেরেছেন, কিন্তু জয়লাভের পর অহেতুক ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পরাজিত শত্রুর ওপর কখনও প্রতিশোধ নিতে চাননি।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কৃষ্ণ পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। হস্তিনায় তিনি যা দেখে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে সাক্ষাৎ করে তিনি হস্তিনার পরিস্থিতি যে রকম বুঝেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেন। যুধিষ্ঠির চিরদিনই সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্থ, তাই তিনি কৃষ্ণের বাক্য শোনার পরেও হস্তিনায় যাওয়া না যাওয়া

নিয়ে কোনরকম মনস্থির করতে পারলেন না। তখন কৃষ্ণই আবার যুধিষ্ঠিরকে বিভিন্ন যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পরামর্শ দিলেন কেন যুধিষ্ঠিরের হস্তিনায় যাওয়া আবশ্যক এবং কেন হস্তিনার পরিস্থিতি যুধিষ্ঠিরের পক্ষে বর্তমানে নিরাপদ। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বোঝা-লেন যে যুদ্ধান্তে জীবিত নরপতিদের ও তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন বর্ণের প্রজাদের প্রতিপালনের জন্যই তাঁর হস্তিনায় যাওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠিরের মনের ভয় দূর হল এবং তিনি হস্তিনায় গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করে যুধিষ্ঠির হস্তিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণও অন্য রথে আরোহণ করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হলেন। ধৃতরাষ্ট্র নন্দন যুযুৎসু ও পাণ্ডব বান্ধব সাত্যকি সহ পাণ্ডবদের সমস্ত আত্মীয়বন্ধু যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করে হস্তিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণের অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য এসেছিলেন। বুদ্ধিমান কৃষ্ণ হস্তিনা যাত্রার সময় যুধিষ্ঠিরের রথের অগ্রভাগে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে পাল্কীতে বসিয়ে হস্তিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণের সূক্ষ্ম কূটনৈতিক প্রতিভার এ-এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণের বুদ্ধিদীপ্ত এই কর্মের উদ্দেশ্য ছিল, পথের দুপাশে দর্শকরূপে দণ্ডায়মান প্রজাদের দেখানো যে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী নিজেরাই স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে রাজপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করে নিয়ে আসছেন। যাতে প্রজা সাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের কোন আপত্তি নেই এবং কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয়ে গেছে। এর ফলে দুর্যোধনের অনুগত প্রজারা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে নতুন রাজার বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহস পাবে না এবং ধীরে ধীরে আনুগত্য বদল করতে বাধ্য হবে। এইভাবে কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণের নির্দেশে যুধিষ্ঠির সদলবলে সূত মাগধ বন্দিদের স্তুতিবাদ শ্রবণ করতে করতে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হস্তিনা নগরে প্রবেশ করলেন।

হস্তিনায় প্রবেশ করে কূটনৈতিক প্রথা অনুসারে যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কৌরব রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী নতুন রাজাকে অভিনন্দন জানালেন। হস্তিনার অধিবাসী-বৃন্দ ও রাজপুরোহিত সহ ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করলেন। বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রথা সম্পন্ন হওয়ার পর কৃষ্ণের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে রাজগুরু ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক দিয়ে প্রথাসম্মতভাবে প্রজাগণের সামনে যুধিষ্ঠিরকে স্বীকৃত রাজা হিসাবে সিংহাসনে বসাতে না পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। একবার সর্বসমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে অভিষেকের মাধ্যমে সিংহাসনে বসিয়ে জনস্বীকৃতি আদায় করতে পারলেই পাণ্ডব রাজ্য কৃষ্ণের করতলগত হবে। রাজা হিসাবে যুধিষ্ঠিরের কোন প্রতি-দ্বন্দ্বী থাক কৃষ্ণের তা খুবই অপছন্দ। আবার অহেতুক দেরী করে কোন বিপদ বা বাধা ডেকে আনাও কৃষ্ণের পছন্দ নয়, তাই কৃষ্ণ সময় নষ্ট না করে যুধিষ্ঠিরকে তৎক্ষণাৎ রাজপদে বসাতে চাইলেন এবং তার জন্যই রাজগুরু ধৌম্যের ওপর সমস্ত ভার অর্পণ করলেন যাতে প্রজাসাধারণের চিত্ত শোকাহত থাকতে থাকতেই অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন করাতে পারলেই কৃষ্ণের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রয়াস চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করবে।

ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের রাজা ও রাজ-প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে যুধিষ্ঠিরকে পাণ্ডব ও কৌরবদের ন্যায়সম্মত শাসনকর্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আগামী দিনের রাজনৈতিক সংকটে তাঁদের সাহায্য পাওয়া যাবে। তাছাড়া কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে এই সব রাজাদের সামনে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে কৃষ্ণের প্রাধান্যই প্রকাশ পাবে। সবার ধারণা হবে পাণ্ডব ভ্রাতাদের অভিভাবক কৃষ্ণ, পাণ্ডব ভাইয়েরা রাজ্য পরিচালনায় অপটু, তাই তাঁরা অভি-ভাবক রূপী কৃষ্ণের কাছ থেকে রাজনৈতিক পরামর্শ নিযে রাজ্য পরিচালনা করছেন। এতে কৃষ্ণের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হবে এবং

পাণ্ডব ভাইদের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা রূপে কৃষ্ণের রাজনৈতিক ক্ষমতা অপ্রতিহত গতিতে এগোবে। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষ্ণ রাজগুরু ধৌম্যের মাধ্যমে দ্রুত যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করানোর কথা চিন্তা করেছিলেন।

রাজ্যাভিষেক শুরু হল। যুধিষ্ঠির স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি সহ যুধিষ্ঠিরের ভাইয়েরা, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী, সুধর্মা, বিদুর, যুযুৎসু, সঞ্জয় ও উপস্থিত বিভিন্ন রাজ্যের নরপতিগণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শুরুর প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির অক্ষত, স্বস্তিক, শ্বেতপুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত ও মণি স্পর্শ করে পুরোহিত ও প্রজাদের বিভিন্ন মঙ্গলবস্তু দান করে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। দানপর্ব শেষ হওয়ার পর অভিষেকের জন্য বহুবিধ দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ, মৃত্তিকা, রত্ন, ও বিবিধ ধাতু নির্মিত এবং মৃন্ময় পূর্ণ-কুম্ভ, পুষ্প, অগ্নি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, হেমভূষিত শঙ্খ এবং শমী, পিপ্পল ও পলাশের সমিধ প্রভৃতি সেখানে নিয়ে আসা হল। দ্রব্য সামগ্রী আনীত হওয়ার পর কৃষ্ণের নির্দেশে রাজপুরোহিত ধৌম্য শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী পূর্বোত্তরে ক্রমশঃ নিম্ন বেদী নির্মাণ করে ব্যাঘ্র চর্মাবৃত আসনে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে উপবেশন করিয়ে বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করতে লাগলেন। যজ্ঞ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সমবেত অতিথিবৃন্দ উঠে দাঁড়িয়ে নতুন রাজাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে গাত্রোত্থান করে পাঞ্চজন্য গ্রহণ করে পাঞ্চজন্যের জলে যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর যুধিষ্ঠির বেদপারগ ব্রাহ্মণদের সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদান করে স্বস্তি বাচন করলেন। এইভাবে কৃষ্ণের তত্বাবধানে সারা ভারতের বিভিন্ন রাজার উপস্থিতিতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হল।

যুধিষ্ঠির নতুন রাজা রূপে অভিষিক্ত হবার পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন সমবেত রাজাদের সামনে তাঁর ভাষণের

মাধ্যমে। যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণের অভিনন্দন জ্ঞাপন কৃষ্ণের সূক্ষ্ম কূটনৈতিক প্রতিভা ও অসাধারণ ভদ্রতার পরিচয়। যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করে কৃষ্ণ ভারতবর্ষের সমবেত রাজাদের সামনে প্রমাণ করলেন যে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। পাণ্ডবদের সাহায্যদানের পিছনে, পাণ্ডবদের হয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার পিছনে তাঁর নিজের কোন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ বা ক্ষমতালিপ্সা,তা ছিল না। তিনি পাণ্ডবদের ক্ষমতার ভাগ চাননি, তিনি পাণ্ডবপক্ষকে সাহায্য করেছিলেন দুর্যোধনের অন্যায় প্রতিরোধ করার জন্য, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার প্রতিরোধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই মহান্ উদ্দেশ্যের জন্যই, পৃথিবীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি কৌরবদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কৃষ্ণ তাঁর কাজের দ্বারা ধীরে ধীরে যে কথা বলতে চেয়েছিলেন, যেভাবে তিনি উপস্থিত নরপতি ও অতিথিবৃন্দের মনে নিজের জন্য সুউচ্চ আসন স্থাপন করছিলেন সূক্ষ্ম মনস্তত্বের খেলা খেলে, সেই কাজটিই কৃষ্ণের হয়ে কৃতজ্ঞ, দুর্বল যুধিষ্ঠির করে দিলেন স্পষ্ট ভাষায় তাঁর প্রথম রাজকীয় ভাষণে কৃষ্ণকে দেবত্বে উন্নীত করে। এইটিই কৃষ্ণ চেয়েছিলেন ; কৃতজ্ঞতা, শতকরা একশোভাগ নিখাদ কৃতজ্ঞতা, উন্নত রাজনীতির সর্বকালের আকাঙ্খিত বস্তু। সাধারণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিনিময়ে কৃষ্ণ চেয়েছিলেন নতুন ভাবমূর্তিতে কৃতজ্ঞ ও বিস্মিত জনসাধারণের মনে চিরস্থায়ী আসন। রাজপদে নব অভিষিক্ত যুদ্ধ বিজয়ী রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর প্রথম উদ্বোধনী ভাষণেই কৃষ্ণকে সেই স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন যেখানে কৃষ্ণ অন্য সবার থেকে পৃথক, বহু দূরের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই নক্ষত্রের আলোয় ভারতবর্ষ কৃষ্ণময়, আলোকিত সমস্ত জনসাধারণ ও নরপতিবৃন্দ।

সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হবার পর কৃষ্ণের অভিনন্দনের উত্তরে রাজা যুধিষ্ঠির ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সমবেত নরপতিবৃন্দের ও প্রজাসাধারণের উপস্থিতিতে এই ভাষণ দিয়েছিলেন—বাসুদেব! আমি

কেবল তোমার অনুগ্রহ, নীতি, বল, বুদ্ধি কৌশল ও বিক্রম প্রভাবেই এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম; অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি অদ্বিতীয় পুরুষ ও যাদবদিগের একমাত্র অবলম্বন। ব্রাহ্মণগণ তোমার বহুবিধ নাম উল্লেখ পূর্বক স্তব করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বকর্মা ও বিশ্বাত্মক; এই জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু, জিষ্ণু, হরি, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম। তুমি সপ্ত আদিত্য। তুমি একমাত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান আছ। তুমি পুণ্যকীর্তি, সত্য হৃষীকেশ ও যজ্ঞেশ্বর। তুমি ব্রহ্মারও গুরু। তুমি ত্রিনয়ন শম্ভু। তুমি দামোদর, বরাহ, অগ্নি ও সূর্য। তুমি ধর্ম, তুমি গরুড় ধ্বজ, তুমি শত্রুসেনাবিমর্দ্দন ও সর্বব্যাপী পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ ও উগ্র। তুমি কার্তিকেয়, সত্য, আনন্দ অচ্যুত ও অরাতি নাশক। তুমি বিপ্রাদি বর্ণ এবং অনুলোম বিলোম জাত। তুমি উর্দ্ধবর্ত্ম ও পর্বত। তুমি ইন্দ্র দর্পহন্তা ও হরিহর রূপী। তুমি সিন্ধু, নির্গুন এবং পূর্বদিক, পশ্চিমদিক ও ঈশানকোণ স্বরূপ। তুমি সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি সম্রাট, বিরাট ও স্বরাট। তুমি ইন্দ্রেরও কারণ। তুমি বিভু, শরীরী ও অশরীরী। তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পিতা। তুমি কপিল। তুমি বামন, যজ্ঞ, যজ্ঞসেন, ধ্রুব ও গরুড়। তুমি শিখণ্ডী ও নহুষ। তুমি মহেশ্বর, দিবস্পৃক, পুনর্ব্বসু, বভ্রু, সুবভ্রু। তুমি সমিদেব, সুষেন, দুন্দুভি, কাল, শ্রীপদ্ম। তুমি পুষ্কর, পুষ্করেক্ষণ, ঋতু ও সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। তুমি চরিত্র, নির্মল, জ্যোতি ও হিরণ্যগর্ভ। তুমি স্বধা ও স্বাহা। তুমি এই জগতের স্রষ্টা এবং তুমিই ইহার সংহর্ত্তা। তুমি অগ্রে এই বিশ্বমধ্যে বেদের সৃষ্টি করিয়াছ এবং চরাচর বিশ্বকে স্ববশে রাখিয়াছ। হে শার্ঙ্গপানে! তোমাকে নমস্কার।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নমস্কার করলেন এবং সেই সঙ্গে সমবেত অতিথি-বৃন্দও অবাক বিস্ময়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে করজোড়ে কৃষ্ণকে প্রণিপাত করলেন। বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান যিনি কংসের

কারাগারে অন্ধকার রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এতদিনে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রমা সাফল্যের শেষ শিখরে আরোহণ করল। প্রতিশোধ থেকে যে রাজনীতির জন্ম, অভিজ্ঞতার বহু কুটিল আবর্ত পার হয়ে সেই রাজনীতি ত্যাগ ও মহানতার স্বর্ণরেণু দিয়ে সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে পরিব্যাপ্ত করে মানবিক মহত্বের এক নতুন সংজ্ঞা সৃষ্টি করল। বিশালত্বের প্রাচুর্যে এত মহান কোন রাজনীতিক ভারতবর্ষ এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি, এর আগে ভারতের কোন রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার উর্দ্ধে উঠে আপামর জনসাধারণের মনে কোন চিরস্থায়ী আসন ছিনিয়ে নিতে পারেন নি। এই প্রথম ভারতের সমবেত নরপতিরা বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন এমন এক কৃষ্ণ রাজনীতিক যার অন্য নাম সাফল্য হলেও যিনি সাফল্যের বিনিময়ে অমৃত ছাড়া আর কিছু চাননি। পার্থিব আকাঙ্খা তিনি হেলায় পরিত্যাগ করেছেন শুধু কর্মে উত্তরণের জন্য। যাঁর জীবনের সত্য প্রতিভাত হয়েছে তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের মধ্যে। তাই যুধিষ্ঠিরের প্রশস্তি বাক্যে কেউ প্রতিবাদ করার স্পর্ধা প্রকাশ করেন নি। নব-অভিষিক্ত রাজা নিজেই যাঁকে সত্য, আনন্দ, অচ্যুত ও অরাতিনাশক বলছেন তখন অতিথিরা তা মানতে বাধ্য হবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সদ্য যুদ্ধ বিজয়ী শক্তিশালী রাজা যাঁকে এই জগতের স্রষ্টা এবং সংহর্ত্তা বলে প্রণিপাত করছেন তখন তাঁর সাহায্যকারী বন্ধু রাজারাও এই কথাই মেনে নেবেন এটাই স্বাভাবিক।

এইভাবে কৃষ্ণ, ক্ষুদ্র মথুরা নগরী ও দ্বারকা অতিক্রম করে জগতের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তায় উন্নীত হলেন গুণমুগ্ধ ভক্তের প্রশস্তিবাণী ও কৃতজ্ঞতায়। যুধিষ্ঠির নিজে অভিষিক্ত হলেন পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্যে কিন্তু কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করলেন দেবত্বে। যুধিষ্ঠিরের অভিষেক তাই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণেরই অভিষেক—মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হওয়ার আনন্দ অভিষেক। এটাই কৃষ্ণ চেয়েছিলেন, এর জন্যই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সমস্ত আয়োজন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে আসার সময়

করে রেখে গিয়েছিলেন রাজপুরোহিত ধৌম্যের মাধ্যমে। কারণ তিনি যুধিষ্ঠির ও অতিথি নরপতিদের মন খুব ভাল করেই জানতেন, তিনি জানতেন তাঁর জীবনব্যাপী রাজনৈতিক সাধনার পুরস্কার তিনি ঠিক সময়ে সকলের উপস্থিতিতেই পাবেন। ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য রাজারা কর্মে কৃষ্ণের অসাধারণ সাফল্যের কারণ স্বরূপ কৃষ্ণের ধর্মপরায়ণতাকেই স্বীকার করবেন। কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক রূপে পরিগণিত হবেন এবং সেখান থেকে দেবত্বে, কারণ একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধার্মিকেরাই দেবত্বে উত্তরণের অধিকারী। কৃষ্ণ যা চেয়েছিলেন, কৃষ্ণের মনের গভীরে যে আকাঙ্খা সুপ্ত অবস্থায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে, নিজের জীবদ্দশাতেই কৃষ্ণ সেই আকাঙ্খার পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করলেন। একজন রাজনীতিকের পক্ষে এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণ অসাধারণ, রাজসভায় রাজা কর্তৃক বন্দিত হয়েও তিনি নিজেকে হারান নি, কোন রকম স্নায়বিক বিচলতা প্রকাশ করেন নি। প্রশংসা বাক্য ও স্তব শুনেও কৃষ্ণ শান্তভাবে যুধিষ্ঠিরের বাক্য শেষ হওয়ার পর সমবেত অতিথিবৃন্দসহ নতুন রাজাকে আবার অভিনন্দন জানালেন এবং আবার নিজের মহত্ব প্রমাণ করলেন। যুধিষ্ঠিরের অভিষেক উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভা কৃষ্ণের দেবত্বে অভিষেকের মধ্য দিয়ে শেষ হল এবং সভা জয় করে কৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মনে এক গভীর ছাপ ফেলে গেলেন যা কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয় না। প্রজা সাধারণ ও অন্যান্য নরপতিরা কৃষ্ণময় হয়ে কৃষ্ণের মোহময় ব্যক্তিত্বে দ্রবীভূত হয়ে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করতে লাগলেন। ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশী প্রচারিত যুদ্ধের ওপর যবনিকা পড়ল এবং মহালোকক্ষয়কারী এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ সারা ভারতে প্রচারিত হল একটি নাম—কৃষ্ণ। ভারতবাসী জানলেন কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির প্রভাবেই সহায় সম্বলহীন পাণ্ডবেরা মহাশক্তিধর কৌরবদের পরাজিত করে রাজ্য ছিনিয়ে নিতে পেরেছেন। যে কৃষ্ণের এত অলৌকিক ক্ষমতা তিনি কখনও সাধারণ মানুষ হতে পারেন না তিনি দেবতা, তিনি ভগবান—তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। একজন উচ্চাকাঙ্খী

মানবরূপে গভীর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণ ভগবান হয়েছিলেন ভগবানের উপযুক্ত গুণাবলী অর্জন করে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টিকে ভগ বলে। যে ব্যক্তির মধ্যে এই ছয়টি পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তিনিই ভগবান্ পদবাচ্য। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ/ জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা। কৃষ্ণের মধ্যে এই ছয়টি গুণ পূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল, কোনটিরই বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। তাই অনায়াসে অন্য সবাইকে অতিক্রম করে তিনি ভগবত্ত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বীর্য ও জ্ঞানের দ্বারা ঐশ্বর্য ও যশ আহরণ করেও তার প্রতি আসক্তিহীন হয়ে বৈরাগ্যভাব অবলম্বনপূর্বক শ্রীযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন।

[বারো]

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক শেষ হওয়ার পর কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠির সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী নিয়োগ করে তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব দিলেন। ভীম হলেন যুবরাজ, বিদুর মন্ত্রণা ও সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতির ভার পেলেন, বৃদ্ধ সঞ্জয় পেলেন অর্থ দপ্তর, নকুল পেলেন সেনাবিভাগ ও সৈন্য সামন্তের পরিচালনা, মহাবীর অর্জুন পেলেন প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ, সহদেব পেলেন স্বাস্থ্য বিভাগ এবং প্রধান পুরোহিত ধৌম্য পেলেন ধার্মিক আচার অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত কৌরব রাজ্যের প্রশাসনকে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরামর্শ মত শক্ত কাঠামোর ওপর দাঁড় করালেন।

কৃষ্ণের কাজ এবার শেষ হল। তিনি চেয়েছিলেন পাণ্ডবদের যুদ্ধে জয়ী করে শত্রুহীন নিরাপদ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেই কাজ এখন সুসম্পন্ন হয়েছে। পাণ্ডবরা এখন শত্রুহীন নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করতে পারবেন। পুনরায় রাজ্য হাতছাড়া হওয়ার কোন ভয় পাণ্ডবদের আর আপাততঃ নেই। কাজেই এখন কৃষ্ণের হস্তিনায় থেকে পাণ্ডবদের পরামর্শ দেওয়ার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। পাণ্ডব ভাইদের সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির নিজেই রাজ্য পরিচালনায় সক্ষম। অন্যদিকে কৃষ্ণ দীর্ঘদিন নিজ রাজ্য দ্বারকা থেকে দূরে রয়েছেন। দ্বারকার প্রশাসনিক ভার বৃদ্ধ উগ্রসেনের ওপর ন্যস্ত। উগ্রসেন বৃদ্ধ ও মৃত রাজা কংসের পিতা, তাই যাদবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কিভাবে তিনি দ্বারকা পরিচালনা করছেন, এ নিয়ে কৃষ্ণের চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। এতদিন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কৃষ্ণ নিজ রাজ্য দ্বারকার কথা চিন্তা করতে পারেননি, কিন্তু এখন সব ব্যস্ততা শেষ হওয়ায় কৃষ্ণ দ্বারকার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

কৃষ্ণের মনে হল তাঁর এবার দ্বারকায় ফিরে যাওয়া উচিত। দীর্ঘদিন তিনি বন্ধু অর্জুনের সাহায্য করেছেন, অর্জুনের পাশে পাশে রয়েছেন, কিন্তু অর্জুন এখন নিরাপদ, নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, এবার তাই কৃষ্ণ, অর্জুন ও পাণ্ডব ভাইদের কাছে বিদায় চাইতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণ জানতেন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত, হঠাৎ তাঁর কাছে গিয়ে বিদায় চাইলে যুধিষ্ঠির সহসা নিজেকে অসহায় মনে করে দিশাহারা হয়ে পড়তে পারেন। কৃষ্ণ তাই বন্ধু অর্জুনকে জানালেন তাঁর দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার মনোবাসনা। অর্জুনকে তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জানানোর জন্য অনুরোধ করলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে অনেক কথা বলার পর বললেন—আমি তোমার সহিত এই স্বর্গতুল্য পরম পবিত্র রমণীয় সভামধ্যে অবস্থান করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলাম। একাল পর্যন্ত আমি পুত্র, বলদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিদিগের দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে দ্বারকা নগরীতে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। অতএব তুমি আমার দ্বারকা গমনে অনুমোদন কর। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার উপদেষ্টা হইলেও যে সময়ে ভীষ্মদেব তাহাকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করেন, তৎকালে আমিও তাহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছি। তিনি ধার্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান ও স্থির নিয়ম সম্পন্ন। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে ধর্মরাজের নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকাগমন প্রস্তাব কর। দ্বারকা নগরীতে গমনের কথা দূরে থাক, প্রাণ রক্ষার নিমিত্তও আমি তাহার অপ্রিয় কার্য সাধন করিতে সম্মত নহি। আমি সত্য কহিতেছি, কেবল তাহারই প্রীতির নিমিত্ত এই যুদ্ধাদি কার্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমার এস্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন সবলে নিহত হইয়াছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিবিধ রত্নপূর্ণা সসাগরা পৃথিবী স্ববশে সমানীত করিয়াছেন, অতঃপর

উনি সিদ্ধ মুনিগণে পরিবেষ্টিত বন্দিগণ কর্তৃক সংস্তুত হইয়া ধর্মানুসারে সমুদয় পৃথিবী প্রতিপালন করুন। এক্ষণে তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকা গমন প্রস্তাব কর। আমি ধন, প্রাণ প্রভৃতি সমুদয়ই যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার পরম প্রিয় ও মান্য। এখন তোমার সহিত একত্র অবস্থান ভিন্ন আমার এখানে বাস করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এই সময়ে একবার দ্বারকা গমন করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

বিদায় প্রার্থনায় ও কৃষ্ণ কত মহান্। তিনি অনায়াসেই রূঢ়ভাবে যুধিষ্ঠিরকে বলতে পারতেন, আমি তোমার অনেক কাজ করে দিলাম, তোমায় রাজা বানিয়ে দিলাম এবার নিজের রাজ্য নিজে সামলাও, আমি দ্বারকায় ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু কৃষ্ণ কখনও উচ্চমন্যতাবোধে আক্রান্ত হননি তাই তাঁর কথা ও ব্যবহারে কখনও রূঢ়তা প্রকাশ পায়নি। সব মহান্ রাজনীতিকের মতই কৃষ্ণ ও নিজের আমিত্ব প্রকাশ করেছেন কখনও কখনও, কিন্তু সেই আমিত্বের প্রকাশ নিছক মনের অহমিকা বোধের সতুষ্টির জন্য নয়। কৃষ্ণ আমিত্ব প্রকাশ করেছেন অন্যের ওপর নিজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার কৌশল হিসাবে এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন তা একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল কেবল মাত্র তখনি।

কৃষ্ণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান স্তম্ভ বিনয়। কৃষ্ণ জানতেন পাণ্ডব ভ্রাতারা তাঁর প্রতি অতলান্ত কৃতজ্ঞতার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে আছেন, তবু তিনি কোন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেন না, কারো মনে কোন আঘাত দিলেন না। বিনীত ভাবে যুধিষ্ঠিরের অনেক প্রশস্তি করে নিজেকে যুধিষ্ঠিরের সেবক প্রতিপন্ন করে বন্ধু অর্জুনের মারফৎ যুধিষ্ঠিরের বিদায় প্রার্থনা করলেন। অথচ অর্জুনের প্রতি এই সংক্ষিপ্ত বিদায়-অনুরোধের মধ্যেই ফুটে উঠেছে কৃষ্ণের চরিত্রের কঠোর বাস্তববাদী বৈশিষ্ট্যটি। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গী হয়েছিলেন, এখন রাজনৈতিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই শুধুমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে

তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে অলসভাবে দিন কাটিয়ে সময়ের অপচয় করতে রাজী নন। বন্ধু অর্জুনের উপকার করা ও তাঁকে সঙ্গ দানই কৃষ্ণের মত মহান্ রাজনীতিকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করে আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা লাভের জন্য তিনি সব-সময়েই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু তাই বলে মানবিক মূল্যবোধকে তিনি কখনও অস্বীকার করেননি। অন্য সবার মতই তাঁর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি মানবিক আবেগ-সঞ্জাত অনুভূতিসমূহ বর্তমান ছিল, কিন্তু শুধু সাধারণ মানুষের মত এই আবেগ, অনুভূতি-সমূহের প্রকাশ অনিয়ন্ত্রিত ছিল না। কৃষ্ণের প্রতিটি অনুভূতির প্রকাশ সংযমে মহান্। সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে নিজের মনের অনুভূতি প্রকাশ করে কৃষ্ণ নিজের ব্যক্তিত্বের তীব্রতা দ্বারা অন্যকে অভিভূত করেছেন। কিন্তু নিজের মানসিক দৃঢ়তা থেকে একটুও বিচ্যুত হননি। তাই যখন কৃষ্ণের ধারণা হল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর ইন্দ্রপ্রস্থে থাকা মানে শুধু বন্ধু অর্জুনের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা, এ থাকার কোন রাজনৈতিক প্রয়োজন নেই। তখন কৃষ্ণ কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেও বন্ধু অর্জুনকে—এখন তোমার সহিত একত্র অবস্থান ভিন্ন আমার এখানে বাস করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এই সময়ে একবার দ্বারকা গমন করা আমার অবশ্য কর্তব্য—বলে আসল কথাটি জানিয়ে দিতে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করেননি।

কৃষ্ণের এই মনোভাব সময় ও কর্তব্য সম্বন্ধে কৃষ্ণের সচেতনতা প্রকাশ করে। আবার দ্বারকায় যাওয়ার জন্য যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করার মধ্যে কৃষ্ণের কূটনৈতিক রীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ কৃষ্ণ, অর্জুন ও পাণ্ডবদের বন্ধু হলেও দ্বারকার নেতা এবং যুধিষ্ঠিরও হস্তিনার রাজা। কাজেই কৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠিরের অতিথি। সেইজন্য একজন অতিথি নেতা, যে রাজার আতিথ্য স্বীকার করেছেন তাঁকে না জানিয়েই অথবা তাঁর অনুমতি না নিয়েই তাঁর রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেলে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের বিরোধিতা করা হয়।

কূটনীতির সম্রাট কৃষ্ণ কখনও এই সামান্য ভুল করে নিজ হাতে তৈরী হস্তিনা রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারেন না। তাই তিনি কূটনীতির স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন হস্তিনা ত্যাগের জন্য।

কৃষ্ণের কথায় অর্জুন সম্মত হওয়ার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনে হস্তিনার রাজদরবারে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করবেন স্থির করলেন। কৃষ্ণের ভয় ছিল হয়ত অর্জুন নিজেই প্রথমে কৃষ্ণের দ্বারকা গমনে আপত্তি করবেন। কৃষ্ণ তাই অর্জুনকে দ্বারকা গমনের প্রধান কারণ হিসাবে বৃদ্ধ পিতা মাতার সঙ্গে দীর্ঘদিনের অসাক্ষাৎকারকে দেখালেন। তিনি অর্জুনকে বিভিন্ন ধর্মোপদেশ দিয়ে ধর্ম ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেন যে পিতা মাতার সঙ্গে অনেকদিন তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি তাই তিনি দ্বারকায় যেতে চান। অর্জুন হয়ত প্রিয় বন্ধু ও উপকারীকে ফিরে যেতে দিতে এত সহজে সম্মত হতেন না, কিন্তু পিতা মাতার কথা শুনেই তাঁর ধর্মভীরু মন দুর্বল হয়ে পড়ল, তিনি এক কথাতেই সম্মত হলেন।

অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ এরপর রাজদরবারে যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন বিদায় প্রার্থনা করতে। কৃষ্ণ ও অর্জুনকে একসঙ্গে দেখেই যুধিষ্ঠিরের ধারণা হল বিশেষ কোন কাজের জন্য এঁরা রাজদরবারে একসঙ্গে এসেছেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন কৃষ্ণের হয়ে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন দ্বারকায় প্রত্যাগমন করার জন্য কৃষ্ণের মনোবাসনা। ফিরে যাওয়ার কারণ হিসাবে কৃষ্ণের পূর্ব নির্দেশ মত অর্জুন কৃষ্ণের পিতা মাতাকে দর্শন করার ইচ্ছার কথা জানালেন। পিতামাতার কথা শুনে যুধিষ্ঠির কোন আপত্তি করলেন না। যদিও যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছে ছিল কৃষ্ণের মত বিপদ-সহায় উপদেষ্টাকে যতদিন সম্ভব হস্তিনায় ধরে রাখা যায় ততই তাঁর নিজের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু পূর্ণ রাজদরবারে কৃষ্ণকে দ্বারকা গমনের অনুমতি দিয়ে নিজের অহমিকা বোধকে আরো একধাপ ওপরে তোলার সুযোগ যুধিষ্ঠির ছাড়তে চাইলেন না। তাছাড়া কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যা-

গমনের প্রস্তাব স্বয়ং মহাবীর অর্জুনের, কাজেই সেই প্রস্তাবে যুধিষ্ঠিরের অসম্মতি প্রকাশ করার ক্ষমতা কোথায়? তাই ইচ্ছাতেই হোক, অনিচ্ছাতেই হোক যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে দ্বারকায় গমনের অনুমতি দিয়ে বসুদেব ও দেবকীকে তাঁর ও তাঁর ভাইদের প্রণাম জানাতে বললেন। শুধু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন তখন কৃষ্ণকে অবশ্যই হস্তিনায় আসতে হবে। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথায় সম্মত হওয়ার পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তৎকালীন কূটনৈতিক ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিদায় দিলেন।

যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ কুন্তী ও বিদুর সহ অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকেও বিদায় প্রার্থনা করলেন এবং কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে ভগ্নী সুভদ্রাকে দ্বারকায় নিয়ে যাবার জন্য নিজের সঙ্গে নিলেন। যাত্রাকালে কৃষ্ণকে ভীমসহ রাজ দরবারের অমাত্যবৃন্দ ও সমস্ত পুরবাসী বিদায় জ্ঞাপন করলেন। কৃষ্ণ সবাইকে বিদায় জানিয়ে সাত্যকি ও দারুককে দ্রুত দ্বারকা অভিমুখে রথ চালনা করতে অনুজ্ঞা করলেন।

[তেরো]

এরপর কৃষ্ণের জীবন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। কৃষ্ণের জীবন থেকে বৃহস্পতির প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে একসময় বিলীন হয়েছে। হয়ত সব রাজনীতিকের জীবনেই তা হয়। একসময় তাঁরা খ্যাতি ও ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেন এবং অন্য সময় ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিস্মৃতির অতলে চলে যান। কৃষ্ণের মত মহান্ রাজনৈতিক-দার্শনিক বিস্মৃতির অতলে চলে যেতে পারেন না কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন। যে কোন মহান্ রাজনীতিবিদের পক্ষেই কালের প্রভাবে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া সম্ভব এবং তাতে অগৌরবের কিছু নেই, ক্ষমতাচ্যুতির কারণ যাই থাক্ না কেন। কৃষ্ণ ঠিক আক্ষরিক অর্থে ক্ষমতাচ্যুত হননি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দ্বারকার রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁরই করায়ত্ত ছিল। দ্বারকার সিংহাসনে কৃষ্ণের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু দ্বারকা থেকে দূর হস্তিনায় কৃষ্ণের সুদীর্ঘ অবস্থান এবং দ্বারকায় তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য যে প্রশাসনিক শৈথিল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে যাদবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভেদাভেদ বেড়ে গিয়েছিল এবং দ্বারকায় কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের পরেও তা থামেনি বরং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের রেশ এসে দ্বারকা রাজ্যকেও স্পর্শ করেছিল। কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে আসার পরেই যাদবদের ভাগ্য অভাবনীয় ভাবে এক নাটকীয় মোড় নিয়েছিল এবং কৃষ্ণের মহানতা যাদবদের ভাগ্যের সেই পথ পরিবর্তনকে থামানোর কোন সুযোগ পায়নি।

দ্বারকায় এসে কৃষ্ণ যখন পৌঁছলেন তখন রৈবতক পর্বতে মহোৎসব হচ্ছে। দারুক ও সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ রৈবতক পর্বতে এসে পৌঁছলেন। দ্বারকাবাসীরা বিভিন্ন বর্ণের সমুজ্জ্বল পোষাক পরে মদমত্ত হয়ে তখন আনন্দ করছিল। যাদবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণকে দেখে তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে এসে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। কৃষ্ণ তাঁদের কুশল সম্ভাষণ করে কিছুক্ষণ রৈবতক পর্বতে মহোৎসব দেখলেন, তারপর সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাসভবনের দিকে অগ্রসর হলেন। ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতি প্রধান প্রধান যাদব গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কৃষ্ণের অনুগামী হলেন। বন্ধু অমাত্য ও অনুরাগীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কৃষ্ণ এলেন নিজের বাসভবনে। দীর্ঘদিন পরে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ঘটল। পিতামাতার সঙ্গে কুশল বিনিময় করার পর কৃষ্ণ পাদ প্রক্ষালন করে আসন গ্রহণ করলেন।

কৃষ্ণ অনেকদিন দ্বারকা নগরী থেকে দূরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাই দ্বারকা নগরীর সবাই কৃষ্ণের মুখ থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা শোনার জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। এখন কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে আসা মাত্র যাদব বংশীয়েরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা শোনার আশায় তাঁর আসনের চারপাশে ভীড় করে গোল হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। কোন্ উপায়ে প্রবল পরাক্রান্ত কৌরবদের বিরুদ্ধে সহায় সম্বলহীন পাণ্ডবদের জয়ী করে কৃষ্ণ অসাধ্য সাধন করলেন সেই কথা শোনার আশায় ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের নেতারা উদ্‌গ্রীব হয়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। অন্যরা ধৈর্য্য সহকারে কৃষ্ণের বাক্য শুনতে লাগলেন। কৃষ্ণ সংক্ষেপে যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে একে একে মহাবীর ভীষ্মের মৃত্যু, কর্ণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি মহাবীরদের সঙ্গে পাণ্ডবদের ভয়ংকর যুদ্ধ এবং কৌরব পক্ষের মহারথীদের পতন, সবই বর্ণনা করলেন। সবশেষে রাজা দুর্য্যোধন ও ভীমের গদাযুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পরাজয়ের কথা বলে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা শেষ করলেন। কৃষ্ণ কিন্তু ভুলেও একবার অভিমন্যুর নাম উচ্চারণ করলেন না, অভিমন্যু বধের কথা বলা দূরে থাক্। অভিমন্যু ছিলেন কৃষ্ণের বোন সুভদ্রার

পুত্র এবং সেই সম্পর্কে কৃষ্ণের ভাগ্নে ও কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের দৌহিত্র। কৃষ্ণ পিতা বসুদেবকে অভিমন্যুর বধের বৃত্তান্ত বলতে চাননি কারণ বৃদ্ধ বসুদেব দৌহিত্রের মৃত্যু সংবাদ সহ্য করতে পারবেন কিনা অথবা প্রিয় দৌহিত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর নিজের মানসিক ভারসাম্য কতটা অটুট থাকবে কৃষ্ণ তা জানতেন না। সেইজন্যই তিনি সুকৌশলে অভিমন্যু বধের বৃত্তান্ত এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণের পাশে বসে থাকা কৃষ্ণের ভগ্নী ও অভিমন্যুর মাতা সুভদ্রার ইচ্ছা ছিল যে, কৃষ্ণ অভিমন্যু বধের কাহিনী সমবেত বিশিষ্ট শ্রোতাদের শোনান। তাহলে উপস্থিত বিশিষ্ট শ্রোতারা জানতে পারবেন যে অভিমন্যুর ওপর কত বড় অন্যায় হয়েছে, সপ্তরথী মিলে কিভাবে অন্যায় যুদ্ধে বালক অভিমন্যুকে বধ করেছেন। আর সেই সঙ্গে সমবেত সবাই জানতে পারবেন বালক অভিমন্যুর অসীম বীরত্বের কথা। যে বালক বীরকে বধ করার জন্য সাতজন মহারথীর দরকার হয় তাঁর মাতা হওয়াতো পরম গৌরবের কথা। সবার সামনে অভিমন্যুর বীরত্বের কাহিনী কৃষ্ণকে দিয়ে প্রকাশ করিয়ে সুভদ্রা মাতৃত্বের সেই গৌরবটুকু অর্জন করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ বৃদ্ধ বসুদেবের মনে দৌহিত্র বিয়োগের ব্যথা দিতে চাননি বলেই অভিমন্যু-কাহিনী বর্ণনা করেননি।

কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা শেষ হওয়ার পর সুভদ্রা যখন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কেন তিনি অভিমন্যু বধের কাহিনী বর্ণনা করলেন না? তখন সেই কথা শুনে বৃদ্ধ বসুদেবও প্রিয় দৌহিত্রের বধ বৃত্তান্ত শোনার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। বারবার তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করতে লাগলেন অভিমন্যু বধের বৃত্তান্ত বর্ণনা করার জন্য। পিতার অনুরোধে কৃষ্ণ যথাসম্ভব সংযমের সঙ্গে অভিমন্যুর বীরত্বের কথা ও সপ্তরথী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুবরণের কথা বর্ণনা করলেন। কিন্তু ঘটনার আগাগোড়া বর্ণনা কৃষ্ণ এমন ভাবে করলেন যাতে অভিমন্যুর বীরত্বই প্রধান বিষয়। সপ্তরথী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর মৃত্যুর

ঘটনা গৌণ, মুখ্য বিষয় হল বালক অভিমন্যু কত বড় বীর ছিলেন এবং কিভাবে তিনি সাতজন কৌরব মহারথীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

কৃষ্ণের এইভাবে বলার উদ্দেশ্য ছিল যাতে অভিমন্যুর বীরত্বের বর্ণনা শুনে তাঁর বৃদ্ধ মাতামহ বসুদেব দৌহিত্রের বীরত্বে গর্বিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মন থেকে দৌহিত্রের মৃত্যুজনিত শোক দূর হয়ে যায়। কৃষ্ণ চেষ্টা করেছিলেন ঠিক উপায়েই, কারণ মানুষের মনের ওপর দখল তাঁর মত আর কারো ছিল না, কিন্তু তবুও তিনি বৃদ্ধ পিতা বসুদেবের শোক প্রশমন করতে সক্ষম হলেন না। প্রিয় দৌহিত্রের মৃত্যু সংবাদে বসুদেব শোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। শোক প্রশমিত হওয়ার বদলে আরো বেড়ে উঠল দেখে কৃষ্ণ রণক্ষেত্রে অভিমন্যুর মৃত্যুর পর অভিমন্যুর মাতা সুভদ্রা ও অন্যান্য পাণ্ডব নারীদের শোকের কথা বর্ণনা করলেন। যাতে সুভদ্রার পুত্র বিয়োগ-জনিত শোকের কথা শুনে বসুদেবের খেয়াল হয় যে তিনি মাতামহ হয়ে এইভাবে শোকে ভেঙ্গে পড়লে তাঁর কন্যা সুভদ্রা তাহলে কি করবেন? কারণ সুভদ্রাতো অভিমন্যুর মাতা, সদ্য সন্তানহারা সুভদ্রা তাঁর পিতা বসুদেবকে শোকে কাতর দেখলে স্বাভাবিক ভাবেই আরো শোকাহত হয়ে পড়বেন। তাই সুভদ্রার মনের দিকে তাকিয়েই বসুদেবের নিজের শোক সম্বরণ করা উচিত। এইভাবে কৃষ্ণ এক কাহিনীর পরিণামকে অন্য কাহিনী দিয়ে রুদ্ধ করে সূক্ষ্ম মনের খেলা খেলে বৃদ্ধ পিতা বসুদেবের শোক প্রশমিত করে তাঁকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনলেন এবং ধীরে ধীরে সমবেত ব্যক্তিদের মন থেকেও সাময়িক শোকভাব দূর হল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা শেষ হওয়ার পর যাদব বংশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কৃষ্ণকে অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

দ্বারকায় ফিরে আসার পর কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে দ্বারকার কতটা ক্ষতি হয়েছে। দক্ষ রাজ্য পরিচালনার অভাবে এবং শত্রুহীন নিরাপদ জীবন যাপনের ফলে যাদবরা বিলাসী, আরামপ্রিয়, শ্রমবিমুখ ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলেন। এর ওপরে

যাদবদের ছিল গর্ব, কৃষ্ণ-গর্বে গর্বিত যাদবরা সামাজিক প্রথা ও অন্যান্য মূল্যবোধকে অবহেলা করতে শুরু করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের কাছে সম্মান হারাচ্ছিলেন, গুরুজনেরা অবহেলিত হচ্ছিলেন। লজ্জা ও ধর্মবোধ যাদবরা সেই সময় একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে সর্বপ্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নারী ও সুরাকে একমাত্র অবলম্বন করে স্থূল বিলাসের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যাদবরা মনুষ্য জাতির অবধ্য, মানুষেরা যাদবদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না কারণ তাঁদের রক্ষা কর্তা স্বয়ং কৃষ্ণ, যাঁর নামের সঙ্গে দৈবী শক্তি জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁরা একথা ভুলে গিয়েছিলেন যে অন্য কেউ তাঁদের ক্ষতি না করলেও তাঁরা নিজেরাই নিজেদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধনে সক্ষম।

যাদব স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে সেই সময় সুরা পানের ও যৌন ব্যভিচারের প্রবণতা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা প্রকাশ্যেই সুরাপান করে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের অসম্মান করে যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন। সমগ্র যাদব সমাজ মদ্যপায়ীতে পরিণত হয়েছিল। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে যাদবদের এই অভাবনীয় চারিত্রিক পরিবর্তন দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন যে যাদবদের জীবনধারা এইভাবে উচ্ছৃঙ্খল পথে এগোতে থাকলে তাঁদের ধ্বংস অনিবার্য। সেই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে যাদবদের রক্ষা করতে হলে সুরা ও নারী থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণ এই কথা চিন্তা করে বিভিন্ন যাদব গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় বসলেন। আলোচনা করে সর্বসম্মত উপায়ে সুরা প্রস্তুত নিষিদ্ধ করা হবে বলে স্থির হল। সেইমত কৃষ্ণ, বলরাম, আহুক ও বভ্রুর নামে এক নির্দেশনামা দ্বারকা নগরীর সমস্ত অধিবাসীর ওপর জারি করা হল। নির্দেশ নামায় বলা হল—আজ অবধি নগর মধ্যে কোন ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সুরা প্রস্তুত করিবে তাহাকে সবান্ধবে শূলে আরোপিত করা যাইবে।

কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়ে সুরা প্রস্তুত বন্ধ করা গেলেও, সুরাপানের ইচ্ছা বন্ধ করা যায় না, একথা অন্য কেউ না বুঝলেও কৃষ্ণ বুঝতেন। তার ওপর রয়েছে যৌন ব্যাভিচার। যৌন ব্যাভিচার এমনিতেই গোপনে সংঘটিত হয় তার ওপর সুরা প্রস্তুতের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি করায় ব্যাভিচারী নারী ও পুরুষেরা আরো সাবধান হয়ে যাবে। ফলে গোপন অপরাধ আরো গোপনে সংঘটিত হবে এবং যাদব নারী ও পুরুষের চারিত্রিক কলুষতা থেকেই যাবে। এই চারিত্রিক কলুষতা থেকে সমগ্র যাদব সমাজকে বিমুক্ত করতে না পারলে যাদবদের ধ্বংস অনিবার্য। এ ছাড়া যাদবদের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের সামাজিক নিয়ন্ত্রণেরও প্রয়োজন। ব্যক্তির মনে ও সমষ্টিগতভাবে সমাজে ধর্মবোধ ফিরিয়ে আনা একান্ত দরকার। ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধের প্রতি সম্মানবোধ তা না হলে ফিরে আসবে না এবং সমাজ সুস্থ হবে না। কৃষ্ণ যাদব সমাজের এইসব দোষ স্খালন করে কিভাবে এক সুস্থ যাদব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা যায় সেই কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

তিনি জানতেন যাদবরা যে পরিমান মদ্যপায়ী হয়েছে তাতে শুধু রাজকীয় নির্দেশনামা জারি করলেই মদ্য প্রস্তুত বন্ধ হবে না। গোপনে গোপনে মদ প্রস্তুত হয়ে যাদবদের চারিত্রিক অধঃপতনে ইন্ধন যোগাবে। একজন মহান্ নেতার মতই কৃষ্ণ তাই যাদবদের চরিত্রের নৈতিক মান উন্নয়নের কথা চিন্তা করলেন। কারণ কৃষ্ণের দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা বুঝতে পেরেছিল যে একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি হচ্ছে সমাজের নৈতিকতা। যে সমাজের নৈতিকতার মান যত উচ্চ সেই সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য তত সুস্থ। কৃষ্ণ তাই যাদব সমাজের লুপ্ত প্রায় নৈতিক মান ফিরিয়ে আনতে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

তিনি স্থির করলেন সমস্ত দ্বারকাবাসীকে নিয়ে এক বিরাট যাত্রা করবেন প্রভাসতীর্থ অভিমুখে। ধর্মবিমুখ যাদবরা তৎকালীন

সামাজিক রীতি বিস্মৃত হয়ে তীর্থ গমনে বিমুখ হয়েছিলেন। কৃষ্ণ তাই যাদবদের তীর্থে নিয়ে গিয়ে তাদের মনে-ধর্মভাব পুনরায় জাগিয়ে তুলতে চাইলেন, যাতে পাপাচার পরিত্যাগ করে তারা পুনরায় সুস্থ মানসিকতার অধিকারী হন। এই কথা চিন্তা করে কৃষ্ণ, আবার বৃষ্ণি ভোজ ও অন্ধক প্রভৃতি প্রধান প্রধান যাদব গোষ্ঠীর নেতাদের আলোচনায় আহ্বান করে তাঁর মনোবাসনা জ্ঞাপন করলেন। তিনি তাঁদের জানালেন যে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সমস্ত দ্বারকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রভাসতীর্থ দর্শনে যেতে চান, সেইজন্য নগরের মধ্যে যেন এই মর্মে একটি ঘোষণা করে সমস্ত দ্বারকাবাসীকে প্রভাস তীর্থে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কৃষ্ণের বাক্য অমান্য করার ক্ষমতা যাদবদের কোন গোষ্ঠীর নেতারই ছিল না। সেইজন্য তাঁরা কৃষ্ণের বাক্য শিরোধার্য করে দ্বারকা নগরীর মধ্যে সমস্ত নগরবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন যে, সব নাগরিককে প্রভাসতীর্থে যেতে হবে। সেইমত দ্বারকাবাসী সমস্ত যাদবেরা যেন নিজেদের যাত্রার জন্য প্রস্তুত করেন।

এই ঘোষণায় যাদবদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। তারা প্রভাসতীর্থে যাওয়ার জন্য নানাভাবে প্রস্তুত হতে লাগলেন। প্রকৃত পক্ষে এই যাত্রার জন্য উদ্দীপনা যাদবদের কাছে এক উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করল। দ্রুত প্রস্তুতির সমষ্টিগত উত্তেজনায় ধর্ম-যাত্রার ভাব-গাম্ভীর্য্য বিলুপ্ত হয়ে এক চপল প্রাণচাঞ্চল্য প্রকাশ পেল। ধর্ম-যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে যাদবরা নানা প্রকার ভক্ষ্য ও ভোজ্যদ্রব্য এবং পানীয় ও সুরা, মাংস প্রভৃতি তৈরী করে প্রভাসতীর্থে ধর্ম যাত্রার জন্য সপরিবারে প্রস্তুত হতে লাগলেন। যে নিষেধাজ্ঞার ফলে সুরা প্রস্তুত যাদবদের মধ্যে নিষিদ্ধ হয়েছিল, এই প্রভাস যাত্রা সেই নিষেধাজ্ঞার বাধা ভেঙ্গে আবার যাদবকুলে সুরা প্রস্তুতের সুযোগ এনে দিল। কারণ এই নিষেধাজ্ঞা কেবল দ্বারকা নগরীর ভৌগলিক সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বারকার বাইরে বেরোলেই এই নিষেধাজ্ঞার কোন

সরকারী মূল্য নেই এবং দ্বারকার বাইরে এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গকারীকে রাজা আইনতঃ কোন শাস্তি দিতে পারেন না—একথা মদ্যপায়ী যাদব সম্প্রদায় বেশ ভাল করেই জানতেন। সেইজন্য প্রভাস তীর্থে পৌঁছে প্রাণ ভরে মদ্যপান করে, নিষেধাজ্ঞার ফলে শুকিয়ে যাওয়া কণ্ঠনালীকে আবার সুজলা করে তুলতে তারা সর্বতোভাবে যত্ন নিলেন।

প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে যাত্রা শুরু হল। বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক ও অন্যান্য যাদবগোষ্ঠী যাত্রা শুরু করলেন প্রভাসতীর্থের উদ্দেশ্যে। তাঁদের এই বিশাল ঐতিহাসিক ধর্মযাত্রায় নেতৃত্ব দিলেন কৃষ্ণ এবং বলরাম, বভ্রু, সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি বিভিন্ন যাদব গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগন। নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দিবারাত্র পদযাত্রা করে যাদবেরা অবশেষে পরিশ্রান্ত হয়ে এসে পৌঁছলেন প্রভাসতীর্থে। সঙ্গে এল বহু সংখ্যক সৈন্য, হস্তী, অশ্ব, রথ এবং নট, নর্তক ও নর্তকী। যাদবরা পৃথক পৃথক আবাসস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পবিত্র প্রভাস তীর্থে এসে পথশ্রমে শ্রান্ত ও ক্লান্ত যাদবরা সুরাপান করে নর্তকীর নৃত্য দর্শন করে শ্রমোপনদন করতে লাগলেন। তাঁরা ভুলেই গেলেন কি উদ্দেশ্যে কোথায় এসেছেন। আনন্দে উন্মত্ত যাদব সম্প্রদায় তীর্থে ব্রাহ্মণদের নিবেদন করার জন্য যে অন্ন সমুদয় আনা হয়েছিল তাতে সুরা মিশিয়ে বানরদের খেতে দিলেন। এইভাবে নারীসহ সুরাপান করে যাদবরা ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে প্রভাসতীর্থে অবস্থান করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব পক্ষের হয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন, সেই সময় যুদ্ধে যোগদানকারী অন্যান্য বহু যাদবের সঙ্গে সাত্যকি ও কৃতবর্মাও যুদ্ধে যোগদান করে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী পক্ষাবলম্বন করেন। সাত্যকি কৃষ্ণের পদানুসরণ করে পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেন। কৃতবর্মা নিজের বিবেচনা অনুযায়ী কৌরবপক্ষে যোগদান করেন। সাত্যকি ও কৃতবর্মা অন্যান্য যাদবদের ন্যায় সাধারণ যাদব ছিলেন না। তাঁরা যাদবদের এক একটি গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। নিজের নিজের

গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁদের অসংখ্য অনুগামী ছিল, সেইজন্য দ্বারকার আভ্যন্তরীণ যাদব-রাজনীতিতে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল।

সাত্যকি ও কৃতবর্মা নিজের নিজের রাজনৈতিক শক্তির বলে পরস্পরের সঙ্গে সমগ্র যাদবকুলের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতেন। সাত্যকি বৃষ্ণিবংশীয় ছিলেন বলে কৃতবর্মাকে হেয় জ্ঞান করে রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁকে দুর্বল করার চেষ্টা সবসময় করতেন। কৃতবর্মাও ঠিক অনুরূপ ভাবে সাত্যকিকে কৃষ্ণের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে তাঁর রাজনৈতিক শক্তি ক্ষয় করে রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাসের চেষ্টা করতেন। সাত্যকি ও কৃতবর্মা যাদবকুলের এই উভয় নেতাই নিজেকে কৃষ্ণের পর যাদবদের একমাত্র নেতা হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। যাদবদের মধ্যে তাদের সর্বজন স্বীকৃত রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণের পর দ্বিতীয় স্তরের নেতাদের মধ্যে সাত্যকি ও কৃতবর্মার নামই উল্লেখযোগ্য। বভ্রু, গদ, শাম্ব, চারুদেষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী যাদবেরা যদিও দ্বারকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, তবু তাঁদের কেউই নেতৃত্বের বিচারে সাত্যকি অথবা কৃতবর্মার সমকক্ষ ছিলেন না।

সাত্যকি ও কৃতবর্মার নিজস্ব অনুগামী ছিল যা অন্য কোন দ্বিতীয় স্তরের নেতার ছিল না। ফলে এই দুই যাদব নেতার মধ্যে রাজনৈতিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতা লেগেই থাকত এবং তাঁরা দুজনেই যাদবদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে কৃষ্ণের সমর্থন আদায় করে একে অন্যকে ক্ষমতার রাজনীতিতে ঘায়েল করার চেষ্টা করতেন। এই ক্ষমতার রাজনীতির মারপ্যাঁচে সাত্যকি কৃতবর্মার চেয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন, কারণ সাত্যকি বৃষ্ণিবংশীয় যাদব বলে কৃষ্ণের সাত্যকির ওপর কিছুটা দুর্বলতা ছিল, যদিও প্রকাশ্যে দ্বারকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কৃষ্ণের ভূমিকা ছিল নিরপেক্ষ। কিন্তু তবু কৃষ্ণ নিজে বৃষ্ণিবংশ জাত বলে সাত্যকিকে অধিক সমর্থন করতেন।

অন্ততঃ সাত্যকি কৃষ্ণের নৈতিক সমর্থন পেতেন, কৃতবর্মার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে।

দ্বারকার রাজনৈতিক ক্ষমতার সিংহভাগ ছিল বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের দখলে। সেইজন্য বৃষ্ণিবংশীয়দের ক্ষমতার দাপট স্বভাবতঃই একটু বেশী ছিল। কিন্তু ক্ষমতার দাপট বেশী থাকলেও বৃষ্ণিরা তা সবসময় অন্য যাদব গোষ্ঠীর ওপর ফলাতে পারতেন না, কারণ সংখ্যায় তাঁরা অন্য যাদব গোষ্ঠীর তুলনায় কম ছিলেন। অন্ধক ও ভোজবংশীয় যাদবরা সংখ্যায় বৃষ্ণিবংশীয়দের চেয়ে অনেক বেশী ছিলেন এবং এই দুই যাদব গোষ্ঠী সমবেতভাবে ভোজবংশীয় কৃতবর্মাকে সাত্যকির বিরুদ্ধে দ্বারকার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার রাজনীতিতে সমর্থন করতেন।

প্রকৃতপক্ষে, কৃতবর্মা ও সাত্যকির এই ক্ষমতার লড়াই ছিল বৃষ্ণি ও অন্ধক-ভোজবংশীয় যাদব গোষ্ঠীর পুরনো ক্ষমতা দখলের বিরোধ। উগ্রসেন সরকারীভাবে যাদবদের রাজা হলেও, তিনি নামে মাত্রই রাজা ছিলেন। তাঁর কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না. তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই এক ঠুঁটো জগন্নাথ। দ্বারকার সমস্ত প্রশাসন পরি-চালিত হত কৃষ্ণের পরামর্শে। কৃষ্ণ দ্বারকার প্রশাসনে কর্তৃত্ব করতেন বলে ভোজ বা অন্ধকবংশীয় যাদবদের কোন ক্ষোভ ছিল না, কারণ তাঁরা ও কৃষ্ণকে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করতেন এবং কৃষ্ণের গুণাবলীর জন্য তাঁরা সবাই ছিলেন কৃষ্ণের গুণমুগ্ধ ভক্ত।

কিন্তু শুধু কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ ও বৃষ্ণিবংশীয় বলে সাত্যকি ও অন্যান্য বৃষ্ণি-বংশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেরকম ক্ষমতার দাপট দেখাতেন, ভোজ ও অন্ধক বংশীয়রা সেটাই সহ্য করতে পারতেন না। সাত্যকি ও তাঁর সহচরদের এরকম ব্যবহার ভোজ ও অন্ধকদের কাছে অপমানজনক মনে হত। আবার বৃষ্ণিবংশীয় যাদব সম্প্রদায়, সাত্যকি ও তাঁর বন্ধুবর্গের এই ব্যবহারকে বেশ গর্বের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং নিজেরাও মনে মনে বৃষ্ণিবংশে জাত বলে গর্ব অনুভব করে ভোজ ও অন্ধকদের ওপর এক প্রকারের মানসিক আধিপত্যের সুখ অনুভব করতেন।

এই মানসিক পার্থক্যের মধ্যে ইন্ধন যোগাত যাদবকুলের অতীত ইতিহাস। সেই ইতিহাস খুব সুখের ছিল না, সেই ইতিহাস ছিল আগাগোড়া ক্ষমতা দখলের জন্য গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াইয়ের ইতিহাস। এক গোষ্ঠীর নেতাকে অন্য গোষ্ঠীর নেতা ক্ষমতাচ্যুত করে কিভাবে নিজে যাদব রাজ্যের ক্ষমতা লাভ করলেন তারই ইতিহাস। এমনকি যাদবদের মহান্ নেতা কৃষ্ণও এই একই রাজনৈতিক পদ্ধতিতে ক্ষমতাবান্ হয়ে পাদ প্রদীপের আলোয় আসেন। ফলে অন্য সব মহান্ রাজনৈতিক নেতার মতই যাদব সম্প্রদায়ের ভিতরেই ঈর্ষাকাতর কিছু নীরব শত্রু কৃষ্ণের বরাবরই ছিল। যদিও তারা সংখ্যায় কম ছিল বলে এবং তাদের বিশেষ কোন ক্ষমতা না থাকায় সেইসব শত্রুদের শত্রুতা প্রকাশ্যে কোন রূপ পরিগ্রহ করত না। কিন্তু চিরকালের চক্রান্তকারীদের মতই তারা নীরবে গোষ্ঠী বিরোধ বাড়িয়ে সাত্যকি ও কৃতবর্মার বিভেদকে আরো ব্যাপক করে তুলতে সব সময়েই চেষ্টা করত। সাত্যকি ও কৃতবর্মার রাজনৈতিক বুদ্ধি কৃষ্ণের মত উন্নত স্তরের না থাকায় তাঁরা সহজেই এই চক্রান্তে পা দিতেন এবং এই-ভাবে বৃষ্ণিবংশের সঙ্গে অন্য যাদবদের গোষ্ঠী বিরোধ বেড়েই চলত।

কৃষ্ণ দ্বারকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে খুঁটিনাটি বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে যথা সম্ভব নিজেকে নিরপেক্ষ রেখে গোষ্ঠী বিরোধের রাজনীতির ঊর্দ্ধে থাকার চেষ্টা করতেন। ফলে তিনি অনেক সময় সাত্যকি ও কৃতবর্মার রাজনৈতিক বিরোধকে দেখেও দেখতেন না। হস্তক্ষেপ করার অযোগ্য ও তুচ্ছ বলে অবহেলা করতেন, কারণ তাঁরা দুজনেই ছিলেন তাঁর অনুগামী। এতে কিন্তু আসলে লাভবান হতেন কৃষ্ণ বিরোধীরাই। দুই অনুগামীর বিরোধ কৃষ্ণ কর্তৃক যত অবহেলিত হত, ততই তাঁরা উৎসাহিত হতেন এইভেবে যে এই বিরোধ একদিন প্রকাশ্যে বিরাট ফাটলের রূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে ক্ষমতাচ্যুত করবে।

কংসকে হত্যার পর যাদব সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব যখন কৃষ্ণের হস্তগত হয়, তখন কংসের অমাত্যও বন্ধুরা স্বেচ্ছায় অথবা ভয়ে কৃষ্ণের

আনুগত্য স্বীকার করে কৃষ্ণকে নেতা বলে মেনে নেন। কংস অত্যা-চারী ও অদক্ষ প্রশাসক ছিলেন বলে কংসের নিজের অমাত্য ও বন্ধুদের কেউ কেউ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এমনকি কংসের নিজের সম্প্রদায় ভোজদের মধ্যেও তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিক্ষোভ ছিল। তাই কংস ক্ষমতা-চ্যুত হওয়ায় অনেকেই মনে মনে খুশী হয়ে কৃষ্ণকে অভিনন্দন জানিয়ে-ছিলেন, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে। কিন্তু কংসের কিছু অমাত্য ও বন্ধু ছিলেন, যাঁরা কৃষ্ণ ক্ষমতা লাভের পর তাঁকে মৌখিক সমর্থন জানালেও মনে মনে কংসের প্রতিই অনুগত ছিলেন এবং কৃষ্ণকে কখনই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। আবার কংসের অমাত্য ও বন্ধুদের মধ্যে আরেকদল ধূর্ত ছিলেন যাঁরা এই রাজনৈতিক বিরোধের সুযোগে কখনও এপক্ষ কখনও ওপক্ষ সমর্থন করে নিজের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। এই দলের ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ছিলেন অক্রূর ও তাঁর বন্ধুরা। এঁরা কখনই কাউকে বেশী ক্ষমতার অধিকারীরূপে সহ্য করতে পারতেন না। যখন কংস খুব বেশী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে অত্যাচার করতে শুরু করলেন তখন অক্রূর ও তাঁর বন্ধুরা কৃষ্ণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংসের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করলেন।

কংসের মৃত্যুর পর এঁরা ভেবেছিলেন কৃষ্ণকে নিজেদের কব্জায় রেখে কৃষ্ণের নামে সমগ্র যাদবকুলের ক্ষমতা এঁরা নিজেরাই কুক্ষিগত করবেন। কিন্তু যখন তা হল না, যখন এঁরা দেখলেন যে কৃষ্ণ নিজের রাজনৈতিক প্রতিভার দ্বারা ধীরে ধীরে সমস্ত যাদবের মন জয় করে তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হয়ে উঠছেন তখন আবার কৃষ্ণের সঙ্গে এঁদের বিরোধ শুরু হল। এই রাজনৈতিক বিরোধের জের হিসাবে অক্রূর স্যমন্তক মণির ঘটনার সময় যাদবভূমি ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু কৃষ্ণ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ও অন্ধক এবং ভোজদের সংখ্যা গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে অক্রূরকে পুনরায় যাদবভূমিতে ফিরিয়ে আনেন। অক্রূর ফিরে এসে প্রকাশ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য

বিরোধে কৃষ্ণের সঙ্গে লিপ্ত না হলেও, কৃতবর্মাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে থাকতে পারেন, একথা জোর দিয়ে অস্বীকার করা যায় না। ঠিক একই কারণে অন্ধক ও ভোজদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার কথা বিবেচনা করেই কংস বধের পর কৃষ্ণ ও বলরাম নিজেরা অথবা বৃষ্ণিবংশীয় কাউকে যাদব-সিংহাসনে না বসিয়ে মৃতরাজা কংসের পিতা উগ্রসেনকে যাদবকুলের রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অন্ধক ও ভোজরা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তাদের প্রতি বৃষ্ণিদের এই তোষণের রাজনীতি তারা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারতেন। তাই দ্বারকার রাজনীতিতে কৃষ্ণের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা থাকলেও বৃষ্ণি ও ভোজ-অন্ধকদের পুরনো ঝগড়া লেগেই ছিল। কৃষ্ণ তাঁর একক ব্যক্তিত্বে এই বিরোধ অতিক্রম করতে সক্ষম হলেও, দ্বারকার অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিজেদের হয় বৃষ্ণি বংশ নয়ত ভোজ অথবা অন্ধক বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

এই দৃষ্টি-সংকীর্ণতার জন্যেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে পক্ষাবলম্বনের প্রশ্নে যাদবকুলের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। কৃষ্ণ নিজে ব্যক্তিগত ভাবে পাণ্ডবদের সমর্থন করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ-ভ্রাতা বলরাম কৌরবপক্ষের সমর্থক ছিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণের এই মতপার্থক্য ছিল প্রকৃতই রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশের পার্থক্য। কিন্তু অন্য যাদবদের মধ্যে যে মতভেদ ছিল তা প্রধানতঃ দৃষ্টি-সংকীর্ণতার জন্যই। কৃষ্ণ নিজে ব্যক্তিগতভাবে পাণ্ডবদের কাছে রাজনৈতিক ঋণে আবদ্ধ ছিলেন। জরাসন্ধ বধের সময়ে পাণ্ডব ভ্রাতারা তাঁকে বিশেষ সাহায্য করে জরাসন্ধের বিরুদ্ধে জয়ী করেছিলেন। অবশ্য তার জন্য সমগ্র যাদবকুলেরই পাণ্ডবদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কথা কারণ কৃষ্ণ যাদবদের হয়েই জরাসন্ধের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পক্ষাবলম্বন করার প্রশ্ন এল তখন কিন্তু যাদবরা এ কথা ভুলে গেলেন এবং সবাই মিলে পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করতে ব্যর্থ হলেন? যদি শুধু কৃষ্ণের কথা শুনে অথবা কৃষ্ণের নেতৃত্ব

বিচার করে কিংবা কৃষ্ণ যাদবদের জন্য কি করেছেন, এইসব কথা বিবেচনা করে যাদবরা সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে হয়ত যাদবরা এক-যোগে কৃষ্ণেরই মতানুসারী হয়ে পাণ্ডবদের সমর্থন করতেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, সাত্যকি প্রমুখ কৃষ্ণের অতি উৎসাহী অনুগামীদের জন্য।

যখন সন্ধির প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার পরে কৃষ্ণ চূড়ান্তভাবে পাণ্ডব পক্ষে সারথিরূপে যোগদানের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন, তখন সাত্যকির মত দ্বারকার দ্বিতীয় স্তরের বৃষ্ণিবংশীয় নেতারা কৃষ্ণের প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য অন্য গোষ্ঠীর যাদব নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই নিজেরা এককভাবে পাণ্ডব পক্ষের হয়ে যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাদব গোষ্ঠীর মধ্যে এই একতরফা ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া হল। একে সাত্যকির সঙ্গে কৃতবর্মার রাজনৈতিক বিরোধ লেগেই থাকত, তার ওপর সাত্যকি তড়িঘড়ি পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের কথা ঘোষণা করায়, কৃতবর্মা সাত্যকির এই কাজকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করলেন এবং তাঁর নিজেকে অপমানিত বোধ হল। কৃতবর্মার ধারণা হ'ল সাত্যকি কৃষ্ণের নামে সমস্ত যাদবদের ওপর নিজের নেতৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহান্ নেতা কৃষ্ণের পদানু-সরণ করে যাদবদের পাণ্ডবপক্ষ সমর্থন করতে বলে সাত্যকি কৌশলে যাদবদের তাঁর নিজের কাছে নিয়ে আসার এবং কৃতবর্মার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। সাত্যকি যাতে যাদবদের এই-ভাবে বিভ্রান্ত করে নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করতে না পারেন, সেজন্য কৃতবর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে সাত্যকির এই রাজনৈতিক কৌশল ব্যর্থ করতে সচেষ্ট হলেন। কৃষ্ণের নামে সাত্যকির এই রাজনৈতিক মুনাফা লোটার অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে কৃতবর্মা সাহসের সঙ্গে গোষ্ঠী রাজ-নীতিকে আরো তীব্রতর করে তুললেন। ভোজ ও অন্ধকবংশীয় যাদবদের তিনি বোঝালেন যে বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকি, ভোজ ও অন্ধক-দের শত্রু, সেইজন্য সাত্যকি তাদের বিপথগামী করে পাণ্ডবপক্ষ

সমর্থন করিয়ে ভোজ ও অন্ধকদের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করছেন কৃষ্ণের নামে। কৃতবর্মার কথায় ভোজ ও অন্ধক গোষ্ঠী সাত্যকির কাজকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। কৃতবর্মা যা চেয়েছিলেন তাই হল, ভোজ ও অন্ধকদের সঙ্গে বৃষ্ণিদের বিরোধ তুঙ্গে উঠে যাদব সম্প্রদায় সুস্পষ্ট দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। যেহেতু সাত্যকি পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছেন অতএব অন্য গোষ্ঠী ধরে নিলেন যে সমগ্র বৃষ্ণিবংশই পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছেন। সুতরাং নিছক গোষ্ঠী বিরোধের জন্যই ভোজ ও অন্ধকদের সমর্থন পুষ্ট হয়ে কৃতবর্মা কৌরবরাজ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

যেখানে কৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষ সমর্থন করছেন, সেখানে কৃতবর্মার কৌরবপক্ষ সমর্থনের এই সিদ্ধান্ত বিরাট সাহসের পরিচয় সন্দেহ নেই। কৃতবর্মা জানতেন কৌরব পক্ষ সমর্থন করলে কৃষ্ণ তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হবেন, যদিও কৃষ্ণের মত মহান্ নেতা প্রকাশ্যে কৃতবর্মাকে কিছু বলবেন না। কিন্তু কৃতবর্মার কিছু করণীয় ছিল না, কারণ সাত্যকির মত তিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করতে পারেন না। যোগদান করলে সাত্যকির কাছে তাঁর রাজনৈতিক পরাজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না, সাত্যকি যে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কৌশল বিস্তার করেছিলেন তারই জয় হবে। সমগ্র ভোজ ও অন্ধকদের তাহলে সাত্যকি, কৃষ্ণের নামে বিভ্রান্ত করে কৃতবর্মার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কৃতবর্মাকে যাদব রাজনীতিতে দুর্বল করতে পারবেন। সুতরাং নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও বৃষ্ণি-বিরোধী গোষ্ঠীর সমর্থন তাঁর প্রতি অব্যাহত রাখতে হলে কৃতবর্মার একটিই মাত্র করণীয় আছে, তাহল কৌরবপক্ষের হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আর সাত্যকি যা করবেন তারই বিরোধিতা করা, তাহলেই ভোজ ও অন্ধকদের সমর্থন তাঁর প্রতি অব্যাহত থাকবে। তিনি সাত্যকির বিরোধিতা করে নিজের গোষ্ঠীকে বোঝাতে পারবেন যে তিনি বৃষ্ণিদেরই বিরোধিতা করছেন। আর এখন গোষ্ঠী বিরোধ এত তীব্রতর করে তুলে কৃতবর্মার পক্ষে পশ্চাৎ অপসারণ কিছুতেই

সম্ভব নয়। সেইজন্য কৃষ্ণের বিরোধিতা হচ্ছে জেনেও কৃতবর্মা নিজের সমর্থকদের নিয়ে কৌরবপক্ষে যোগদানের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সবাইকে বোঝালেন যে কৌরবদের সমর্থন করলে কৃষ্ণের বিরোধিতা করা হচ্ছে না, করা হচ্ছে সাত্যকির বিরোধিতা। আর তাছাড়া কৃষ্ণ ভ্রাতা বলরামই যখন যুধিষ্ঠিরের সমালোচক এবং কৌরব পক্ষের সমর্থক তখন কৃতবর্মা ও তাঁর বন্ধুদের কৌরবপক্ষ সমর্থনে দোষের কি থাকতে পারে?

প্রকৃতপক্ষে বলরামের যুধিষ্ঠিরের সমালোচনা ও কৌরবদের প্রতি সহানুভূতিই কৃতবর্মাকে প্রকাশ্যে কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করার কথা ঘোষণা করার সাহস দিয়েছিল। কুরুক্ষেত্র নিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামের এই মতভেদ কৃতবর্মার কাছে একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল সাত্যকি-বিরোধিতার নামে কৃষ্ণেরও বিরোধিতা করার। কৃতবর্মা তাঁর সমর্থকদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে বলরাম পাণ্ডবদের সমর্থন না করে পরোক্ষে কৌরবদেরই সমর্থন করছেন, সুতরাং তাঁরা কৌরবদের সমর্থন করলে বলরামের নৈতিক সমর্থন পাবেন। কৃতবর্মার এই সিদ্ধান্ত তাঁর অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্র ও সাহসের পরিচয় সন্দেহ নেই, যদিও কৃতবর্মার এই সিদ্ধান্তের ফলে সাত্যকি নিজেকে কৃষ্ণের অনেক কাছে নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং কৃতবর্মা কৃষ্ণের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন।

এইভাবে মূলতঃ কৃতবর্মা ও সাত্যকির রাজনৈতিক বিরোধের জন্য এবং গোষ্ঠী বিরোধের অজুহাতে সমগ্র যাদব সম্প্রদায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় স্পষ্ট দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। একপক্ষ সাত্যকির নেতৃত্বে পাণ্ডবদের হয়ে অস্ত্রহাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, অন্য পক্ষ কৃতবর্মার নেতৃত্বে কৌরবরাজ দুর্যোধনের পক্ষ সমর্থন করে রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হন। এই দুইপক্ষের মাঝখানে আপাত নিরপেক্ষ ভূমিকায় ছিলেন তাদের অবিসংবাদিত নেতা কৃষ্ণ। পাণ্ডবদের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়েও কৃষ্ণ যেসব কারণের জন্য পাণ্ডবদের পক্ষে অস্ত্রহাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ না

হয়ে শুধুমাত্র নিরস্ত্র সারথিরূপে অর্জুনের রথে আরোহণ করেন— সাত্যকি ও কৃতবর্মার বিরোধ তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ।

কৃষ্ণ জানতেন সাত্যকি ও কৃতবর্মা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী যাদব গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করেন, তাই তাঁরা পরস্পরের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজে এই গোষ্ঠী রাজনীতির উর্দ্ধে। বিবদমাণ গোষ্ঠীদ্বয় ও তাদের নেতারা সবাই তাঁকে সমান শ্রদ্ধা করেন, তিনি আপামর যাদব-সাধারণের নেতা। সুতরাং কৃষ্ণকে যাদবদের মধ্যে তাঁর নিজের শ্রদ্ধার আসন বজায় রাখতে হলে প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতেই হবে, পাণ্ডবদের প্রতি যতই তাঁর দুর্বলতা থাকুকনা কেন, তা না হলে তিনি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবেন। যদি কৃষ্ণ অস্ত্রহাতে সাত্যকির সঙ্গে একযোগে পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে নামতেন তাহলে তাঁকে, কৌরবপক্ষ সমর্থনকারী কৃতবর্মার বিরুদ্ধেও অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করতে হত। কৃষ্ণের মত মহান্ নেতার পক্ষে একাজ নিতান্তই অসঙ্গতিপূর্ণ ও বেমানান। তাছাড়া একজন যাদব নেতা হয়ে নিজেরই একজন অনুগামী যাদবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে তিনি যাদব সমাজে নিন্দিত হয়ে স্থানচ্যুত হতেন। যাদবেরা তাঁকে সাত্যকির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সর্বময় নেতৃত্ব ও শ্রদ্ধার আসন থেকে বিচ্যুত করে সাত্যকির পর্যায়ে নামিয়ে এনে কেবলমাত্র একজন বৃষ্ণিবংশীয় গোষ্ঠী নেতার মর্যাদা দিতেন। এর ফলে কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের কাছে আরো বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও আপামর যাদব সাধারণের কাছে তাঁর কোন শ্রদ্ধার আসন থাকত না এবং যাদব রাজনীতির পূর্ণনিয়ন্ত্রন তিনি হারাতেন। উপরন্তু ভোজ ও অন্ধক গোষ্ঠির যাদবেরা কৃষ্ণের এই আচরণে তাঁকে নিজেদের শত্রু মনে করে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করতে শুরু করে দিতেন। কৃষ্ণের মত মহান্ রাজনীতিক এধরণের ভুল করতে পারেন না। তিনি যাদবদের এবং কৃতবর্মা ও সাত্যকির মনোভাব খুব ভাল করেই অবগত ছিলেন। সেইজন্য হস্তিনায় তাঁর দৌত্য প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পরেও কৃষ্ণ অন্যান্য

রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে নিজের ঘরের রাজনীতির কথা বিবেচনা করে অর্জুনের রথে অস্ত্রহীন সারথিরূপে নিজ ভূমিকা পালন করে গেলেন। যে মহান্ নেতার আসন তিনি নিজগুণে যাদবদের মধ্যে অধিকার করেছেন নিজের দোষে সেই আসন হারাবার মত নির্বুদ্ধিতা কৃষ্ণের ছিলনা।

কৃষ্ণ নিজহাতে অস্ত্র ধারণ না করলেও, কৃতবর্মা ও সাত্যকি পরস্পরের বিপক্ষে তুমুল লড়াই করলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের হয়ে। যুদ্ধকালে ক্ষত্রিয়ের রণনিষ্ঠায় তাঁরা দুজনেই ভুলে গেলেন যে তাঁরা একই যাদব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যক্তি। তার বদলে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বিদ্বেষ তাঁদের মধ্যেও সংক্রামিত হল এবং তাঁরা নিজ নিজ পক্ষকে জয়ী করতে আপ্রাণ যুদ্ধ করলেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা কৃতবর্মা ও সাত্যকি ভাগ করে নিয়ে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত রকম উপায়েই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য চেষ্টা করলেন। যুদ্ধের শেষে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল কৃতবর্মা ও সাত্যকি দুজনেই মেনে নিয়ে একজন জয়ের উল্লাসে ও অন্যজন পরাজয়ের বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কৃতবর্মা কৌরবপক্ষকে মনে প্রাণে সমর্থন করেছিলেন, তাই কৌরবপক্ষ ও রাজা দুর্যোধনের পরাজয়ে তিনি প্রকৃতই মনে গভীর আঘাত এবং পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। অপরপক্ষে সাত্যকি পাণ্ডবদের হয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের যুদ্ধে জয়ী করার জন্য। যুদ্ধের শেষে যখন পাণ্ডবরা জয়লাভ করলেন, তখন স্বভাবতঃই সাত্যকি নিজপক্ষের সাফল্যে উল্লসিত হন। উল্লসিত হৃদয় নিয়ে সাত্যকি যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ দ্বারকায় ফিরে গেলেন না। পাণ্ডবদের যুদ্ধ বিজয়ের ও রাজ্যে অভিষেকের আনন্দে ভাগ বসাবার জন্যে হস্তিনায় কৃষ্ণের সঙ্গে থেকে গেলেন। অবশ্য কৃষ্ণেরও প্রয়োজন ছিল সাত্যকির মত একজন বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত সর্বক্ষণের অনুগামী ও সহকারীর। সাত্যকি আগে কৃষ্ণের যতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন, রণক্ষেত্রে পাণ্ডবপক্ষের হয়ে কৃষ্ণের মনোমত কাজ

করার ফলে তিনি কৃষ্ণের আরো বেশী প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণের ওপরে আগের চেয়ে তাঁর অনেক বেশী অধিকার জন্মালো। যা সাত্যকি অনেকদিন ধরেই চাচ্ছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে তিনি সেই সুযোগ পেয়ে গেলেন—কৃষ্ণের মনোমত কাজ করে নিজের প্রতি কৃষ্ণের মানসিক সমর্থন আদায় করে কৃতবর্মার সঙ্গে তাঁর বিরোধে কৃষ্ণের আপাত-নিরপেক্ষ ভূমিকাকে দুর্বল করে কৃষ্ণকে অনেকটা তাঁর নিজের দিকে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন।

সাত্যকি যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রাজা দুর্যোধনের মৃত্যু ও রাত্রিকালে পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামার প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেসঙ্গেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমাপ্তি পর্ব সূচিত হল। কিন্তু যার কোন সমাপ্তি নেই, সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং পরাজয়ের গ্লানি বুকে বহন করে কৃতবর্মা কারো জন্যে অপেক্ষা না করেই দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে নিজ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করে পরাজিত হলেও নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে কৃতবর্মার স্থান অটুট ছিল। ভোজ ও অন্ধক গোষ্ঠীর যাদবেরা কৃতবর্মার এই পরাজয়কে যুদ্ধের সামগ্রিক ফলাফলের অঙ্গ হিসাবেই দেখলেন, ব্যক্তিগত ভাবে কৃতবর্মাকে এরজন্যে কোন রকমেই দায়ী করলেন না। বরং রাজনৈতিক সততার জন্যে পরাজিত কৃতবর্মার প্রতি তাদের সহানুভূতি আরো গভীর হল।

অন্যদিকে যুদ্ধ জয়ের গর্ব ও অহমিকাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে সাত্যকি কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরে এলেন। সাত্যকির ধারণা হল পাণ্ডবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করে তিনি জয়ী হয়েছেন বলে সমগ্র যাদব সমাজ এখন তাঁকেই সমর্থন করবে। বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের সমর্থন পেয়ে এবং কৃষ্ণের সহযোগী হতে পারায় তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সাত্যকির মধ্যে এক অহমিকাবোধ জন্ম নিল এবং তিনি নিজেকে যাদব সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি ভাবতে লাগলেন।

কৃতবর্মার প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য সর্বসমক্ষেই প্রকাশ পেতে শুরু করল। সাত্যকি এমন ভাব দেখাতে শুরু করলেন যেন তিনি ব্যক্তিগত ভাবেই কৃতবর্মাকে পরাজিত করেছেন।

এইভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে দুই যাদব নেতা পরস্পরের জন্যে চিরস্থায়ী বিদ্বেষ নিয়ে ফিরে এলেন। আগে যা কেবল রাজনীতির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এখন তা নেমে এসে ব্যক্তিগত বিরোধের রূপ নিল। গোষ্ঠী পর্যায়েও বৃষ্ণিরা নিজেদের গুরুমন্যতা প্রকাশ করতে লাগলেন এবং ঠিক একইভাবে ভোজ ও অন্ধকরা হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়ে বৃষ্ণিদের এই ব্যবহারে নিজেদের অপমানিত বোধ করে ক্রমশঃই বৃষ্ণিবংশীয়দের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগলেন। যাদব সম্প্রদায়ের আপাত শান্তির আচ্ছাদনের তলায় ধীরে ধীরে এক অসহিষ্ণুতার আগ্নেয়গিরি তার জ্বালামুখ প্রসারিত করতে লাগল।

চারিত্রিক বিচ্যুতি ও স্বজাতি বিদ্বেষের এই বিস্ফোরক অবস্থায় মহান্ নেতা কৃষ্ণের আহ্বানে যাদবেরা প্রভাসতীর্থে এসে সমবেত হলেন এবং তীর্থের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে সুরা পান, ভোজন ও যৌন সম্ভোগের মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত করে রাখলেন। এমনকি যে নেতারা তাদের পথ দেখিয়ে তীর্থক্ষেত্র প্রভাসে এনেছিলেন, তাঁরা নিজেরাও সাধারণ যাদবদের থেকে পৃথক স্থানে সুরা পানে মত্ত হলেন।

যাদবদের সমস্ত গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একত্রে এক স্থানে বসে কৃষ্ণের সামনেই সুরা পান করতে লাগলেন। যাঁদের নামে দ্বারকায় সুরা পান ও সুরা প্রস্তুতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়েছিল সেই-সব যাদব নেতারা নিজেরাই আকণ্ঠ মদ্যপান করে স্ব-বিরোধী কার্যে লিপ্ত হলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম রইলেন কৃষ্ণ, কিন্তু তিনিও ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচরদের মদ্যপানে বাধা দিতে পারলেন না এইভেবে যে অধস্তন রাজনৈতিক সহকর্মীদের ব্যক্তিগত কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয় এবং তিনি বাধা দিলে যদি তাঁরা তাঁর কথা অমান্য করেন তবে তাঁর সম্মানহানি ঘটবে। প্রধানতঃ নিজের সম্মানের কথা ও সহকর্মীদের

দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কথা বিবেচনা করে কৃষ্ণ ভাবতেও পারেননি, যে তাঁরা মদ্যপানে মত্ত হয়ে হঠাৎ কোন বিপজ্জনক কর্ম করে বসতে পারেন। বিশেষতঃ তাঁর নিজের উপস্থিতিতে।

কিন্তু কৃষ্ণ ভাবতে না পারলেও তাই হল। যে ঘটনা কৃষ্ণের মত মহান্ দূরদর্শী নেতা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, যাদবদের জীবনে সেই দুর্ঘটনা ঘটল। মদ্য পানে বিমোহিত সাত্যকি, বভ্রু, গদ, কৃতবর্মা প্রভৃতি যাদব নেতারা মত্ত হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় যে বিদ্বেষ মনের ভিতরে চাপা ছিল এবং যার প্রকাশ ছিল নিয়ন্ত্রিত, এখানে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে, মদের নেশায় সেই বিদ্বেষ নগ্ন আক্রমণের রূপে মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর থেকেই সাত্যকি নিজেকে বিরাট নেতা মনে করে কৃতবর্মার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। অত্যধিক মদ্য পান করে মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে তিনি কৃতবর্মাকে সরাসরি আক্রমণ করে, পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামার রাত্রিকালে নিদ্রিত ব্যক্তিদের প্রতিশোধাত্মক হত্যা ও কৃতবর্মার সেইকাজে সাহায্যের কথা উল্লেখ করে বললেন যে, কৃতবর্মা যে অন্যায় কাজ করেছেন যাদবেরা তা কখনই সহ্য করবেন না। মত্ত হলেও সাত্যকি নিজেকে যাদবদের একমাত্র নেতা মনে করে সমস্ত যাদবের হয়ে কৃতবর্মাকে হুঁশিয়ারী দিলেন যে—যাদবেরা কখনই তা সহ্য করবেন না। কৃতবর্মা সাত্যকির এই প্রত্যক্ষ আক্রমণ সহ্য করে চুপ করে থাকার মত দুর্বল ব্যক্তি ছিলেন না। তিনিও তৎক্ষণাৎ সাত্যকিকে প্রতি আক্রমণ করলেন রণক্ষেত্রে সাত্যকির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে। ছিন্নবাহু মহারাজ ভূরিশ্রবার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সাত্যকি যে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে অন্যায় করেছিলেন কৃতবর্মা সঙ্গে সঙ্গে সাত্যকিকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কথা কাটাকাটি চরমে উঠল এবং সাত্যকি স্যমন্তক মণির অপহরণ বৃত্তান্ত উল্লেখ করে কৃতবর্মা কিভাবে অক্রূরের সাহায্যে মহারাজ সত্রাজিতকে হত্যা করেছিলেন সেই কাহিনী বর্ণনা

করতে লাগলেন। মহারাজা সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা ছিলেন কৃষ্ণের পত্নী, তিনি তখন ঐস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকির মুখে পিতৃবধ-বৃত্তান্ত শুনে সত্যভামা ক্রন্দন করতে লাগলেন। সত্যভামার ক্রন্দনে, মত্ত হলেও ধূর্ত সাত্যকি একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন সরাসরি কৃষ্ণকে কৃতবর্মার বিরুদ্ধে বিবাদে সামিল করার। সত্যভামার ক্রন্দন দেখে হঠাৎ সাত্যকি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর, যেন সত্যভামার ক্রন্দনের জন্যই তিনি কৃতবর্মার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়েছেন এই রকম ভাণ করে সত্যভামার মনোকষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে কৃতবর্মাকে অনেক কটু-কথা বলে, কেউ কোন কিছু বোঝার অথবা বাধা দেওয়ার আগেই হঠাৎ হাতে খড়্গ ধারণ করে কৃতবর্মার মস্তক ছিন্ন করে ফেললেন এক আঘাতে।

যাদবদের ভাগ্য আচমকা পরিবর্তিত হয়ে গেল, সাত্যকির এই হঠকারীতায়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সাত্যকি যাদব সমাজের কতবড় ক্ষতি করে ফেললেন তখন সেটা বোঝার মত ক্ষমতা তাঁর মত্ত মস্তিষ্কের ছিল না। সাত্যকি ভেবেছিলেন যে সত্যভামা কৃষ্ণের স্ত্রী, তাই তাঁর জন্যে কৃতবর্মাকে হত্যা করলে কৃষ্ণ তাঁকে কিছু বলতে পারবেন না। কৃষ্ণের এই নীরব সমর্থনটুকু আদায়ের জন্যই সাত্যকি একটা ছুঁতো খুঁজছিলেন। এমন একটা ছুঁতো যার দ্বারা একই সঙ্গে কৃতবর্মাকেও হত্যা করা যায় আবার কৃষ্ণও বাধা দেবার অবকাশ না পান এবং সাত্যকির প্রতি রুষ্ট না হন। সত্যভামার ক্রন্দন সাত্যকিকে সেই সুযোগ এনে দিল, যার দ্বারা তিনি চিরশত্রু কৃতবর্মাকে নিপাতিত করলেন খড়্গের এক আঘাতে।

সাত্যকির এই হঠকারী মত্ততায় সবাই হতচকিত হয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন মুহূর্তের জন্য। কৃষ্ণ কিন্তু বুঝতে পারলেন সাত্যকি যাদবদের কতবড় ক্ষতি করলেন। হাহাকার করে উঠে কৃষ্ণ সাত্যকির হাত থেকে খড়্গ কেড়ে নেবার জন্য তাঁর প্রতি ধাবমান হলেন, কিন্তু পারলেন না। নিকটস্থ কৃতবর্মার ভোজ ও অন্ধক অনুগামীরা একসঙ্গে

সাত্যকিকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে হাতের পানপাত্র দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। কৃতবর্মার হত্যায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সম্মুখস্থ বৃষ্ণিদের ও সাত্যকিকে উন্মত্তের মত সমবেতভাবে প্রহার করতে লাগলেন। সুরা পান করে উন্মত্তের মত গোষ্ঠী যুদ্ধে লিপ্ত যাদবদের কৃষ্ণ কিছুতেই নিবারণ করতে পারলেন না। তাঁরা কেউ কৃষ্ণের অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। একে অন্যকে হাতের পানপাত্র দিয়ে আঘাত করে ভূপাতিত করতে লাগলেন। ভোজ ও অন্ধকরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছিলেন বলে সাত্যকি ও তাঁর অনুগামীরা নিপীড়িত হতে লাগলেন তাদের হাতে। সাত্যকির এই বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে তাঁকে পরিত্রাণ করতে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণ নন্দন প্রত্যুম্ন। বিরাট হুঙ্কার ছেড়ে প্রত্যুম্ন ভোজ ও অন্ধকদের মাঝে লাফিয়ে পড়লেন সাত্যকিকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু মদ্যপান করে সবাই তখন মত্ত, প্রত্যুম্ন কৃষ্ণের পুত্র বলে উন্মত্ত যাদবদের কাছে কোন গুরুত্ব লাভ করলেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ যাদবেরা কৃতবর্মার মৃত্যুর প্রতিশোধস্বরূপ সাত্যকি ও প্রত্যুম্নকে হত্যা করলেন।

কৃতবর্মা ও সাত্যকির যে বিরোধ ছিল রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার লড়াই তা পরিণত হল এক বিধ্বংসী গৃহযুদ্ধে। প্রত্যুম্নের ও সাত্যকির মৃত্যুতে অবশিষ্ট বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সমবেতভাবে ভোজ ও অন্ধকদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। গৃহযুদ্ধের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ উন্মুক্ত হয়ে লাভাস্রোত প্রবাহিত হয়ে যাদবকুলকে ধ্বংস করতে লাগল। মদ্যপায়ী যাদব সম্প্রদায়ের দুই বিবদমান গোষ্ঠী যে যাকে পারলেন হত্যা করতে লাগলেন। মত্ততায় কে কাকে হত্যা করছেন কারুর কোন খেয়াল রইল না। যাদব সম্প্রদায়ের সমস্ত বড় বড় নামকরা নেতা অস্ত্র হাতে একে অন্যকে হত্যা করে গৃহযুদ্ধের আগুনকে আরো তীব্রতর করতে লাগলেন। অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, গদ প্রমুখ যাদবদের বড় বড় নেতারা গৃহযুদ্ধের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। কেউ তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। এমন

কি তাদের মহান্ নেতা কৃষ্ণও নিজের মদ্যপায়ী মত্ত অনুগামীদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে ক্রোধে ও পুত্রশোকে অস্ত্র ধারণ করলেন। কিন্তু তবু তিনি যাদবদের এই গৃহযুদ্ধকে থামাতে পারলেন না। পান পাত্রের গৃহযুদ্ধে যাদবদের পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠীর সমস্ত বড় বড় নাম-করা নেতা মৃত্যুবরণ করলেন।

যে মহানতার কক্ষপথে এতদিন কৃষ্ণ আবর্তিত হচ্ছিলেন, যাদবদের গোষ্ঠীবিরোধ তাঁকে সেই কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করে সাধারণ যাদব সম্প্রদায়ের মধ্যে নামিয়ে আনল। তিনি নিজের অনুগামীদের ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলেন। নিরুপায় হয়ে কৃষ্ণ তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর দারুকের মাধ্যমে বন্ধু অর্জুনের কাছে দ্রুত খবর পাঠালেন এই বিধ্বংসী গোষ্ঠী বিরোধের। যাতে অর্জুন এসে কৃষ্ণকে সাহায্য করতে পারেন বলপূর্বক এই গোষ্ঠী বিরোধ থামানোর জন্যে। কৃষ্ণ, অর্জুন যতক্ষণ না এসে পৌঁছন ততক্ষণ নিজেকে গোষ্ঠী বিরোধের আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিকটস্থ অরণ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করলেন।

সাত্যকি ও কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নকে হত্যা করেও কৃষ্ণের কাছ থেকে কোন বিশেষ বাধা প্রাপ্ত না হওয়ায় ভোজ ও অন্ধকরা সাহসে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য তাঁদের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে বৃষ্ণিবংশীয়রা পলায়ন করতে শুরু করলেন। কৃষ্ণ, অর্জুনকে খবর পাঠিয়ে অরণ্যে আত্মগোপন করলে, ভোজ ও অন্ধক গোষ্ঠী মদ্যপান হেতু কৃষ্ণকেও একজন সাধারণ বৃষ্ণিবংশীয় যাদবের পর্যায়ভুক্ত করে ধারণা করলেন যে তিনিও তাঁদের ভয়ে পলায়ন করে আত্মগোপন করেছেন। যে সম্মান তাঁরা এতদিন কৃষ্ণকে দিয়ে এসেছিলেন, কৃষ্ণ যাদবদের জন্য সামগ্রিকভাবে যা করেছেন এক মুহূর্তের উন্মত্ততায় ভোজ ও অন্ধকরা সেই সবকিছুই ভুলে গেলেন। তাঁরা শুধু মনে রাখলেন কৃষ্ণ, বৃষ্ণি বংশজাত, তাঁদের শত্রু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শত্রু গোষ্ঠীর কাউকেই রেহাই না দেওয়ার পরিকল্পনায় ভোজ ও অন্ধকরা সমবেতভাবে কৃষ্ণের

অন্বেষণে বেরিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ সাময়িক ক্লান্তিতে তখন কোন এক বৃক্ষের তলায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। ভোজ ও অন্ধক গোষ্ঠীর এক মদমত্ত যাদব বিশ্রামরত কৃষ্ণকে দেখেই দূর থেকে তাঁর প্রতি এক বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলেন। সহসা সেই তীর কৃষ্ণের পদতলে বিদ্ধ হয়ে বিশ্রামরত অপ্রস্তুত কৃষ্ণের শরীর বিষময় করে তুলল। তীব্র বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাদবদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, নিজের জীবিত-কালেই বহু গুণমুগ্ধ ভক্তের শ্রদ্ধায় দেবত্বে উত্তীর্ণ কৃষ্ণের উজ্জ্বল জীবন-দীপ ধীরে ধীরে নিভে গেল। মহা অরণ্যে শয়ান রইলেন প্রাণহীন এক চিরকালের মহান্ ব্যক্তিত্ব। আর মূর্খ যাদবেরা মহা উল্লাসে নিজেদের বিজয়ী মনে করে ফিরে গেলেন। অর্জুন কোন সুযোগ পেলেন না পথপ্রদর্শক বন্ধুকে সাহায্য করে ঋণ শোধ করার।

কৃষ্ণ চলে গেলেন। যে অখ্যাত যাদব সম্প্রদায় কৃষ্ণের জন্য পাদ-প্রদীপের আলোয় এসেছিলেন, ইতিহাসে স্থান লাভ করেছিলেন, সেই নিজ সম্প্রদায়ের জ্ঞানহীনতার শিকার হলেন কৃষ্ণ। দুর্নীতিগ্রস্ত এক সমাজকে পরিচ্ছন্ন মানবিক জীবন অভিমুখী করানোর এক মহৎ প্রচেষ্টায় কৃষ্ণ প্রাণ হারালেন। ইহুদিদের নেতা মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদিরা যেরকম দলবদ্ধ ভাবে সবাই মিলে ফারাওর অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মিশর ত্যাগ করে নতুন পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে মাঝপথে সুরা ও নারীতে মদমত্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনিই যাদবরাও পবিত্র তীর্থক্ষেত্র প্রভাসে সুরা ও নারীতে আসক্ত হয়ে নিজেরা গৃহবিবাদে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংসকে ডেকে এনেছিলেন। ইহুদিদের Exodus-এর মতই যাদবদের Exodus-এর পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁদের মহান্ নেতা কৃষ্ণ। কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত যাদবকুলকে বিশাল এক ধর্মীয় মিছিলে সামিল করে তাঁদের মনে এক ব্যাপক গণধর্মের উত্তেজনা সৃষ্টি করে সমস্ত যাদব মানসিকতাকে ধর্মীয় খাতে বইয়ে দেওয়া, যাতে সুরা ও নারীর ক্ষয়কারী মোহ থেকে যাদব সম্প্রদায়কে রক্ষা করা যায়।

পবিত্র প্রভাস তীর্থের উদ্দেশ্যে এই অভূতপূর্ব বিশাল গণমিছিল কৃষ্ণের দূরদর্শী পরিকল্পনা ও মহান্ নেতৃত্বের এক মহৎ প্রয়াস।

অর্জুন দারুকের মুখে খবর পেয়ে এসে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর আর কিছু করার নেই। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি কৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করালেন। যে মহান্ বন্ধুর জন্য অর্জুন কর্ণের মত প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বীকেও পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই কৃষ্ণের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার গৌরবটুকু ছাড়া অর্জুনের আর কোন সান্ত্বনা রইল না। গৃহযুদ্ধে যাদবদের সমস্ত নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ বহু যাদব প্রাণ হারালেও সামগ্রিক ভাবে যাদব সমাজ একেবারে ধ্বংস হয়নি। বহু যাদব গৃহ-যুদ্ধের পরেও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণের পরে আর কোন উল্লেখযোগ্য নেতা জন্মগ্রহণ না করায় লাগামবিহীন অশ্বের মতই নেতৃত্বহীন যাদব সমাজ ইতিহাসের অন্ধকারে তলিয়ে যায় এবং সামাজিক উল্লেখযোগ্যতা হারায়।

—***—